









Digitized by eGangotri and Sankar Trust, Varanasi by Mahesh

# SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/406

Book should be returned by date ( last ) noted below  
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise  
daily shall have to be paid.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|





# স্বামী বিবেকানন্দ

প্রথম ভাগ

PRESENTED

প্রমথনাথ বসু

7/10/46 3/406



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকতা

প্রকাশক  
শ্রীমতী আশ্রমবোধানন্দ  
উদ্বোধন কার্যালয়  
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর  
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ষ্টল  
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্  
২৭বি, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক  
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বিতীয় সংস্করণ  
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

সাড়ে তিন টাকা



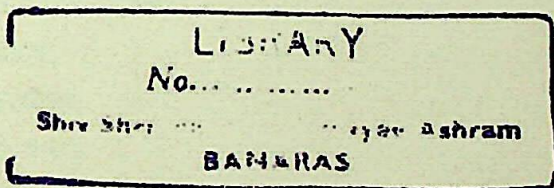
## প্রকাশকের নিবেদন

স্বামী বিবেকানন্দ (জীবনচরিত) গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্বে ইহা চারি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য বর্তমান সংস্করণ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। স্বামীজীর আদর্শ জীবনচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া বাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা উপকৃত হইতে পারেন, এই মহান উদ্দেশ্য লইয়াই এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ, ছাপা-খরচ প্রভৃতির বৃদ্ধি সত্ত্বেও ইহার মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইল।

শারদীয়া শুক্লা, ১৩৫৬

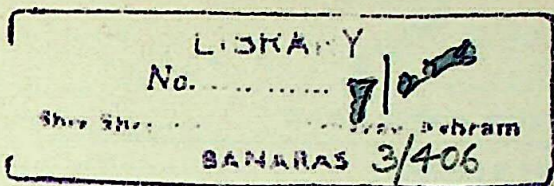
~~২/১০/৫৬~~  
3/406

প্রকাশক









## সূচীপত্র

## PRESENTED

|                               |     |        |
|-------------------------------|-----|--------|
| ভূমিকা                        |     | [ ৫ ]  |
| অবতরণিকা                      | ... | [ ১৩ ] |
| সিমুলিয়ার দত্তবংশ            | ... | ১      |
| পিতামাতার পরিচয়              | ... | ৬      |
| নরেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকথা | ... | ১২     |
| শিক্ষারমুহুর্ত                | ... | ২১     |
| বিদ্যালয়ে                    | ... | ৩১     |
| পিতামাতার নিকট শিক্ষা         | ... | ৪৬     |
| বাল্যজীবনের শেষ কথা           | ... | ৫৬     |
| কলেজে                         | ... | ৬০     |
| মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা         | ... | ৯৪     |
| অকুল চিন্তালাগরে আশ্রয়       | ... | ১০২    |
| পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট    | ... | ১১০    |
| শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে          | ... | ১২২    |
| বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠা          | ... | ১৫১    |
| বরাহনগর মঠে তপস্তা            | ... | ১৬০    |
| পরিব্রাজকবেশে                 | ... | ১৭৬    |
| গাজীপুরের পণ্ডহারী বাবা       | ... | ১৯৩    |
| পুনর্জাতি                     | ... | ২০০    |
| হিমালয়কোড়ে                  | ... | ২০৫    |

|                                 |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| আলোরার রাজ্যে                   | ... | ... | ২২২ |
| জয়পুর ও খেতড়িতে               | ... | ... | ২৪৫ |
| শুজরাট প্রদেশে                  | ... | ... | ২৫৭ |
| বোম্বাই প্রদেশে                 | ... | ... | ২৮৪ |
| দাক্ষিণাত্যে                    | ... | ... | ৩১২ |
| প্রব্রজ্যাকালের অত্যাচার কাহিনী | ... | ... | ৩৩৮ |
| মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে          | ... | ... | ৩৫৫ |
| সঙ্কল্পনিক্রপণ ও আমেরিকাযাত্রা  | ... | ... | ৩৭২ |
| সমুদ্রপথে                       | ... | ... | ৩৮৩ |
| আমেরিকার প্রথম কর্দিন           | ... | ... | ৩৯৫ |
| চিকাগোর ধর্ম-মহাসভা             | ... | ... | ৪০৪ |
| মহাসভার অধিবেশনান্তে            | ... | ... | ৪১৬ |
| পর্যটন ও প্রচার                 | ... | ... | ৪৩৫ |



LIBRARY

No.....

3/406

Shri Sri Anandamayi Ashram

BANARAS

## ভূমিকা

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া এবং ভারতের নানাস্থানে মঠ-সেবাশ্রমাদি স্থাপন দ্বারা স্বদেশবাসীকে ধ্যান-ধারণা ও দরিদ্রনারায়ণসেবা-শিক্ষার সুযোগ প্রদান করিয়া বর্তমান কালে সমগ্র জগতেরই বিশেষরূপ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারত তাঁহার অপূর্ণ আত্মত্যাগপূর্ণ জীবনাদর্শে ও অদ্বুত কৃতকার্য্যতায় গৌরব অনুভব করিয়াছে—বিশেষতঃ বাঙ্গালী জাতি, কারণ তিনি স্বয়ং বাঙ্গালী ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পুত্র জীবনচরিত-আলোচনায় যে সমগ্র জগতের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইবে, ইহা অতিশয় স্বাভাবিক।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সংশ্রবে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই প্রিয়তম ও প্রতিভাবান্ শিষ্যের গুণগ্রামের কথা কিছু কিছু অবগত হই। তখন তাঁহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাহার কিছু পূর্বেই তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের নানাস্থানে পরিব্রাজকভাবে ভ্রমণ করিয়া কঠোর তপশ্চা ও সাধন-ভজনের দ্বারা নিজ গুরুদেবের আদিষ্ট কার্য্যভার-সাধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের নিকট মধ্যে মধ্যে তাঁহার অপূর্ণ প্রতিভার কথা শ্রবণ ও তিনি এখন স্ববীকেশের তগোভূমে সাধনে নিযুক্ত বা এখন অমুক স্থানে রহিয়াছেন, এইরূপ সামান্য সংবাদ জানা ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানিবার সুযোগ এবং সত্য কথা বলিতে কি, বিশেষ আগ্রহও হয় নাই। কিন্তু

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই জগদ্বিখ্যাত চিকাগো ধর্মমহামেলার যখন তাঁহার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রকাশিত হইল, তখন হইতেই বিশেষভাবে তাঁহার জীবন ও উপদেশের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তখন হইতে সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশিত হইতে লাগিল অথবা তৎসম্বন্ধীয় বা তৎপ্রণীত যেকোন পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহাই শুধু সাগ্রহে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম তাহা নহে, তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের নিকট হইতেও তৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে লাগিলাম এবং তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য ত্যাগ ও তপস্তার কথা, অপূর্ব গুরুভক্তি, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও সর্বোপরি তাঁহার অকাট্য-যুক্তিপূর্ণ উদার মতসমূহের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। পরিশেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন তিনি কলিকাতার পদার্পণ করিলেন, তখন প্রথম শিলালদহ স্টেশনে তাঁহার অপূর্ব তেজোমণ্ডিত প্রতিভাদীপ্ত বদনমণ্ডল দেখিয়া তিনি যে অলোকসামাগ্র মহাপুরুষ তদ্বিষয় প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলাম।

এই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বামীজীর লীলাসম্বরণের সময় পর্য্যন্ত (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই) নানাস্থানে তাঁহার অপূর্ব উপদেশামৃত শুনিলার এবং ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত মিশিলার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আমার মঠে যোগ দিবার পূর্বে কানীপুরের উচ্চানে যখন স্বামীজী অবস্থান করেন, উপযুক্তপরি কয়েকবার এবং তদানীন্তন আলমবাজার মঠে যোগ দিবার কিছু পরেই তাঁহার দার্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ও আলমোড়া যাত্রার পূর্বে পর্য্যন্ত ঐ মঠে ৪৫ দিন মাত্র তাঁহার সঙ্গ লাভ করি। (এই সময়কার কিছু কিছু বিবরণ বহু পরে 'স্বামীজীর অক্ষুট স্মৃতি' নাম দিয়া উদ্বোধনে প্রকাশ করিয়াছি।) পরে ঐ বৎসর ৮পূজার পর লাহোরে তাঁহার



সঙ্গে মিলিত হইয়া তথা হইতে দেৱাছন, সাহাৱাণপুর, দিল্লী, আলোৱাৱ, জয়পুর ও খেতড়িতে তাঁহাৰ সঙ্গে ভ্ৰমণ কৰি। খেতড়ি হইতে পৃথক হইয়া একমাস পৰে পুনৰায় কলিকাতায় তাঁহাৰ সহিত মিলিত হই। ১৮৯৮-এৰ প্ৰথম ভাগে বেলুড়ে নীলাধৰ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ৰ বাগান-বাটীতে মঠ উঠিয়া বাইলে কয়েক মাস তথায় তাঁহাৰ সহিত একত্ৰ বাসেৰ সৌভাগ্যলাভ কৰি। তাৰপৰা তিনি কাশ্মীৰ প্ৰভৃতি স্থানে ভ্ৰমণেৰ জন্ত বাহিৰ হইয়া নাইনিতাল হইয়া আলমোড়ায় গমন কৰিলে আমিও মাস-খানেক পৰে তথায় ৪।৫ দিনেৰ জন্ত মিলিত হই। তাঁহাৰ কাশ্মীৰ হইতে প্ৰত্যাবৰ্ত্তনেৰ পৰা আবার কখনও কলিকাতায়, কখনও মঠে (ইহাৰই কিছু পৰে বেলুড়ে স্থায়ী মঠবাটী নিৰ্মিত হয়) তাঁহাৰ সঙ্গ ও সাক্ষাৎ প্ৰায়ই ঘটতে থাকে। ১৮৯৯ সালেৰ জুনে তাঁহাৰ দ্বিতীয় বাৰ পাশ্চাত্যদেশে গমনেৰ সময় প্ৰিন্সেপ ঘাটে তাঁহাৰ নিকট বিদায় লইয়া আবার যখন ১৯০০ খ্ৰীষ্টাব্দেৰ ২ই ডিচেম্বৰ ৰাতি ৯টাৰ সময় কোন সংবাদ না দিয়াই তিনি হঠাৎ মঠে প্ৰত্যাগত হন, তখন আবার তাঁহাৰ দৰ্শনলাভ হইল। ইহাৰ পৰা অধিকাংশ সময় তিনি মঠে বাপন কৰিয়াছেন—আমিও বিশেষ কাৰণে বাহিৰে না বাইলে তাঁহাৰ সঙ্গলাভ কৰিতাম। ইতোমধ্যে স্বামীজী যে কয়েকবাৰ মঠ ছাড়িয়া কোথাও গমন কৰেন, তাহাৰ মध्ये ঢাকাঘাত্ৰায় সময় তাঁহাৰ সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। অবশেষে যেদিন আমাদেৰ কাঁদাইয়া তিনি মহাসম্মতি প্ৰাপ্ত হইলেন তখনও তথায় উপস্থিত ছিলাম।

স্বামীজীৰ জীৱনেৰ যে সামান্য অংশ সম্বন্ধে আমাৰ কতকটা প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাৰ নিৰ্দেশ কৰিলাম। এক্ষণে তাঁহাৰ বিচিত্ৰ ঘটনা-পূৰ্ণ জীৱনেৰ ঘটনাবলী কি কি উপাদান হইতে প্ৰধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহাৰ কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

মঠে আশ্ৰয় লইবাৰ পৰা হইতেই স্বামীজী আমাদিগকে মঠেৰ

দৈনন্দিন কার্যাবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে বার বার আদেশ করিতেন। আমরা সকল সময়ে না পারিলেও অনেক সময়ে তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলাম। তৎকালে মঠের অগ্রাণ্ড অনেক ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বামীজীর অনেক কথা, অনেক উপদেশ এবং তাঁহার জীবনের কতক কতক ঘটনা ও বিভিন্ন স্থানের গভাগতিরও কতক কতক বিবরণ তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়া মঠে সবলে রক্ষিত হইয়াছে।

স্বামীজীর মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া বেলুড় মঠে সমবেত হন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বামীজীর সম্বন্ধে যিনি বাহা জানিতেন তাহা বলিয়া গিয়া আমার দ্বারা লিপিবদ্ধ করান। পরে 'উদ্বোধনের' সম্পাদনকালে স্বামীজীর জীবনের উপাদান-সংগ্রহের জন্ত পাঠকগণের নিকট আবেদন করায় স্বামীজীর বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ, আমেরিকা যাত্রার পূর্বে দীক্ষিত বেলগ্রামনিবাসী ফরেষ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র, স্বামীজীর অগ্রতম প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি তাঁহাদের স্বামীজী-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন।

স্বামীজীর পাশ্চাত্যদেশবাসিনী বহুগুণালঙ্কৃত শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বোধ হয় স্বামীজীর একখানি সুবিস্তৃত জীবনী-সঙ্কলনের মানস করিয়া তাহার অংশবিশেষস্বরূপে মায়াবতী হইতে প্রকাশিত 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজী মাসিকে 'The Master as I Saw Him' নাম দিয়া স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে লিখিতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয়, অকালে দেহত্যাগ করাতে স্বামীজীর সম্পূর্ণ জীবন-চরিত লিখা তাঁহার দ্বারা ঘটয়া উঠে নাই।

বাহা হউক, স্বামী বিরজানন্দ মায়াবতী ঐক্যতাপ্রমের ভারগ্রহণের পর স্বামীজীর একখানি সুবৃহৎ সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখিবার কল্পনা করেন



PRESENTED

No. ১০০০ প্রাণেশ্বর গরকার

Sri Sri Anandamayee Ashram Varanasi

VARANASI

এবং তহুদেগে উপরে উল্লিখিত ভায়েরী এবং মুদ্রিত বিবরণ-সমূহ ব্যতীত নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তিকে লিখিয়া নানা ঘটনা সংগ্রহ করেন এবং এইরূপে স্বামীজীর সুবৃহৎকায় ইংরেজী জীবনচরিত চারি খণ্ডে সঙ্কলিত হয়। ভবিষ্যতে যিনিই স্বামীজীর জীবনচরিত-রচনার প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাকেই প্রধানতঃ ইহাই উপাদানরূপে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ জীবনচরিত মুদ্রিত হইবার পূর্বে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ ও আমি উহার হস্তলিপি দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইরাছিলাম এবং বাহাতে উহাতে বর্ণিত ঘটনাগুলিতে অতিরঞ্জন না থাকে বা সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিতে নানা উপায়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলাম।

বাঙ্গালা দেশ স্বামীজীর উপদেশ সাগ্রহে গ্রহণ করিলেও বাঙ্গালা ভাষার দুই-একখানি অতি ক্ষুদ্র জীবনচরিত ব্যতীত বিস্তারিত জীবনচরিত লিখিবার চেষ্টা বিশেষ দেখি নাই। প্রায় দুই বৎসর হইল বর্তমান গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বসু মহাশয় স্বামীজীর ইংরেজী জীবনচরিতের কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া আমাদের কাছে দেখান এবং তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও গুছাইয়া বেশ মিষ্ট করিয়া বলিবার শক্তি দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সমগ্র জীবনচরিতটি লিখিবার চেষ্টা করিবার জ্ঞাত উৎসাহিত করি এবং কি ভাবে ঐ কার্য সম্পাদন করিলে ভাল হয়, তৎসম্বন্ধেও কতকগুলি পরামর্শ দিই। সম্ভ্রতি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থখানি লেখা শেষ হওয়ায় উহা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমাকে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন—তত্পলক্ষে আমি এ পর্য্যন্ত উহার হস্তলিপির অধিকাংশ ভাগ শ্রবণ করিয়াছি এবং আমার স্বামীজীর জীবন সম্বন্ধে যতটা জানা আছে, তৎসহায়ে এবং মঠের ভায়েরী ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া ঘটনার বর্ণনার মধ্যে

যাহাতে অসত্য প্রবেশ না করে, তদ্বিবয়ে সহায়তা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

প্রথম বাবু মারাবতী আশ্রমের অধ্যক্ষগণের নিকট হইতে স্বামীজীর বিস্তারিত ইংরেজী চারি খণ্ড জীবনচরিতের অনুবাদ করিবার অনুমতি যথাবিধি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে গিয়া সকল স্থলে ধারাবাহিক ও আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেন নাই, কেবল যাহাতে ঘটনাগুলির একটিও বাদ না পড়ে তদ্বিবয়েই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। গ্রন্থ-সংশোধনকালে তিনি আরও বিস্তৃত করিবার জন্ত পুরাতন 'উদ্বোধন', 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রভৃতি যে-সকল গ্রন্থ হইতে স্বামীজীর জীবনচরিতের অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি আবার মিলাইয়া দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ নীলাগ্রঙ্গ', পঞ্চম ভাগ হইতে স্বামীজীর বাল্যজীবন সম্বন্ধে অনেক সাহায্য পাইয়াছেন।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী যথাযথ বর্ণনামাত্র করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দার্শনিকভাবে স্বামীজীর জীবন বিশ্লেষণ করা বা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির গভীরতার পরিমাণ কতদূর, গ্রন্থকার সে দিকে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, তদপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন লেখকের জন্ত সেই কার্য রাখিয়া দিয়াছেন। যদি তাঁহার দ্বারা স্বামীজীর জীবনালেখ্যখানি যথাযথ চিত্রিত হইয়া থাকে, তবেই তিনি নিজ শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবেন।

আমরাও তাঁহার পুস্তকের শুদ্ধতা সম্বন্ধে যেটুকু সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছি সেটুকুও বড় বেশী নহে, এবং হালফ করিয়া এ কথাও বলিতে পারি না যে, ঘটনা-সন্নিবেশে বিন্দুমাত্র ভুল হয় নাই, তবে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করাতে ইহা অনেক পরিমাণে বিগত হইয়াছে, এইমাত্র বলা যাইতে পারে।



অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তৎপ্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিতে' Dialogic Process নাম দিয়া মহাপুরুষগণের জীবনচরিতে তাঁহার শিষ্যগণের ভক্তির আতিশয্যে যে অনিচ্ছাকৃত অতিরঞ্জনাদি দোষ অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়ে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, স্বামীজীর ইংরেজী জীবনচরিতের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের হস্তলিপির আলোচনাকালে বিশেষ অনুসন্ধান অবলম্বন করাতে তাহার হস্ত হইতে কিয়ৎপরিমাণেও মুক্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে, কারণ স্বামীজীর জীবনের যে-সকল ঘটনা সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল, অনুসন্ধানের ফলে তাহারাও কতক আমার ধারণা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন, অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীপন্ন হইয়াছে। আরও স্বামীজীর কিছুকাল পুতসঙ্গের ফলে তাঁহার যে একটি ছবি হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত কিছু পার্থক্য বোধ হইলেই লেখককে সেইটি স্মরণ করাইয়া দিয়া সাবধানতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

বাহার যেরূপ ধারণা, বাহার যে দিকে ঝোঁক, মহাপুরুষের জীবন-লোচনাকালে সেই দিকটিই তাহার দৃষ্টিতে বিশেষভাবে নিপতিত হয়। সেই জন্ত আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামীজীকে দরিদ্রনারায়ণ-সেবাব্রতপ্রচারক, জাতীয় ভাবের উদ্বোধক, সমাজসংস্কারক, প্রাচীন ভারতের গৌরববোধগাকারী প্রভৃতি নানা ভাবে বর্ণিত দেখিতেছি। কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটিকেই স্বামীজীর সমগ্র ভাবের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না। তাঁহাতে এই সকলগুলিই ছিল এবং আরও অনেক জিনিস ছিল। স্বামীজীর ধারাবাহিক জীবনচরিত-পাঠে তাঁহার এই বৈচিত্র্যময় জীবনের সমগ্র ভাবটি অনেকটা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং বর্তমান গ্রন্থালোচনে ইহার বিশেষ সহায়তা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এক্ষণে পাঠকগণকে গ্রন্থের আলোচনার উন্মুখ

[ ১২ ]

জানিয়া এবং গ্রন্থের গুণদোষবিচারের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ  
করিয়া আমরা বিরত হইলাম ।

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্যুক্তিহেতবঃ ।

হেমঃ সংলক্ষ্যতে হৃদ্যো বিগুন্ধিঃ শ্রামিকাপি বা ॥

ইতি—

উদ্বোধন কার্যালয়

শ্রাবণ, ১৩২৬

}

নিবেদক

শুদ্ধানন্দ



LIBRARY

No.....

Shri Shri

BANARAS

## অবতরণিকা

যে মহাপুরুষের পুণ্যচরিত-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি বর্তমান যুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। এই নবরত্ন বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালী-জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমরা ধন্ত। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ বাঙ্গালাদেশের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি লোক-কল্যাণের জন্ত দেহধারণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীতে সনাতন হিন্দু-ধর্মের মহিমা প্রচার এবং অলৌকিক সদৃশগুণাশি প্রদর্শন করিয়া বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে যখন জড়বাদ ও নাস্তিকতার বিষম প্লাবনে এ দেশ ভাসিয়া গেল, যখন প্রাচীন ধর্মের সত্যাসত্য-নির্দারণে অসমর্থ হইয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন, যখন খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা পৌত্তলিক বলিয়া আমাদের উপহাস এবং আমাদের দেবদেবী ও পূজাপদ্ধতিকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, তখন ধর্মের অসংপতন ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা অবলোকন করিয়া প্রাচীনের উপর লোকের একটা অভক্তি জন্মিয়া গেল এবং একে একে প্রাচীনতাব ও সংস্কারগুলি তাঁহাদের মন হইতে উৎপাটিত হইতে লাগিল। এই মহযুগ-পরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিভা-শালী রাজা রামমোহন রায় প্রাচীন ধর্মের সারাংশ-অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই ধর্মের উদার মত কিয়ৎপরিমাণে নাস্তিকতার দিক হইতে লোকের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু লোকে খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম হইয়া সাম্যবাদের দোহাই দিয়া সামাজিক স্বাধীনতার নামে আহার-বিহার ও বিবাহাদি সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার অবলম্বন

করিল। ইহাতে নব্যতন্ত্রের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রাচীন ধর্মের জীর্ণস্তূপের আশে পাশে যে সকল ব্যক্তি সন্দেহ-দোলারিত চিত্তে অজ্ঞেয়বাদের অন্ধকারে ঘুরপাক খাইতেছিলেন এবং কোন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয়ে অসমর্থ হইয়া অন্তরে অন্তরে ঘোর শাস্ত্র-বিদ্বেষী হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন সাম্যমতবাদী খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্মণও দোষলেশশূন্য পূর্ণমানব নহেন। তখন ধীরে ধীরে লোকের মনের গতি বিপরীত দিকে ফিরিল। কিন্তু তথাপি ঈশ্বর আছেন কি না বা হিন্দুধর্মোক্ত সকল কথাই বিশ্বাসযোগ্য কি না—এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহ ঘুচিল না। এমন কি পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত নাকি বলিয়াছিলেন, ‘ও সব কিছু বুঝি না।’ কিন্তু ইতোমধ্যে আর একদল থিয়োসফিষ্টদের ভাব লইয়া বৈজ্ঞানিক ধরনে হিন্দুধর্মের নব ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন এবং সাহেবদিগের টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে গীতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দু-এক জন টোলের পণ্ডিতও বিজ্ঞাতীয় সাহায্য ব্যতিরেকে এই পস্থা অবলম্বন করিলেন। ইহা ভাল কি মন্দ সে কথার প্রয়োজন নাই, তবে ইহা দ্বারা এইটুকু প্রমাণিত হয় যে, কতিপয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি সনাতন ধর্মের মধ্যে কোন সত্য আছে কিনা তাহারই নির্ণয়ে সযত্ন হইয়াছিলেন। ইহাতে পুরাতন গ্রন্থাদির কতক গ্রহণ করিয়া ও কতক প্রক্ষিপ্তবোধে বাদ দিয়া একটা সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। বঙ্কিম বাবু, শশধর তর্ক-চূড়ামণি প্রভৃতি মনীষিবৃন্দকে এই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা-প্রণালীর প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। ইতোমধ্যে বাঙ্গালার এক নিভৃত পল্লীর দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ভাবনের জন্ত এক মহাত্মা আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। এই ঐশীশক্তিসম্পন্ন, ধর্ম ও সত্যের মুর্তিমান বিগ্রহ, অতিলৌকিক দেবমানবের কথা আর কি বলিব? ইনি বর্তমান কালের ধর্মবিপ্লব



হইতে জগৎকে রক্ষা করিবার জন্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বোধ হয় আজ বাংলাদেশে এমন হিন্দুসংসার নাই যেখানে লোকে প্রাতঃসন্ধ্যা ভক্তিতে তাঁহার নাম স্মরণ না করে এবং এমন গৃহ নাই যেখানে তাঁহার অন্ততঃ একখানিও প্রতিকৃতি না দেখা যায়। তাঁহার আবির্ভাবে সমগ্র জগৎ ধাত্ত ও পবিত্র হইয়াছে এবং হিন্দুধর্মের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছে। এই মহাপুরুষ খ্রীশ্চীরামকৃষ্ণ পরমহংস। ইনি যখন প্রাণপণ সাধনা দ্বারা সকল ধর্মের সত্যতা প্রদর্শন ও সমন্বয় বিধান করিলেন তখন বাংলার ইংরেজো-শিক্ষিত দলের মুখপাত্রগণ একে একে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইলেন। ভক্তপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মের স্তম্ভস্বরূপ ব্যক্তিগণ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ছাত্র বিজ্ঞানবাদী, হেষ্টি সাহেবের ছাত্র উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ দেশমাত্র পণ্ডিতগণ একে একে তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ধাত্ত ও বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ইনি স্বীয় জীবনে উপলব্ধি করিয়া দেখাইলেন যে, উপনিষদ্রুক্ত নিরাকার ঈশ্বরও সত্য, আবার কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি সগুণ ঈশ্বরও সত্য। এমন কি, পুরাণোক্ত দেবদেবী-লীলা পর্য্যন্ত মিথ্যা নহে। এই মহাপুরুষের অসাধারণ আধ্যাত্মিক প্রতিভা-দর্শনে অনেকে এক্ষণে ইঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথায় প্ররোজন নাই। আমরা শুধু দেখিব তাঁহার জন্মগ্রহণে ধর্ম-জগতে কি নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে। ইহা বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার জীবনটি দেখিলেই হইবে না। তাঁহার জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত আর একটি জীবনও বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিতে হইবে। সেটি হইতেছে পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবন

কারণ প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব-সমূহ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরমহংসদেবের মাহাত্ম্য সম্যক জ্ঞদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার জীবন হইতে বিবেকানন্দকে বাদ দেওয়া চলে না। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রাম সর্বগুণসম্পন্ন অলোকগামাত্ম পুরুষ জগতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের জুলিয়াস সীজার, আলেকজান্ডার দি গ্রেট ও ইদানীন্তন কালের মহাবীর নাপলিয়ঁ প্রভৃতি ২১৪জন মহাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার গ্রাম সর্ববিষয়ে শক্তিশালী পুরুষ বোধ হয় ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সঙ্গীত, শিল্পকলা, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র সর্ববিষয়ে অগ্রগণ্য—এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাগ্মী, মেধাবী, কর্মকুশল, ক্রীড়াকৌতুক-রহস্তনিপুণ, অমল-চরিত্র, আবাণ্য ব্রহ্মচর্য্যপরাণ লোকশিক্ষক জগতে কখনও জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। সকল দিক হইতে এমন সুপাত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকের সেই জন্ত ধারণা আছে, বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত নাম শুধু তাঁহারই জন্ত, তাঁহার মত শিষ্য লাভ করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ বলিবার কারণ এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যাহারা দেখেন নাই তাঁহারা অনেকেই প্রথমে স্বামীজীর আকর্ষণেই আকৃষ্ট হইয়া শেষে তাঁহার গুরুর সম্বন্ধে জানিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। হইতে পারে স্বামীজীর গ্রাম অদ্বিত মনস্বী শিষ্য না থাকিলে হয়ত পরমহংসদেবের নাম এত দিনে বিস্মৃতি-সাগরে লীন হইয়া যাইত, কিন্তু যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, শিষ্যের শক্তিতেই গুরুর এত মহত্ত্ব, তবে তাঁহাদের মত ভ্রান্ত আর কেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কুপালাভ না হইলে স্বামীজীর গ্রাম গুণবান্ পুরুষ আর যাহাই হউক, যাহা হইয়াছিলেন তাহা কখনই হইতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবই নরেন্দ্রনাথ দত্তকে



বিবেকানন্দ স্বামীতে পরিণত করিয়াছিলেন। স্বামীজী নিজে এসম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'পরমহংসদেব ইচ্ছা করিলে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী করিতে পারেন।' কারিগর ওস্তাদ, উপাদানও উত্তম, তাই জিনিসটি এত নয়নাভিরাম ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ না থাকিলে যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য এত প্রচারিত হইত কি না যাহারা সন্দেহ করেন, অপর পক্ষে তাঁহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব না থাকিলে বিবেকানন্দও এরূপ বিশ্ববিখ্যাত হইতেন কি না সন্দেহ। দুইটি জীবন পরস্পরসাপেক্ষ,—উভয়কে একত্রে দেখিতে হইবে, নতুবা এ রহস্যের মর্ম্ম কেহ বুঝিবে না। গুরুকৃপা, সাধনা ও চরিত্রবলে সত্যের সন্ধান পাইয়া স্বামীজী দেশকে বিপথ হইতে প্রকৃত পথের দিকে লইয়া যাইবার সক্ষম করিলেন। কিন্তু পূর্ব পূর্ব সংস্কারকের আয় করাণ কুঠার হস্তে প্রাচীন সমাজের মূলোচ্ছেদ করা তাঁহার আদৌ অভিপ্রায় ছিল না। তিনি জ্ঞানালোক-বিস্তার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সংস্কার-সম্পাদনের জন্ত আপন উন্নত ও উদার হৃদয়ের প্রেরণায় স্বীয় মুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া অদ্বুত ত্যাগের আদর্শ শীর্ষে বহনপূর্বক হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিলেন। তদ্বারা তাঁহার এই অভিজ্ঞতা জন্মিল যে, এদেশের প্রধান অভাব দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য দূর করিতে না পারিলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সংস্কার কিছুই হইবে না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন রাজনৈতিক আন্দোলন বা শাসক-সম্প্রদায়ের উপর দোষারোপ করিলেই এই দারিদ্র্য দূর হইবে না। ইহার জন্ত দেশের লোককে স্বাবলম্বনপর করা প্রয়োজন। তিনি বুঝিলেন যে, এ দেশের লোকের শতাব্দীব্যাপী মানসিক ও নৈতিক জড়তা দূর করিতে হইলে ইউরোপ ও আমেরিকার কর্ম্মশীল জাতিদিগের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু ভিক্ষুকের আয় হস্ত প্রসারণ করিলে ভিক্ষা ত কেহ দিবেই

না, পরন্তু লাঞ্ছনা ও অবমাননা অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্তু তিনি স্থির করিলেন আদান-প্রদান-নীতি অবলম্বন করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। আমাদের যাহা আছে তাহা ঐশ্বর্য্যশালী পাশ্চাত্য জাতিদিগকে দিব এবং তাহার পরিবর্তে তাহা-দিগের নিকট হইতে শিল্পবিজ্ঞানাदि শিক্ষা করিব। এইরূপ বিনিময় দ্বারা উভয় জাতির মধ্যে সৌখ্য ও সৌহার্দের বন্ধনও দৃঢ়ীভূত হইবে; অর্থাৎ ধর্ম্মবলে জগতে ভেদ, বৈষম্য, দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা, দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি দূর হইয়া এক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হইবে, সকলের মধ্যে আবার মৈত্রী, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইবে—এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি আমেরিকা যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার কিরূপ সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে সর্বজনসুবিদিত। কিন্তু তিনি নাম-যশের কাঙ্গাল ছিলেন না; সেখানে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ম্মবীর ইংরেজের দেশে। ইংরেজ জাতির মধ্যে অনেক মহানুভব ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহার ভাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রান্ত সংস্কার নির্মূল হইয়া অনেক নূতন জ্ঞান জন্মিল। তারপর তিনি সমুদয় ইউরোপখণ্ড ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি সন্দর্শন করিয়া বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন এবং তৎসাহায্যে ভারতীয় রীতিনীতির সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া কোন্টি গ্রহণযোগ্য ও কোন্টি বর্জনীয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। কয়েক বর্ষ কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এ দেশের লোককে বিশ্বাসীর আসরে দাঁড়াইবার উপযুক্ত করিয়া গঠিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এই বিপুল পরিশ্রমের ফলে শীঘ্রই পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে মর্ত্যলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। যাহা হউক,



পার্থিব দেহ ত্যাগ করিলেও তাঁহার প্রভাব বিলুপ্ত হয় নাই, বরং উহা উত্তরোত্তর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং আশা করা যায় কালে আরও সুদূরপ্রসারিত হইবে। তাঁহার আদর্শ অবলম্বন করিয়া আজকাল অনেকে অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের অবতারণা করিতেছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। এমন কি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে তাঁহার ভাবগুলির সাহায্যে আপনাপন সম্প্রদায়কে অধিকতর উন্নত করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহাতে মনে হয় ভারতে আবার এক নবীন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। সে যুগের প্রবর্তক বা প্রধান পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার ভাব ও আদর্শ জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্কিংশে ভারতের সর্বত্র অব্যাহতভাবে প্রসারিত হইতেছে। এইরূপ হওয়া উচিত ও বাঞ্ছনীয়। কারণ নিজেদের উন্নতি নিজেদের চেষ্টার উপর নির্ভর করে, আর উহা যতটা বিপথে চালিত না হইয়া ধর্ম ও সং পথে চলে ততই ভাল।

স্বামীজী যে এইরূপ সার্বভৌম ও সার্বজনীন সংস্কাররূপে গৃহীত হইয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সমাজসংস্কার বা রাজনীতিচর্চা দ্বারা এদেশের উন্নতি সম্ভব নহে। জ্ঞান, বৈরাগ্য, অহিংসা, নির্লোভতা, নিরহঙ্কার ও কর্মযোগ চিরদিন যে দেশের আদর্শ, সে দেশ ধর্মের উন্নতি ব্যতীত অল্প কিছু দ্বারা উন্নত হইবে না। আর সে ধর্ম কতকগুলি লোকাচার ও দেশাচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; তাহা আৰ্য্য ঋষিদিগের প্রচারিত উদার বেদান্ততত্ত্ব। তাই তিনি বেদান্তের বিজয়-ছন্দুভি ঘোষণা করিলেন—  
অমনি শত সহস্র ধর্মপিপাসুহৃদয় তাঁহার পতাকাতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বক্তা অনেক আছেন, পণ্ডিত অনেক আছেন, জ্ঞানী অনেক আছেন, কর্মীও অনেক আছেন, তথাপি এমনটি আর কখনও

ঘটে নাই তাহার কারণ কি? তাহার কারণ তাঁহার চরিত্রের অদ্বিত পবিত্রতা, আত্মশক্তিতে অদম্য বিশ্বাস ও আচড়ালে অপকট প্রেম। এই তিনটি প্রধান গুণ অথ সকল গুণের ভিত্তিভূমি হইয়া তাঁহার চরিত্রকে এত অনুপম করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এ গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম-জীবনের গূঢ়রহস্য বা আধ্যাত্মিক অলৌকিকত্ব লইয়া অধিক আলোচনা করি নাই। এ সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' অথবা শ্রীম-প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত,' চতুর্থ ভাগ পাঠ করিলে অনেকে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। আমরা শুধু সাধারণ হিসাবে লৌকিক জগতের দিক দিয়া তিনি যে কত বড় মহৎ ব্যক্তি ছিলেন তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পরমহংসদেব তাঁহার সম্বন্ধে যে-সব গুহ্য কথা বলিতেন তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিবেন বা বিশ্বাস করিবেন কিনা সন্দেহ, আমরাও সেজ্ঞা ঐসকল কথার অবতারণা করি নাই। তবে ঐসকল কথার উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার দেবদুর্লভ চরিত্রের বিশেষত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে ; দেখান যাইতে পারে এই অমানব পুরুষের গৌরবে সমগ্র জগৎ গৌরবান্বিত—ইনি মনুষ্যজাতির শিরোমণি।

উপসংহারে বলব্য যে, এই গ্রন্থপ্রণয়ন-উপলক্ষে মায়াবতী অর্ধৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ উক্ত আশ্রম হইতে প্রকাশিত স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর বঙ্গভাষায় অনুবাদের জন্য অনুমতি প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামী তাঁহার 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে আবশ্যকমত ঘটনাবলী উদ্ধৃত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্ম তাঁহার নিকটও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ এবং সর্বশেষে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ স্বামী এই গ্রন্থ বাহাতে কোনরূপ অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট



১/১১/৩/৪০৬

না হয় এবং সত্য ঘটনা-পূর্ণ থাকে তজ্জন্ত স্বীয় শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়াও অকাতরে যে বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহার নিকট চির-ঋণে আবদ্ধ রহিলাম। তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইত। এজ্জন্ত তাঁহাকে এস্থলে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমি স্বয়ং এই ব্যাপারে শুধু কাঁঠ-বিড়ালের কার্য্য মাত্র করিয়াছি বলিয়া মনে করি। ইতি—

ভবানীপুর  
শ্রাবণ, ১৩২৬

}

প্রস্তুতকার











## সিমুলিয়ার দত্তবংশ

৭/১০৬

যিনি উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতার অন্তর্গত সিমুলিয়া নামক স্থানে প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম ৬বিম্বনাথ দত্ত ও পিতামহের নাম ৬হুর্গাচরণ দত্ত। নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্বে সংক্ষেপে তাঁহার পিতা ও পিতামহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি অনুরাগ একপ্রকার তাঁহাদের বংশগত ধারা।

হুর্গাচরণ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সঙ্গীতবিদ্যায়ও তাঁহার সম্যক পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার পিতা রামমোহন দত্ত সুপ্রীম কোর্টের একজন খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তদুপাযুক্ত অর্থে দত্তবংশের যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি ও পসার-প্রতিপত্তি হইয়াছিল। হুর্গাচরণও আইন ব্যবসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং শীঘ্রই ধনে মানে পিতার সমকক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং সর্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিতেন। ধন মান বশঃ তাঁহাকে অধিকদিন আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণভার আত্মীয়স্বজনদের হস্তে সমর্পণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলেন এবং পাঁচ-ছয় বৎসর ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ৬কাশীধামে উপনীত হইলেন। সে-সময়ে ৬কাশীধামে বাইতে হইলে পদব্রজে বা নৌকাপথে বাইতে হইত, কারণ তখন এদেশে রেলগাড়ীর প্রচলন হয় নাই। হুর্গাচরণের সংসার-

## স্বামী বিবেকানন্দ

ত্যাগের পাঁচ-ছয় বৎসর পরে তাঁহার স্ত্রী অষ্টমবর্ষীয় শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে বারাণসীধামে যাইতেছিলেন। দেড় মাস পরে তাঁহার বারাণসী পৌছিলেন। পথে নৌকার উপর খেলা করিতে করিতে বিশ্বনাথ জলমগ্ন হইয়াছিলেন এবং পুত্রবৎসলা জননী পুত্রের জীবনরক্ষার জন্ত অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া আপন প্রাণের মমতা পরিত্যাগ-পূর্বক মজ্জমান পুত্রের উদ্ধারকল্পে ভাগীরথী-সলিলে বান্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। সেদিন মাতা-পুত্র উভয়েরই প্রাণনাশ হইত, কিন্তু বিধিক্রপায় নৌকার মাঝিমাল্লার যত্নে উভয়েই রক্ষা পান। যখন উহার মাতা-পুত্র উভয়কে জল হইতে তুলিল, তখন দেখা গেল, স্নেহময়ী জননী পুত্রের একখানি হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আছেন! বহুকাল পর্য্যন্ত বিশ্বনাথের হস্তে ঐ দাগ ছিল।

৬কাশীধামে পৌছিয়া দুর্গাচরণ-পত্নী বহু দেবদেবী দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। দৈবক্রমে একদিন বৃষ্টি হওয়াতে তিনি ৬বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া যান। অনৈক সাধু তাহা লক্ষ্য করিয়া “মায়ি গির্ গিয়া” বলিয়া দোড়াইয়া আসিলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—কে এ সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী যখন মুচ্ছিতপ্রায় দুর্গাচরণ-পত্নীকে সম্বন্ধে বহন করিয়া মন্দিরের সোপানে স্থাপিত করিলেন, তখন পলকের জন্ত চারি চক্ষুর মিলন হইল। উভয়েই উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। হা বিধিচক্র! সন্ন্যাসী আর কেহ নহেন—স্বয়ং দুর্গাচরণ।

স্ত্রীকে চিনিতে পারিয়াই তিনি অশ্রুটস্বরে “মায়্য হ্যায়, মায়্য হ্যায়!” এই কথা বলিতে বলিতে দ্রুতপদে সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ত্যাগী পুরুষ! রমণীও ত্যাগশীলা! বহুদিনের পর অকস্মাৎ স্বামীর পবিত্র



## সিমুলিয়ার দত্তবংশ

মুখদর্শনে দুর্গাচরণ-পত্নী আন্তরিক তৃপ্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর তাঁহাকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা তাঁহার মনে উদ্ভিত হইল না। তিনি মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন এবং নতজানু হইয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিলেন।

\*

\*

\*

তাহার পর মাতাপুত্রে ৬কাশীধাম হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। মাতা পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে সংসারবাত্মা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পুত্র খেলাধুলায় কয়েক বৎসর কাটাইয়া অবশেষে বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ দিল।

সিমুলিয়ার সে দত্তবাড়ী আজও আছে। এখন আর সে পূর্বের গোরব নাই। সে দেউড়িতে দ্বারবান নাই; দাসদাসী, লোকজন, মক্কেল-মুহুরী, বন্ধুবান্ধবের নিত্য কোলাহল নাই; সে উৎসব, জাঁকজমক, ব্রত-পূজা কিছুই নাই; শুধু বিপুলায়তন প্রবেশদ্বারটি জীর্ণচ্ছাদ, ভগ্ন-প্রাচীর অট্টালিকার লুপ্ত গোরবের ক্ষীণ স্মৃতি নীরবে বক্ষে বহন করিতেছে, আর অধিকাংশ জায়গাজমি এক্ষণে অপরের হস্তগত হইয়াছে। গোর-মোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটে বাইলে আজিও সে ভগ্নগৃহ প্রত্যক্ষ হয়। তখন ঐশ্বর্য ছিল, দত্তবংশের কীর্ত্তি-কথা লোকের মুখে মুখে ফিরিত; দত্তবাড়ী চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লীমধ্যে সগর্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিত—সকলেরই সুপরিচিত ছিল। আর আজি—আজি সে বাটী এই প্রাসাদ-পরিপূর্ণ বিশাল কলিকাতা নগরীর একপার্শ্বে নগণ্য, ক্ষুদ্র, সাধারণের অপরিচিত। অহো! কালের কি বিচিত্র মহিমা! যে দত্তবংশ একদিন মানসম্মত সমুন্নত ছিল, পার্থিব সমৃদ্ধির হিসাবে আজি তাহার স্থান কোথায়!

## স্বামী বিবেকানন্দ

কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় দত্তবংশ প্রকৃতই ধনে, মানে, বিজ্ঞায়, বুদ্ধিতে, প্রতিষ্ঠায় সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিল।

দুর্গাচরণ-পুত্র বিশ্বনাথ শৈশবেই এরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে, পরিবারস্থ সকলেরই মনে এইরূপ আশার উদয় হইল।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথানুসারে দ্বাদশ বৎসর পরে দুর্গাচরণ একবার জন্মস্থান দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে স্বগৃহে গমন না করিয়া এক বন্ধু-গৃহে উপস্থিত হন ও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যেন তাঁহার আগমন-বার্তা তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচারিত না হয়। বন্ধু কিন্তু ঐ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া গোপনে দত্তবাটীতে সংবাদ দিয়াছিলেন। শ্রবণমাত্র দত্ত-পরিবারের সকলে বন্ধুর গৃহে আসিয়া একপ্রকার জোর করিয়া সন্ন্যাসীকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবামাত্র বালক বিশ্বনাথ সাধুদর্শন করিবার জ্ঞাত দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে না লইয়া শুধু হস্তপ্রসারণপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন। বহুদিনের পর তাঁহার দর্শন পাইয়া সকলের আনন্দ উছলিয়া উঠিল। তাঁহারা আর ছাড়িয়া দিবেন না স্থির করিয়া সন্ন্যাসীকে এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং তাঁহাকে সংসারাত্মকে পুনঃপ্রবেশ করিবার জ্ঞাত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে একবার স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিয়াছে, সে কি আর পিঞ্জরাবদ্ধ হইতে চায়? সন্ন্যাসী তিন দিবস চক্ষু নিম্নীলিত করিয়া জড়বৎ ঘরের এক কোণে বসিয়া রহিলেন। তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন ভাবিয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন



## সিমুলিয়ার দত্তবংশ

এবং গৃহদ্বার পূর্বের ছায় রুদ্ধ না রাখিয়া উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন।  
পরদিন দেখা গেল সন্ন্যাসী অস্তিত্বিত হইয়াছেন।

এ বিশাল ভগতে আবার একা! সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। স্ত্রী-  
পুত্রের কথা কি ফণিকের ভ্রমণে মনে উদ্ভিত হইয়াছিল?—কে বলিতে  
পারে? তিনি পুত্রমুখ দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে মুখ তাঁহার  
বৈরাগ্যদৃষ্টি চিত্তপটে একটা ক্ষীণ রেখাও আঁকিতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ।  
বরং মনে হয় তিনি আর তখন শিশুটিকে পুত্রজ্ঞান না করিয়া জীবনের  
শ্রেষ্ঠ অর্থ্যরূপে বিশ্বপিতার চরণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছিলেন।

আর স্ত্রী?—সে পতিপ্রাণা স্বামি-বিরহিনীর দর্শন আর তাঁহার ভাগ্যে  
ঘটে নাই! শুনিলেন এক বৎসর পূর্বে তিনি ইহলোক ত্যাগ  
করিয়াছেন।

মায়াবন্ধন ঘুচাইবার ভ্রম পরমেশচরণে প্রার্থনা করিতে করিতে  
সন্ন্যাসী দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

এ জীবনে আর কেহ কখনও তাঁহার দর্শন পায় নাই।

## পিতামাতার পরিচয়

পুত্র বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত নানা ভাবায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং পূর্বপুরুষদিগের পন্থানুসরণ করত আইনব্যবসায় প্রবীর্ণ হইলেন। তিনি হাইকোর্টে এটর্নীগিরি করিলেও শীঘ্রই এরূপ প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, মফঃস্বল হইতেও তাঁহার ডাক আসিত। তিনি প্রথম বুদ্ধি ও মেধাবলে ব্যবহারশাস্ত্র ব্যতীত অগ্ন্যগ্ন শাস্ত্রেও সবিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসপাঠে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং বিভিন্ন জাতির উন্নতি-অবনতির কারণানুসন্ধানে তিনি সাতিশয় কোতুহল বোধ করিতেন। কিন্তু শুধু যে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান ও বহুদর্শিতা ছিল তাহা নহে, তিনি অতিশয় ভোগপ্রিয়ও ছিলেন। তাঁহার মত ছিল, সংসারে থাকিতে হইলে বেশ ভালভাবে থাকা উচিত। যদি সংসার করিতে চাও ত পুরাদস্তুরই কর, প্রাণ ঢালিয়া কর, সব সাধ মিটাইয়া, সব আকাজক্ষার শেষ করিয়া, সর্ববিষয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া ছাড়। আনো, ঢালো, খাও; যতদিন অর্থ আছে স্নখে স্বচ্ছন্দে কাটাও; নিজে খাও, পরকে খাওয়াও, রাজার হালে চল। তাঁহার চালচলন ও জীবনযাপন-প্রণালীও ঠিক তাঁহার চিন্তা ও মতের অনুগামী ছিল। তিনি দীনহীনভাবে জীবনযাপন করিতে জানিতেন না। প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেন এবং ব্যয়ও করিতেন অকাতরে। তাঁহার বিস্তর বন্ধু ছিল এবং খুব কম লোকই তাঁহার ছায় সহজে আলাপ জমাইয়া লইতে পারিত। সরসপ্রাণ বিশ্বনাথ এইসকল বন্ধু-বান্ধব লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে ও লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি নিজে



## পিতামাতার পরিচয়

রন্ধনবিদ্যায় পটু ছিলেন। তাঁহার মত আদর-স্বস্ত করিয়া নানাবিধ ভোজ্যবস্তু দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তিসাধন করিতে অল্পলোকেই পারিত। তিনি প্রত্যহ স্বচক্ষে রন্ধনশালা পরিদর্শন করিতেন এবং একটা না একটা অভিনব আয়োজনের অবতারণা করিতেন। অতিথি-অভ্যাগতদিগকে ভোজন করাইবার উদ্দেশ্যে নূতন প্রকারের ত কিছু করাই চাই—তাও আবার স্বহস্তে।

তাঁহার আর একটি সখ ছিল—দেশভ্রমণ। আজি একস্থানে, কালি একস্থানে—কখন কোথায় যাইবেন কিছুমাত্র স্থির থাকিত না। হঠাৎ আসিয়া বলিতেন—চল অমুক স্থানে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লক্ষ্মী লাহোর প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান স্থানে কিছুকাল বাস করায় তিনি মুসলমান আচার-ব্যবহারের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। নিত্য পলান্নভোজনের প্রথা সম্ভবতঃ এই সূত্রে তাঁহার পরিবারমধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

মোটের উপর বিশ্বনাথ বাবু একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন এবং তাঁহার জীবনটি কাব্যের ছায় মধুর ছিল।

কিন্তু তিনি যে শুধু সৌখীন বাবুটি ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার হৃদয় দয়ার আধার ছিল। পরের জন্ত তাঁহার প্রাণ কাঁদিত ও পরোপকারার্থ তিনি যুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি বহু আত্মীয়ের প্রতিপালক ও গরীবের মা-বাপ ছিলেন এবং কেহ তাঁহার সাহায্য চাহিয়া কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। তাঁহার বাড়ীতে অনেক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেন এবং কেহ কেহ আবার নেশাভাস্ত্রও করিতেন। নরেন্দ্র বড় হইয়া ঐসকল অবোগ্য ব্যক্তিকে দানের জন্ত পিতার নিকট অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, “জীবনটা যে কত দুঃখের তা এখন, কি..বুঝি.? যখন বুঝতে পারবি তখন এ দুঃখের হাত

## স্বামী বিবেকানন্দ

থেকে কৃষিক নিস্তারলাভের জন্ত যারা নেশাভাঙ্গ করে তাদের পর্য্যন্ত দয়ার চ'খে দেখবি।" তাঁহার মত ছিল, জোর করিয়া লোককে সংশোধন করিতে যাওয়া অপেক্ষা বাহাতে সে নিজ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আপন চরিত্র সংশোধন করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। যতক্ষণ একটা ক্ষুদ্র বা নীচ বিষয়ে আসক্তি থাকে ততক্ষণ উচ্চ বস্তুর ধারণা হয় না। কিন্তু সে আসক্তির মোহ যখন আপনিই কাটিয়া যাইবে, তখন প্রাণে উচ্চ চিন্তা বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে পারে।

পরিবারবর্গের সুখবিধান ও আনন্দবর্দ্ধন করা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পুত্রদিগের জন্ত, বিশেষ জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথের জন্ত তিনি বিন্দুমাত্র ভাবিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল তাহারা সকলেই কালে মানুষ হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র বাইবেল ও ফার্সি কবি হাফেজের বরেৎসমূহের মধ্যে যেরূপ গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে আর কোথাও সেরূপ নাই। তিনি প্রত্যহ ঈশার গুণ্যচরিত ও হাফেজের কবিতাসকল পাঠ করিতেন এবং মাঝে মাঝে উহাদিগের কিছু কিছু স্ত্রী-পুত্রদিগকেও শ্রবণ করাইতেন।

বিশ্বনাথ যে অবস্থার থাকুন না কেন কখনও হৃদয়ের মহত্ত্ব হারান নাই। লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কাহাকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হয়, এসকল তিনি উত্তমরূপে বুঝিতেন। সাধারণতঃ তাঁহার হৃদয় স্নেহপ্রবণ ও ব্যবহার অতি মধুর ছিল, কিন্তু তাঁহাতে গান্ধীর্ষ্যের অভাব ছিল না। তাঁহার শিক্ষাদানের প্রণালীও বড় সুন্দর ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আপনি আর আমার জন্ত কি করিয়াছেন?' তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ দর্পণের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বা, আরশিতে নিজের চেহারাটা একবার



## পিতামাতার পরিচয়

দেখ'গে, তা হ'লেই বুঝবি।' আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইল না। পুত্র পিতৃবাক্যের মৰ্ম উপলব্ধি করিলেন। আর এক সময়ে নরেন্দ্রনাথ কোন একটি বিষয় লইয়া মাতার সহিত বচসা করিয়া তাঁহাকে দুই-একটি কটু কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ তাঁহাকে ঐজ্ঞাত্ত তিরস্কার না করিয়া যে গৃহে নরেন্দ্র তাঁহার বরন্তবর্গের সহিত উঠাবসা করিতেন, তাহার দ্বারের উপরিভাগে একখণ্ড কয়লা দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন—‘নরেন্দ্রবাবু তাঁহার মাতাকে অশ্রু এইসকল কথা বলিয়াছেন।’ নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বরন্তবর্গ ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইলেই ঐ কথাগুলি তাঁহাদের চক্ষে পড়িত এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেকদিন পর্য্যন্ত নিজ অপরাধের জ্ঞাত্ত যথেষ্ট লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতেন।

‘সংসারে কিরূপভাবে চলা উচিত’—এই সম্বন্ধে নরেন্দ্র একদিন পিতার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, ‘কখনও কোন বিষয়ে বিশ্বয় প্রকাশ করিও না’ (Never show surprise)। বোধ হয় এই উপদেশানুসারে চলাতেই তিনি পরে স্বদেশে বিদেশে রাজ্যের প্রাসাদে ও ভিখারীর পর্ণকুটীরে সর্বত্র সমভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ-পত্নী ভুবনেশ্বরীও সর্বাংশে পতির অনুরূপা ভাৰ্য্যা ছিলেন। পতির বেক্সপ রাজতুল্য প্রকৃতি—পত্নীও তেমনি। যাহারা ভুবনেশ্বরী মাতাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার ত্রায় রমণীরত্ব এ জগতে হ্রদ। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমতী, কার্য্যকুশলা, সুরূপা ও দেবভক্তিপরায়ণা ছিলেন এবং একাকী সুবৃহৎ সংসারের সমস্ত কার্য্য অনায়াসে নির্বাহ করিয়াও সূচীকর্ষাদি শিল্পাভ্যাসের জ্ঞাত্ত সময় করিয়া লইতেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারত উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন এবং তদ্ব্যতীত স্বামী ও পুত্রগণের নিকট হইতে অনেক বিষয় হুখে

## স্বামী বিবেকানন্দ

মুখে শিখিয়া একরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথোপকথনকালে তাঁহাকে বেশ শিক্ষিতা বলিয়াই বুঝা যাইত। তাঁহার ধারণাশক্তিও অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি রাজরাণীর তুল্য গরীয়সী ও অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন—মিতভাষিনী, গম্ভীরপ্রকৃতি, অথচ ব্যবহারে অতি মিষ্ট। অতঃপর রমণীরা তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিতেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বা তাঁহার নিকটে থাকিতে পারিলে আপনাদিগকে ধাতা মনে করিতেন।

ভগবান তাঁহাকে চারিটি কন্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটি অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এবং পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় তাঁহার মনে শাস্তি ছিল না। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তথাপি একটি পুত্র হইল না। ভুবনেশ্বরী সকাল-সন্ধ্যায় ইষ্ট-আরাধনার সময়ে দেবতার নিকট একান্তচিত্তে প্রাণের বেদনা জানাইতেন।

৬কাশীধামে তাঁহাদের এক বৃদ্ধা আত্মীয়া ছিলেন। ভুবনেশ্বরী তাঁহাকে পত্র লিখিলেন যেন তিনি বংশরক্ষার্থ একটি পুত্রের মানত করিয়া প্রত্যহ বীরেশ্বর শিবের অর্চনা করেন। তদনুসারে বৃদ্ধা ক্ষীণবস্তুসাহায্যে প্রত্যহ ৬বীরেশ্বর-মন্দিরে গিয়া পূজা ও অভীষিত বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভুবনেশ্বরী মাতা বথাসময়ে এ সংবাদ পাইয়া অতিশয় হর্ষলাভ করিলেন।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, ভুবনেশ্বরীর মনে পুত্রপ্রাপ্তির আশা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি দিবারাত্র শিবধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সহস্র সাংসারিক কর্মের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও শিবচিন্তায় বিরত থাকিতেন না। দেবাদিদেব কি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না? যিনি চিরদিন ভক্তের অভীষ্টফলদাতা, তিনি কি এ প্রার্থনা উপেক্ষা করিবেন? ভুবনেশ্বরী প্রত্যহ শিবপূজা, শিবমূর্ত্তিধ্যান ও শিবনামজপে



## পিতামাতার পরিচয়

তন্ময় হইয়া উঠিলেন। গৃহের সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—তাঁহার মুখের কি অপূৰ্ণ শোভা হইয়াছে, দেহ হইতে কি অপার্থিব জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে।

এইভাবে বহুদিন অতীত হইল। একদিন ভুবনেশ্বরী মহাদেবের যোগীশ্বরমূর্তির ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত দিন ঠাকুরঘরে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সেই দিন রজনীযোগে ভুবনেশ্বরী এক অপূৰ্ণ স্বপ্ন দেখিলেন। নিশ্চয়ই কোন্ এক শুভ মুহূর্তে তাঁহার অন্তরের নিবেদন প্রভুর পাদপদ্মে পঁছরিয়াছে, করুণানিলয় দেবাদিদেব তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, নতুবা এরূপ স্বপ্নের অর্থ কি? ভুবনেশ্বরী দেখিলেন যেন যোগীন্দ্র শঙ্কর যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুত্ররূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন! সেই রক্তগিরিসন্নিভ বরবপু নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘শিব! শিব! শিব! এ কি স্বপ্ন না বিরাট সত্যজ্যোতিঃসাগরের একটা তরঙ্গ?’ কে বলিবে বিশ্বেশ্বর কখন কিভাবে ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করেন!

## নরেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকথা

পূর্বোক্ত স্বপ্নদর্শনের কয়েক মাস পরে নরেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠয়ারী কৃষ্ণাশ্বিনীতিথিতে কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে দিন পৌষ-সংক্রান্তি—মকরবাহিনী পূজার দিন, স্মতরাং বাঙ্গলা দেশে ভারী ধুমধাম।

নবপ্রসূত শিশুর সহিত তদীয় পিতামহ দুর্গাচরণের অবয়বগত সাদৃশ্য দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। সকলেই মনে করিলেন বুঝি দুর্গাচরণই দেহত্যাগান্তে পুনরায় এই কলেবরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, নামকরণের সময় কেহ কেহ বলিলেন, ছেলের নাম হউক দুর্গাদাস। কিন্তু ভুবনেশ্বরী শিশুর নেত্রমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—“নাম? উহার নাম ‘বীরেশ্বর’।” এ নামে অবশ্য কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। স্মতরাং সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া সেদিন হইতে শিশুকে বীরেশ্বর বা ‘বিলে’ নামে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু বিলে ত হইল ডাকনাম, ভাল নাম কি রাখা যায়? স্থির হইল—নরেন্দ্রনাথ।

দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রনাথ তিন বৎসরে পড়িলেন। কিন্তু বালক বড় চঞ্চল। তাঁহার বিরুদ্ধে দিনরাত নানাবিধ শাস্তিভঙ্গের অভিযোগ শুনা যাইতে লাগিল। মাতা পুত্রকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না, পুত্র বড় একরোখা। যা ধরিবে তা করিয়া ছাড়িবে, কিছুতেই তাহাকে বশ করা যায় না। তাহার দৌরাণ্যে সকলে অস্থির। বকুনি, ধমক, ভয়-প্রদর্শন—কিছুতেই কিছু হয় না। পুত্রের ক্রোধ দেখিয়া মা বলিতেন, ‘অনেক



## নরেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকথা

মাথা খুঁড়ে শিবের কাছে একটা ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটা ভূত।' ক্রোধ-প্রশমনার্থ অনেক সময় তিনি পুত্রের মস্তকে হড়হড় করিয়া জল ঢালিয়া দিতেন ও ভয় দেখাইয়া বলিতেন, 'যদি ছুঁমি করিস্ তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।' বালক অমনি চীৎকার, ক্রন্দন ছাড়িয়া চুপ করিত।

অনেকদিন পরে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য শিষ্যেরা বৃদ্ধা ভুবনেশ্বরী মাতার নিকট এইসকল গল্প শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, স্বামীজী তা হলে ছেলেবেলায় বড় ছরস্তু ছিলেন?' মাতা উত্তর করিয়াছিলেন, 'কি বল গো! তাকে দেখবার জন্ম ছুটো যি অষ্টপ্রহর তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো।' তিনি গল্প করিতেন, 'ছেলেবেলা থেকে নরেনের একটা মহৎ দোষ ছিল। কোন কারণে যদি কখনও রাগ হ'ত তা হলে আর জ্ঞান থাকত না, বাড়ীর আসবাবপত্র ভেঙ্গে-চুরে তচ্‌নচ্‌ করত।'।

বাটীতে সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে নরেন্দ্রনাথ অমনি দেখিতে ছুটিতেন। কোনরূপে তাঁহাকে তখন ধরিয়া রাখা যাইত না। সন্ন্যাসী কিছু চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থিত দ্রব্য আনিয়া দিতেন। ইহাতে অনেক সময় বড় মুস্কিল হইত। একবার তাঁহার নূতন কাপড় হইয়াছে, সেখানি পরিয়া তিনি সমবয়স্ক সঙ্গীদিগের সহিত খুব আড্ডার করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে 'নারায়ণ হরি!' 'নারায়ণ হরি!' বলিতে বলিতে এক সন্ন্যাসী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ আনন্দে তাঁহার পানে ছুটিয়া গেলেন। সন্ন্যাসী একখানি ধূতি চাহিলেন। বালক অগ্নানবধনে নিজ পরনের ধূতি খুলিয়া তাঁহাকে দিল। কিন্তু সে ছোট কাপড়, আধখানা কোমরে জড়াইতে কুলায় না। সন্ন্যাসী হাসিয়া তাহা পাগড়ী-আকারে মাথায় পারিলেন ও বালককে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

সে সময়ে দত্তবাটীতে প্রায়ই পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। বিশ্বনাথ বাবু সন্ন্যাসী ককিরের প্রতি বড় শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং পরম যত্নে তাঁহাদের সেবা করিতেন। কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পর হইতে সন্ন্যাসী আসিলেই বালক নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসীর প্রস্থানকালের পূর্ব পর্য্যন্ত ঘরে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু বালক তাহা বড় গ্রাহ্য করিতেন না, যেই দেখিলেন নিকটে আর কেহ নাই, অমনি সন্মুখে বাহা থাকিত, জানালা গলাইয়া সন্ন্যাসীর নিকট ছুঁড়িয়া ফেলিতেন। পরিবারস্থ সকলকে এইরূপে জব্দ করিতে পারিলে বালক আনন্দে আটখানা হইয়া নৃত্য করিতেন।

জ্যোষ্ঠা ভগ্নীদ্বয়ের সহিত নরেন্দ্রের মোটেই বনিত না। তিনি যখন-তখন তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতেন এবং তাঁহারা তাড়া করিলে ছুটিয়া পলাইয়া নর্দমা বা আঁস্তাকুড়ে গিয়া দাঁড়াইতেন ও সেখান হইতে মনের সাথে নানাপ্রকার মুখবিকৃতি করিতেন। আর সেই মুখের ভঙ্গিমাই বা কি! আঁস্তাকুড়ে কেহ তাঁহাকে ছুঁইতে পারিত না, কিন্তু তিনি শুচি অশুচি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, কেবল মৃহ মৃহ হাসিতেন, আর মুখ ভেংচাইতে ভেংচাইতে বলিতেন, 'ধর না, ধর না।'

নরেন্দ্র জন্তু-জানোয়ার লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসিতেন। বানর, ছাগল, ময়ূর, কাকাতুয়া, পায়রা ও কতকগুলি বিলাতী ইঁদুর—ইহারাই তাঁহার খেলার সাথী ছিল, ইহা ছাড়া তাঁহাদের বাটীর গাভীটিও তাঁহার পরম প্রিয় ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার গলায় ফুলের মালা ও কপালে সিঁহর লাগাইতেন এবং গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার সহিত নানাবিধ মিষ্টালাপ করিতেন।

শৈশবে তাঁহার একটি প্রধান বিষয়ের বিষয় ছিল—কলিকাতা শহরের অসংখ্য গাড়ীর ঘর্ষ-শব্দ। গাড়ীর শব্দ শুনিলেই তিনি লুকাইয়া রাত্তার



## নরেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকথা

বাহির হইয়া বাইতেন, আর অবাধ হইয়া শকটশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। গাড়ীওয়াল গাড়োয়ান তাঁহার চক্ষে একটি উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া বোধ হইত। তাহার কি সোজা লোক! তাহাদিগকে কাহার না প্রয়োজন? তাঁহার মনে হইত, 'হায়, যদি আমি অমনি করিয়া কোচবাক্সে বসিয়া অশ্বযুগলের ত্রাসোৎপাদক চাবুক সপাৎ সপাৎ করিতে করিতে শহরের সমস্ত অজ্ঞাতপ্রদেশে ঘুরিয়া আসিতে পারিতাম!'

একদিন গাড়ী করিয়া পিতামাতার সহিত বেড়াইতে গিয়াছেন ও মার ক্রোড়ে বসিয়া পিতাকে অসংখ্য সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন করিতেছেন, এমন সময়ে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিলে, তুই বড় হয়ে কি হবি বল দেখি?' বালক ঝটিতি উত্তর করিল, 'সহিস কিংবা কোচোয়ান!' সহিস বা কোচোয়ান পদবী লাভ করাই যে মনুষ্যজীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা, এ বিষয়ে বালকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই উচ্চ ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি সদাসর্বদা আন্তাবে গিয়া দেখিতেন কে কি করিতেছে। সেইটাই তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। দিনের অধিকাংশ সময় সেইখানেই থাকিতেন; ঘোড়াগুলিকে তিনি খুব ভালবাসিতেন।

ছেলেবেলায় রামায়ণের কথা শুনিয়া রামসীতার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। একদিন গুটিকতক পয়সা যোগাড় করিয়া পাড়ার একটি ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত বাজার হইতে একজোড়া মাটির রামসীতা-মूर्তি আনিয়া নিজেদের বাটীর দোতলার ছাদের চিলে ঘরে খিল দিয়া হৃৎকনে ঠাকুরপুজায় লাগিয়া গেলেন। ঠাকুরের সম্মুখে উভয়ে চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন, এদিকে অনেকক্ষণ বিলেকে দেখিতে না পাইয়া বাড়ীর সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। মহা হলস্থল বাধিয়া গিয়াছে।

## স্বামী বিবেকানন্দ

চারিদিকে খোঁজ খোঁজ শব্দ। কোথাও বালকের সন্ধান নাই। এমন সময় কাহার মনে হইল ছাদের উপরটা একবার দেখা যাউক। ছাদে উঠিয়াই দেখেন সিঁড়ির ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া দ্বার খোলা না পাওয়াতে অবশেষে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ব্রাহ্মণ-বালকটি বেগতিক দেখিয়া ভগ্নদ্বার-পথে উর্দ্ধ্বাসে দৌড় দিল, নরেন্দ্রনাথ কিন্তু পূর্ববৎ স্থির, নিশ্চল, মুদ্রিতচক্ষু! অবশেষে জোরে ঝাঁকুনি দিলে সেদিন তাঁহার চৈতন্য হয়।

ইহার দিনকতক পরে আর এক মজা হইল। নরেন্দ্রনাথ ত প্রায় আস্তাবলে থাকিতেন। সহিসের সহিত তাঁহার ভারী বন্ধুত্ব, কারণ সে একজন ‘সবজাস্তা’ লোক। যখনই কোন গুরুতর মন্ত্রণা করিবার আবশ্যক হইত, তিনি সহিসের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একদিন রামসীতার পূজার পর তিনি আস্তাবলে গিয়াছেন, কথায় কথায় সহিস গভীরভাবে বলিল, ‘বিবাহ করা বড় খারাপ।’ ঐ ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণবশতঃ দাম্পত্য-জীবনের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। আপন অভিজ্ঞতাবলে সে বুঝিয়াছিল যে বিবাহ করিলেই সংসারে রাগারাগি, ঝগড়া প্রভৃতি নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়, পোষ্যের সংখ্যা বাড়ে, পুত্র-কন্যা প্রতিপালন করিতে হয় এবং আরও নানা অশুবিধা ঘটে। এক কথায় বিবাহ হইলেই যে মানুষের সুখ স্বাধীনতা সব ঘুচিয়া যায়—এইটি সে বিশদভাবে নরেন্দ্রের মস্তকে প্রবেশ করাইল, নরেন্দ্রও তৎক্ষণাৎ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি কখনও বিবাহ করবেন না; কিন্তু আর এক মুষ্কিল উপস্থিত হইল। যে রামসীতাকে তিনি এত ভক্তি করেন, তাঁহারা যে বিবাহিত! মা’র কাছে শুনিয়াছিলেন, সীতারামের প্রেমের তুলনা নাই। সে প্রেম স্বর্গীয় সুখমামণ্ডিত—অপার আনন্দময়। এখন সহিস যে উল্টা বলে! যে



## নরেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকথা

বিবাহ করে তার সুখ নাই! তিনি মহা সমুদ্রায় পড়িলেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সাশ্রনয়নে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। এক কথায় তাঁহার বাল্যস্বপ্ন যেন চূর্ণ হইতে বসিল! তিনি সীতারামের জন্ত আন্তরিক হৃৎকথ বোধ করিতে লাগিলেন। পুত্রের চক্ষে জল দেখিয়া মাতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন—তারপর কঁোপাইতে লাগিলেন। মা পুত্রকে কোলে লইলেন। বালক তখন একান্তে মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া তাঁহার মনের হৃৎকথ খুলিয়া বলিলেন। মা সব শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'বিলে, ওতে আর কি হয়েছে? তুই শিবপূজা কর।'

সন্ধ্যার অন্ধকারে বালক একাকী ছাদের ঘরে উঠিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ নীরবে রাম-সীতার মূর্তিপানে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহা পার্শ্বস্থ রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া শতখণ্ডে চূর্ণ করিলেন। পরদিন বাজার হইতে একটি শিবমূর্তি আনিয়া রাম-সীতার আসনে বসাইলেন এবং আবার তাঁহার সম্মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানাভ্যাসে রত হইলেন।

সন্ধ্যাসী হইবার সাথ তাঁহার শৈশব হইতেই ছিল। বালক এক টুকরা গেরুয়া কাপড় কোপীনের মত কোমরে আঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মা বলিলেন, 'এ কিরে?' বালক উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'আমি শিব হইয়াছি।' প্রাচীনেরা রহস্তচ্ছলে বলিতেন, ধ্যান করিলে মাথায় মূনি-ঋষিদের মত দীর্ঘ জটা বাহির হয় ও তাহা বটের শিকড়ের স্থায় বহুদূর পর্য্যন্ত মাটির ভিতরে চলিয়া যায়। সরল বালক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিয়া যাইতেন ও মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিয়া দেখিতেন মাথা হইতে জটা নামিয়া ভূতলে প্রবৃষ্ট হইয়াছে কি না, যখন দেখিতেন কিছুই হয় নাই তখন ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন 'কৈ, ধ্যান ত

## স্বামী বিবেকানন্দ

করলাম, জটা কোথায় হইল?’ মা বলিতেন, ‘বাছা, এক-আধ ঘণ্টায়, কি এক-আধ দিনে হয় না, অনেক দিন লাগে।’

এইরূপে বাটার লোকেরা প্রায়ই দেখিতেন বিলে কখন একাকী, কখন বা প্রতিবেশী বালকগণের সহিত একত্রে ধ্যানে বসিয়া আছেন। বালক কি ভাবিতেন কে জানে! কিন্তু সময় সময় আপনভাবে এরূপ তন্ময় হইয়া বাইতেন যে সহজে তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইত না।

একদিন এইরূপে ধ্যান চলিতেছে, সহসা একজন বালক দেখিল মেঝের উপর এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ। সে ভীত হইয়া সাপ, সাপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নরেন্দ্র ব্যতীত সকল বালকই দ্রুত হইয়া গৃহের বাহিরে পলায়ন করিল। তিনি কিন্তু ধ্যাননিমগ্ন—সংজ্ঞাশূন্য! সাথীরা ডাকাডাকি করিতে লাগিল, তথাপি উত্তর নাই। তাহারা দেখিল মহা বিপদ। তাড়াতাড়ি তাঁহার পিতামাতাকে সংবাদ দিল। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন—ভয়ানক দৃশ্য! বালক চক্ষু বুজিয়া বসিয়া আছেন, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সাপ ফণা বিস্তার করিয়া ছলিতেছে; উর্দ্ধে আকাশে ক্ষীণ চন্দ্র শোভা পাইতেছে—নিম্নে পৃথিবীর উপর অস্পষ্ট অন্ধকার। শব্দ করিলে পাছে সাপ কোন অনিষ্ট করে, এই ভয়ে তাঁহারা চীৎকার করিতে সাহস করিলেন না। হঠাৎ সাপটি আপনিই সরিয়া গেল। এক মিনিট পরে আর তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ক্ষণকাল পরে বাহ্যজ্ঞান হইলে নরেন্দ্র সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন, কিন্তু বলিলেন, ‘আমি ত কিছুই টের পাইনি।’

প্রসঙ্গক্রমে ইহার কিছু পরবর্তী সময়ের একটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাটি তিনি নিজে এইভাবে বলিয়াছিলেন—‘পঠদশায় একদিন রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যানে বসিয়াছি; ধ্যান শেষ



## বরেন্দ্রনাথের জন্ম ও বাল্যকথা

হইয়া গেল—তথাপি চুপ করিয়া বসিয়া আছি; এমন সময় দেখিলাম, ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করিয়া এক দেবতুল্য প্রশান্ত জ্যোতির্শয় মূর্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর শ্রায় তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, অপর হস্তে কমণ্ডলু এবং মস্তক মুণ্ডিত। মুখে অনির্বচনীয় শাস্তিচিহ্ন বিরাজিত। সেই অপূর্ব জ্যোতির্শয় পুরুষ কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—যেন কি বলিবেন, এইরূপ ভাব। আমিও প্রথমে অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম—কিন্তু তারপর কেমন ভয় হইল, তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলাম। পরে কিন্তু মনে হইল, কেন নির্বোধের মত ভয়ে পলায়ন করিলাম, হয়ত তিনি কিছু বলিতেন।’ যাহা হউক, তিনি আর কখনও সে মূর্তির দর্শন পান নাই, বা তাঁহার সম্বন্ধে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই, তবে বলিতেন—‘সে মূর্তি খুব সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের।’

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার নিদ্রা! তিনি অত্যন্ত বালকের শ্রায় বিছানায় শুইবামাত্র নিদ্রিত হইতেন না। তাঁহার অভ্যাস ছিল উপর হইয়া শয়ন করা। ঐ অবস্থায় নিদ্রিত হইবেন বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভ্রমধ্যে এক অপূর্ব জ্যোতির্বিবলু দর্শন হইত। ঐ অপূর্ব বিবলু নানাবর্ণে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া ক্রমে বিষাকারে পরিণত হইত। তারপর হঠাৎ উহা তারাবাজীর শ্রায় ফাটিয়া গিয়া তাঁহার চতুর্দিক আলো হইয়া যাইত। সেই আলোকসমুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে অবশেষে তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। প্রত্যহ রাত্রে এইরূপ ঘটনা ঘটিত। ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যজনক—কিন্তু তিনি ভাবিতেন বুঝি সকলেরই ঐরূপ হয়। সেইজন্য কখন কাহাকেও ঐ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বহুদিন পরে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট ধ্যান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন,

## স্বামী বিবেকানন্দ

তখন কাহার কেমন ধ্যান হইতেছে জানিতে গিয়া এক সমবয়স্ক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা ভাই, তুমি কি যুমাইবার আগে একটা জ্যোতিঃ দেখ?' বালক তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া থাকিল। কিন্তু আজীবন নরেন্দ্র নিদ্রার পূর্বে এইরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। তবে শেষ সময়ে আর এত ঘন ঘন ও এত বেশী স্পষ্ট হইত না।

পরমহংসদেব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'এটা ধ্যান-সিদ্ধের লক্ষণ।'

বহুবর্ষ পরে তাঁহার এক গুরুভ্রাতা তাঁহাকে এই জ্যোতিঃ দর্শন করাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি আজও বলিয়া থাকেন যে, স্বামীজী বেই তাঁহার কপালে হাত দিলেন অমনি বহির্জগৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাহার স্থলে তিনি শুধু এক অখণ্ড জ্যোতিঃ-সমুদ্র দেখিতে লাগিলেন।

এই জ্যোতিঃদর্শন গভীর ধ্যানের ফল। নরেন্দ্রের শৈশবাবস্থা হইতেই জ্যোতিঃদর্শন হইত শুনিলে স্বতঃই মনে হয় যে, পূর্বজন্মে তিনি অনেক ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহারই জন্ত এ জন্মে ধ্যানটা যেন তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।



No. ....

Sh. &amp; Sh.

na.

শ্রীউদ্ভাসনাথ শ্রীকার

BANARAS

## শিক্ষারম্ভ

ছয় বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ একখানি কোরা ধূতি পরিয়া কোমরে খাঁকের কলম বুলাইয়া মাতুর বগলে পাঠশালার গেলেন। প্রথম বেদিন পাঠশালার যান সেদিন সকালে বাটার পুরোহিত আসিয়া মাটিতে রামখড়ির আঁখর কাটিয়া তাঁহাকে শিখাইলেন—এটা ‘ক’, এটা ‘খ’। নরেন্দ্রও বলিলেন—এটা ‘ক’, এটা ‘খ’। কিন্তু দুই চার দিনের মধ্যেই এমন গুটিকতক অভিধান-বহির্ভূত ভাষা আশ্রয় করিয়া ফেলিলেন যে, পিতামাতা আর তাঁহাকে ওরূপ শিক্ষালয়ে যাইতে দেওয়া বুদ্ধিযুক্ত মনে করিলেন না। পাঠশালা ছাড়াইয়া এক গুরুমহাশয়ের উপর তাঁহার শিক্ষার ভার সমর্পিত হইল। পাঠশালাটি কিন্তু নরেন্দ্রের বড় ভাল লাগিয়াছিল; অনেকগুলি সঙ্গী জুটিয়াছিল—তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া ভূবোর কালিতে তালপাতার উপর বিচিত্র রকমের লিখিবার ছাঁদ অভ্যাস করিতে বেশ আমোদ বোধ হইত। হঠাৎ এ সব ছাড়িয়া বাড়ীর গুরুমহাশয়ের শাসনটা প্রথম তাঁহার বরদাস্ত হইল না। কিন্তু তাঁহার পিতা কতকগুলি আত্মীয় বালককে তাঁহার পড়ার সঙ্গী করিয়া দিলেন। বাড়ীতেই একটা ছোটখাট পাঠশালার মত হইল।

চিরদিন তিনি মিষ্ট কথা বলা ছিলেন, কড়া কথা মোটে সহ করিতে পারিতেন না—বাল্যেও এ স্বভাব ছিল। গুরুমহাশয় চোখ রাঙাইয়া বা মারিয়া ধরিয়া তাঁহার নিকট পড়া আদায় করিতে পারিতেন না, যা কিছু করিতেন গায়ে হাত বুলাইয়া।

পোড়োদের মধ্যে তিনি শীঘ্রই দলপতির আসন অধিকার করিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

খেলাধুলাতেও সকলের অগ্রণী; পর্ক-উৎসবাদি হইলে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া সমস্ত দিনরাত তিনি উৎসবের আমোদে মাতিয়া থাকিতেন। এক মকর-সংক্রান্তির দিন স্নর ধরিলেন, সাথীদের লইয়া দল বাঁধিয়া গঙ্গায় বাইতে ও গঙ্গাপূজা করিতে হইবে। পিতার অনুমতি পাইলেন এবং ধরচও মঞ্জুর হইল। তিনি সঙ্গী বালকদলকে লইয়া বাটী হইতে নিশান উড়াইয়া ফুলের মালা ছুলাইয়া গঙ্গার দিকে চলিলেন, যেন একটা ছোটখাট শোভাযাত্রা। সারাপথ গাহিতে গাহিতে চলিলেন, 'জয় জয় সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে।' পরে গঙ্গায় পৌছিয়া ফুল ও মালাগুলি ভক্তিভরে সলিলশ্রোতে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ধ্যায় আবার সকলে একত্র হইয়া কলার খোলার ছোট ছোট নৌকায় দীপ জ্বলাইয়া গঙ্গাবক্ষে তাঁসাইয়া দিলেন; সে কি সুন্দর দৃশ্য! বালকদল সেদিন ঐরূপ শত শত দীপালোকে গঙ্গাগর্ভ উজ্জল করিয়া তুলিল।

শুনা যায়, নরেন্দ্রনাথের পড়া তৈয়ারী করিবার রীতি একটু নূতন ধরণের ছিল! গুরুমহাশয় প্রত্যেক দিনের পাঠ নিজে পড়িয়া বাইতেন—তখন নরেন্দ্র চক্ষু বুজিয়া শুইয়া থাকিত—তাহাতেই তাঁহার পাঠ আয়ত্ত হইয়া বাইত। রাত্রিতে নরেন্দ্র এক প্রবীণ আত্মীয়ের (ভক্ত রামদত্তের পিতা) নিকট শয়ন করিতেন। এই ব্যক্তির কিঞ্চিৎ সংস্কৃত জ্ঞান ছিল এবং ইঁহার বিশ্বাস ছিল, কঠিন কঠিন বিষয়গুলি বাল্যকাল হইতেই মুখস্থ করাইলে বালকদিগের শিক্ষা খুব অগ্রসর হয়। এই চিন্তার বশবর্তী হইয়া তিনি প্রতি রাত্রিতে নরেন্দ্রকে মুখ্যবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে নরেন্দ্র বৎসরাবধিকালের মধ্যে উক্ত পুস্তকের অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় সাত বর্ষ মাত্র।



## শিক্ষারম্ভ

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে নেতৃত্বের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। সমবয়স্কদিগের সহিত খেলায় তিনি রাজা সাজিতেন। ছুটিতে ছুটিতে পুজার দালানের সর্বোচ্চ সোপানে গিয়া বসিতেন। নীচের সিঁড়ির দিকে দেখাইয়া আর ছ'জন সঙ্গীকে বলিতেন, 'তুমি হচ্ছে রাজমন্ত্রী, আর তুমি সেনাপতি, যাও ওখানে দাঁড়াও।' তাহার নীচের সিঁড়িতে সভাসদগণের আসন নির্দিষ্ট ছিল। তারপর দরবার আরম্ভ হইত। কর্মচারীরা একে একে ভূম্যবলুষ্ঠিতশিরে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, 'মন্ত্রী! রাজ্যের সংবাদ কি? প্রজারা বেশ সুখে আছে ত?' মন্ত্রী মহাশয় কখনও বলিতেন, 'আজ্ঞা হাঁ, প্রজারা পরম সুখে আছে,' কখনও বা বলিতেন, 'না মহারাজ, একজন দস্যু বড় উৎপাত করিতেছে'; তখন সেই অপরাধী দস্যুকে বিচারার্থ সভামধ্যে আনা হইত। যথারীতি বিচারান্তে সত্ৰাট আদেশ করিতেন, 'রক্ষিগণ! শীঘ্র ছুরাখ্যার মুণ্ডচ্ছেদ কর।' অমনি রক্ষিবেশধারী দশ বার জন বালক সেই অপরাধী দস্যুকে বধ্যভূমে লইয়া যাইবার জন্ত উত্তত হইত, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ না করিয়া তীরবেগে দন্তবাড়ীর সদর দরজার দিকে ছুটিত। ত্রুন্ধ রক্ষিদলও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইত। ছপুর বেলা, বাড়ীর সকলেই ঘুমাইতেছে, দেউড়ির ভূতেরাও নিদ্রিত। তাহাদের নিদ্রাচ্ছন্ন দেহের উপর দিয়া শশদে পলাতক অপরাধী ও রক্ষীর দল দৌড়াইত। তাহারাও চমকিত হইয়া উঠিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া 'হুর্কৃত্ত বালকদের' শাস্তিবিধানের জন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইত, কিন্তু বালকদিগের সহিত দৌড়ে না পারিয়া শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিত। বালক নরেন্দ্র স্বস্থানে বসিয়া কোঁতুক দেখিতেন ও মুহু মুহু হাসিতেন; বোধ হয় ভাবিতেন—তাহারা তাঁহার কি করিবে? তিনি হচ্ছেন সত্ৰাট—দীন-ছনিয়ার মালিক!

## স্বামী বিবেকানন্দ

ইহা ছাড়া তিনি আরও এমন অনেক খেলা খেলিতেন যাহাতে একটু মাথা ঘামাইতে হয়। তখন কলিকাতায় সবে গ্যাসের আলো ও সোডা-লেমনেডের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনিও অমনি খেলাঘরে গ্যাসের কারখানা ও সোডা-লেমনেড তৈয়ারী আরম্ভ করিলেন এবং নানা কল-কল্লা যোগাড় করিয়া খেলাঘরে রেলগাড়ী নির্মাণ করিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বলেন—“কতকগুলো পুরোণো দস্তার নল, মেটে হাঁড়ী ও খড় লইয়া বাহির বাটার উঠানে তিনি তাঁর গ্যাসঘর তৈরী করলেন।” খড়গুলি জ্বালাইলেই ধোঁয়া হইত; যখন তাহা নল দিয়া বাহির হইয়া উপরে উঠিত তখন বাল-বুদ্ধিবশতঃ তিনি ভাবিতেন যেন সারা কলিকাতা শহরের আলো ঐ গ্যাসে জ্বলিতেছে। সেই গ্যাসের কারখানায় যখন তিনি কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে সেই ধোঁয়ার দিকে চাহিয়া থাকিতেন তখন এক মজার দৃশ্য হইত। যেন কত বড় একজন ওস্তাদ দাঁড়িয়ে আছেন! কখনও কখনও আবার নাকসিঁটকাইয়া (ওটা বংশের ধরণ) বলিতেন—“নাঃ, এ কিছু হয়নি।” সঙ্গীদের বলিতেন, “আরও আগুন দে, খুব ফুঁ লাগা—গ্যাস বড় কম বেরাচ্ছে।”

সে সময়ে বিশ্বনাথ দত্তের নিকট নানাজাতীয় মক্কেল আসিতেন। তাহার মধ্যে একজন মুসলমান ছিলেন। এ ব্যক্তি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই সমুদয় বালিশগুলি উপরে উপরে সাজাইয়া তাহার উপর সটান লম্বা হইয়া হেলিয়া পড়িতেন এবং অর্ধনিম্নীলিত নেত্রে হুঁকা টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে ‘ইয়া আল্লা’, ‘খোদা, তুমিই সত্য’ প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিতেন ও যখন তামাকু সেবন করিতে ক্লান্তি বোধ হইত তখন সশব্দে একটি সুদীর্ঘ হাই তুলিতেন এবং কখনও কখনও বা সেই সঙ্গে ‘লা-এলাহা এল্লালাহো মোহাম্মাদুর রাসুলোলাহে’ বলিয়া উচ্চ শব্দ করিয়া



## শিক্ষারম্ভ

উঠিতেন। অত্যাশ্রয় মক্কেলগণ তাঁহার ঐ প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া যেন দমিয়া বাইতেন ও হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করিয়া নীরবে স্ব স্ব হুকায় গভীর মনোবোগ দিতেন। তাহার ফলে সেই বিস্তীর্ণ বৈঠকখানা গৃহটি কুণ্ডলারমান ধূমপুঞ্জের পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

এই মুসলমান মক্কেলটি কিন্তু নরেন্দ্রকে বড় ভালবাসিতেন। নরেন্দ্রও তাঁহাকে দেখিবামাত্র ‘চাচা’ বলিয়া ছুটিয়া আসিতেন এবং তাঁহার পলাঙনবাসিত মুখ হইতে পঞ্জাব আফগানিস্থানাদি দুর্গম দেশে উষ্ট্র, অশ্বগজাদি সাহায্যে বাণিজ্যযাত্রার সুদীর্ঘ কাহিনীসমূহ উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিতেন। সে গল্পের আদি অন্ত ছিল না। কিন্তু শৈশবোচিত কৌতুহল-বশতঃ তিনি সেইসব গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বুদ্ধ অনর্গল বলিয়া বাইতেন—তিনিও বিশ্বাস-বিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া সেইসব লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন। মুসলমানটি আবার মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে মিঠাই সন্দেশ ইত্যাদি খাইতে দিতেন। নরেন্দ্রনাথও বিধামুখ চিত্তে সেগুলি ভক্ষণ করিতেন। কিন্তু অপর মক্কেলগণ (ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলেও সকলেই হিন্দু) ইহাতে শিহরিয়া উঠিতেন। কি সর্বনাশ! হিন্দু হইয়া মুসলমানের স্পৃষ্ট খাদ্য ভোজন! এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া তাঁহারা ঘন ঘন ধূম উদগীরণ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রষ্টাচার বালকের ভবিষ্যৎ দুর্গতি স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি অকুটপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িতেন না। বিশ্বনাথ বারু যখন গৃহে প্রবেশ করিয়া এইরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেন তখন ব্যাপারটি বুঝিতে তাঁহার বাকী থাকিত না। কিন্তু তিনি নিজে আহালাদি বিষয়ে আচারপালন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদাসীন ছিলেন, সুতরাং পুত্রের অবস্থিধ আচরণে প্রকাশ্যে কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

একদিন বড় মজা হইয়াছিল। বিষয়কর্মের কথা উত্থাপিত হইবামাত্র নরেন্দ্র সেস্থান ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে গেলেন। তাঁহার পিতা মক্কেলদিগের সহিত কথাবার্তা শেষ করিয়া তাহাদের সহিত সদর দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন সেই অবসরে নরেন্দ্র কোথা হইতে ধাঁ করিয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন ও সারি সারি যত হুঁকা ছিল তাহার প্রত্যেকটিতে মুখ দিয়া এক একবার ভুড়ুক করিয়া টানিলেন। মুসলমানের হুঁকাটি একটু বেশী আগ্রহের সহিতই টানিলেন, কারণ উহা থেকে বেশ খোশবায় বাহির হইতেছিল।

এরূপ করিবার একটা কারণ ছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। জাতিভেদ জিনিসটা বালক নরেন্দ্রের নিকট বড় দুর্বোধ্য বোধ হইত। একজন আর একজনের সহিত খাইবে না কেন? ভিন্ন জাতি হইলেই বা দোষ কি? যদি জাতিভেদ না মানা যায় ত কি হয়? আকাশটা কি মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, না মানুষ মরিয়া যায়? বালবুদ্ধিবশতঃ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দ্রুতগতি সকল মক্কেলের হুঁকা হইতে ধূম উদ্গীরণ করিলেন। কিন্তু কই, তিনি ত মরিয়া গেলেন না, বা পৃথিবীটা তো ভাঙ্গিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িল না! তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন সব জিনিস আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। এমন সময় বিশ্বনাথ-বাবু আসিয়া পড়িলেন এবং পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কচ্ছিস্ রে?' পুত্র অগ্নানবদনে উত্তর দিলেন, 'দেখছি, জাত না মানলে কি হয়!' পিতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং 'বটে রে ছুঁছুঁ!' বলিয়া ধীরে ধীরে নিজ পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন।

আর একদিন যখন উপরোক্ত মুসলমানটি অত্যাশ্রয় মক্কেলের সহিত সম্রাট আকবরের গুণগ্রাম পর্যালোচনায় গভীরভাবে নিযুক্ত ছিলেন,



## শিক্ষারম্ভ

২/২০৬

সেই সময়ে সহস্রা বিশ্বনাথ দত্তের বাটীতে এক মহা হলস্থল ব্যাপার সংঘটিত হইল। নরেন্দ্র অত্যন্ত বালকের সহিত লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে হঠাৎ পদস্থলিত হইয়া দোতলার সিঁড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে আসিয়া পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া যান। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হইল, অনেক বড় ও চেষ্টায় প্রায় এক ঘণ্টা পরে বালকের চৈতন্য হইল। পিতা-মাতা উভয়েই অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এক ঘণ্টা পরে ডাক্তার বলিলেন যে, আঘাত গুরুতর বটে, কিন্তু জীবনের কোন ভয় নাই। শুধু কপালের কিয়দংশ কাটিয়া গিয়াছিল; তাহার ফলে আজীবন তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুর ঠিক উপরিভাগে একটা দাগ ছিল।

পরমহংসদেব বলিতেন, 'যদি সেদিন ওইরকমে ওর শক্তি না কমে যেত, তাহলে ও যে পৃথিবীটা একেবারে ওলট-পালট করে ফেলতো!'

পূর্বে বলিয়াছি, অতি শৈশব হইতেই কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং বিছালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে তাঁহার বয়ঃক্রমের তুলনায় তিনি যথেষ্ট বাঙ্গলা বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি আবার সঙ্গীতেরও ভক্ত ছিলেন। সুতরাং যখন ভিখারী গায়কদল খোল বাজাইতে বাজাইতে গৃহদ্বারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিত ও গান গাহিত তখন তিনি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। একবার তাহাদের বাটার সন্নিকটে একস্থানে ঐরূপ একদল রামায়ণ-গায়ক পালা-বিশেষ গাহিতে গাহিতে কয়েকটা পদ বিন্যস্ত হইয়া অশুদ্ধভাবে গাহিতেছিল দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সে পদগুলি বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লাভ করিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র যে বাল্যকালেই রামায়ণের শ্লোক ও পদের সহিত এত

## স্বামী বিবেকানন্দ

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শৈশবে তিনি যেখানেই রামায়ণগান হইত শুনিতে যাইতেন, কারণ সর্ব্বগুণাধার রামচন্দ্রকে তাঁহার আদর্শ পুরুষ বলিয়া বোধ হইত। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ অদ্ভুতকর্ম্মী হনুমান তাঁহার অল্প শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। তিনি হনুমানের দর্শনলাভের জন্ত অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন—শুনিয়াছিলেন রাম-সেবককে তদগতচিত্তে ধ্যান করিলে নাকি তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। একবার এক কথক কথকতা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, হনুমান কদলীবনে থাকেন। ব্যস্তভাবে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেখানে গেলে কি তাঁকে দেখিতে পাওয়া যায়?' কথক বালকের কৌতুকবহু প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'হ্যাঁগো, গিয়ে দেখ না।' সে রাত্রে গৃহে ফিরিবার সময় নরেন্দ্রের মনে হইল যে বাটার সন্নিগটেই কয়েকটা কদলীর ঝোপ আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের তলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন এবং গভীর আগ্রহের সহিত পুনঃ পুনঃ হনুমানজীর দর্শন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিল না তখন তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সকলে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, 'ওরে বিলে, বোধ হয় আজ হনুমান প্রভুর কাছে অত্র কোথাও গিয়াছেন, তাই তাঁর দেখা পাস নি।' ইহাতে তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া সোৎসাহে মহাবীর হনুমানের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। মহাবীরের মহচ্চরিত্র তাঁহার হৃদয়ে এত দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, এমন কি বেগুড় মঠে তিনি তাঁহার একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।



## শিক্ষারন্ত

শৈশবেই তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। সে-সময়ের একজন দূরদর্শী প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন, ‘কালে এই ছেলে মন্ত লোক হবে।’ ব্যাপারটা এইরূপ—

১৮৬৯ সালে তদানীন্তন দত্তবংশের কর্তা নরেন্দ্রের পিতামহ-স্থানীয় কালীপ্রসাদ দত্ত মহাশয় মৃত্যুশয্যা় শায়িত; শেষমুহূর্ত্ত আগতপ্রায় জানিয়া তিনি পরিবারস্থ সকলকেই তাঁহার নিকট আহ্বান করিলেন এবং বালক-বালিকাদিগের মধ্যে যে-কেহ হউক তাঁহাকে একটু মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাক, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু লজ্জাবশতঃ যখন কেহই একাধে অগ্রসর হইল না, তখন বর্ষব্যবসায় বালক নরেন্দ্র বুদ্ধের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করিবার মানসে গম্ভীরভাবে সেই বৃহদাকার পুস্তক-খানি দুই হস্তে উঠাইয়া ধরিলেন এবং ধীর স্থির পরিষ্কার উচ্চকণ্ঠে কয়েকপাতা পাঠ করিয়া ফেলিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অতীন্দ্রিয় লোকের সান্নিধ্যে প্রসারিত-দৃষ্টি বুদ্ধ এই কয়েকটি কথা বলিয়া প্রাণবায়ু ত্যাগ করিলেন, “ভাই, কালে তুমি নিশ্চয়ই মন্ত লোক হবি।”

বালকের সেই উজ্জল ভবিষ্যতের যে চিত্র বুদ্ধের চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, পাঠক দেখিবেন তাহা মিথ্যা হয় নাই।

বাল্যে সাহস ও প্রত্যাগমনমতিব্ধের বীজও তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল। ছয় বৎসর বয়সের সময় একবার তিনি একজন সঙ্গীকে লইয়া চড়ক দেখিতে যান। চড়কতলা হইতে মাটির মহাদেব কিনিয়া উভয়ে গৃহে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গীটি কতকদূর আসিয়া পিছাইয়া পড়িল। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। এমন সময় একটা ঘোড়ার গাড়ী দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিল। গাড়ীর শব্দে নরেন্দ্র পিছন ফিরিয়া দেখিলেন যে সঙ্গের ছেলোটী একেবারে প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলায়। বামহস্তের

## স্বামী বিবেকানন্দ

মধ্যে মহাদেবটি পুরিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দিগ্দিগজ্ঞানশূন্য হইয়া সঙ্গীর জীবনরক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। পথের লোকেরা বিশ্বয়বিমুগ্ধনেত্রে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ঘটনাটি এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছিল যে কেহই বালকের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবার সময় পায় নাই। যাহা হউক বালকটি সে যাত্রা আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইল। দর্শক-বৃন্দের অনেকেই নরেন্দ্রের সাধুবাদ করিলেন। কেহ কেহ তাঁহার পিঠ চাপড়াইলেন, কেহ বা আশীর্বাদ করিলেন। কিন্তু তিনি গৃহে গিয়া মাতার নিকট ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলে ভুবনেশ্বরী দেবী আনন্দাশ্রম মোচন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, “বাছা, এই ত মানুষের মত কাজ। সব সময় এইরকম মানুষ হবার চেষ্টা করবে।”



## বিদ্যালয়ে

সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে নরেন্দ্র মেট্রপলিটান স্কুলে ভর্তি হন। প্রথমে ইংরেজী ভাষা শিখিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বুলি ধরিলেন—‘ও বিদেশী ভাষা, ও শিখিব কেন? তার চেয়ে আগে নিজের ভাষা ত শিখিলে ভাল হয়।’ সকলে নানামতে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—কিছুতেই পরের ভাষা শেখা হইবে না। সকলে বলিল, ‘আজকাল ইংরেজী শিক্ষা করা দরকার, না শিখিলে চলে না’ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি অটল। রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতাকে নরেন্দ্র বড় ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে একান্তে লইয়া গিয়া অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মত-পরিবর্তনে সফলকাম হইলেন না। কয়েক মাস গত হইলে নরেন্দ্র কি জানি কি ভাবিয়া বৃদ্ধের কথাবুঝারী কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যেদিন স্থির করিলেন ইংরেজী পড়িতে হইবে, সেদিন হইতে একরূপ আগ্রহের সহিত উহা শিক্ষা করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাঁহার অধ্যয়নানুসরণ দর্শনে বিম্বিত হইয়া গেল। বিধাতার কি অদ্ভুত চক্র! যে ভাষায় উত্তরকালে তিনি সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যাহা না হইলে প্রতীচ্য জগতে হিন্দুধর্ম্ম এত শীঘ্র ও সহজে বিস্তারলাভ করিতে পারিত না, এককথায় যে ভাষার সাহায্যে তিনি জগতে আপনার আগমনোদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শিক্ষার প্রথম সোপানেই বিজ্ঞাতীয় ভাষা বলিয়া তাহার উপর বিরাগ!

মাতার নিকটে তিনি প্রথম ইংরেজী বর্ণমালা ও ইংরেজী শব্দ শিক্ষা

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে রামানুজ-মহাভারতের গল্প শুনিয়াও শিখিয়াছিলেন। এই গল্পশ্রবণের ফলেই তিনি পরে একজন উত্তম গল্পকথক হইয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম তিনি ইজের পরিয়া স্কুলে বাইতেন এবং অস্থিরতা-বশতঃ প্রত্যহই উহার ক্ষিয়দংশ ছিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইত। তিনি বাল্য-কালে এত অস্থির ছিলেন যে, কখনও বেঞ্চের স্থির হইয়া বসিতে পারিতেন না। দাঁড়ান ও বসার মাঝামাঝি যতরকম উপায়ে শরীরকে রাখা বাইতে পারে তাহারই কোন-না-কোন একটা ভঙ্গীতে তাঁহাকে সর্বদা দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু সর্ববিষয়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় বালক ছিলেন। খেলিবার সময় খেলায় এত মত্ত হইতেন যে, সে-সময়ে অল্প কোন বিষয় আর চিন্তে স্থান পাইত না। মার্বেল খেলা, ছুটাছুটি, ছটোপাটি, লাকান, যুষোযুবি—এইগুলি তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। এ-সকল বিষয়ে তিনি সকলের অগ্রণী ছিলেন এবং প্রত্যহ পরদিন কি কি খেলা হইবে তাহার ‘প্রোগ্রাম’ করিতেন। বালকদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই সকলে মধ্যস্থ মানিত। তিনি নিজে বিবাদ-বিসংবাদ আদৌ পছন্দ করিতেন না, বিশেষতঃ যাহারা ক্রীড়ার নিত্য-সঙ্গী তাহাদিগের মধ্যে মারামারি উপস্থিত হইলে বিশেষ বিরক্ত হইতেন। যদি কখনও ঐরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইত তবে নিজে প্রতিপক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থলে ছুটিয়া গিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দিতেন। সময়ে সময়ে ঐরূপ করিতে বাইয়া নিজেকেও দু-এক ঘা প্রহার সহ্য করিতে হইত, কিন্তু এই অল্পবয়সেই তিনি মুষ্টিযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন, সুতরাং সহজেই সকলকে স্বমতে আনিতে পারিতেন। তিনি পরবর্তী-কালে শিষ্যদের বলিতেন, “ছেলেবেলায় আমি বড় ডানপিটে ছিলাম,



## বিদ্যালয়ে

তা না হলে কি আর একটা কানাকড়ি সঙ্গে না নিয়ে ছনিয়াটা ঘুরে আসতে পারতুম রে !”

চলতি ভাষায় ডানপিটে শব্দের যে অর্থই হউক, বাস্তবিক শৈশব হইতে তাঁহার চরিত্রে আত্মশক্তি-অনুভব-জনিত প্রকৃত নির্ভীকতা ও তৎসহ ভাবী চঞ্চলতার আভাব প্রস্ফুরিত হইয়াছিল। কিন্তু বালমূলভ চপলতা ব্যতীত আর একটি মহত্তর বৃত্তির অঙ্গুর এই সময়ে তাঁহাতে দেখা গিয়াছিল, সেটি হইতেছে দয়া। তাঁহার জননী পুণ্যশীলা ভুবনেশ্বরী মাতা অতিশয় করুণহৃদয়া ছিলেন ; নরেন্দ্র তাঁহার করুণকোমল হৃদয়খানি স্বীয় জননীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ভুবনেশ্বরী মাতার সহৃদয়তার পরিচয় এখানে দিব। নরেন্দ্রের পিতা একটি বন্ধকী সম্পত্তি সহধর্ম্মিণীর নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছিলেন। দৈহ্যদশাগ্রস্ত এক মুসলমান পরিবার ঐ সম্পত্তি তাঁহার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিল। কিন্তু ঋণ-পরিশোধের সময়ে অর্থসংগ্রহ না হওয়াতে তাহারা অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইয়া কাতরভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত ভুবনেশ্বরী মাতার নিকট নিবেদন করিলে তাহাদের অনশনক্লিষ্ট মলিন বদনের ভঙ্গ-চকিত কাতর দৃষ্টি উচ্চাস্তঃকরণা রমণীর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি তাহাদের করুণ কাহিনী শ্রবণে বিগলিত-চিত্ত হইয়া দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধকী দলিলখানি তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে সর্বোৎসাহে জননীর অনুরূপ ছিলেন। সমবয়স্ক ক্রীড়া-সাথী সকলকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। অনেক সময়ে তাহাদিগের মধ্যে তিনি কাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ইহা লইয়া ঘোরতর তর্ক হইত। প্রত্যেকেই ভাবিত যে তাহাকে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। ক্রীড়াকালে যদি কাহাকেও পীড়িত বা আহত হইতে

## স্বামী বিবেকানন্দ

দেখিতেন তাহা হইলে তখনই ক্রীড়া বন্ধ রাখিয়া তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইতেন। একবার তিনি কুড়ি-পঁচিশ জন বালককে সঙ্গে লইয়া গড়ের মাঠে কেলা দেখিতে যাত্রা করেন। তাহাদের মধ্যে একজন কিছু অসুস্থ বোধ করিতেছিল, কিন্তু বালকগণ সত্য সত্যই যে তাহার কোন পীড়া হইয়াছে তাহা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে লইয়া নানা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে করিতে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছিল। সে বালকটি কিন্তু ক্রমশঃই ক্ষীণশক্তি ও পশ্চাদ্বর্তী হইয়া পড়িতেছিল। স্বামীজীও অগ্রাগ্র বালকগণের স্থায় কলহান্তে গগন বিদীর্ণ করিতে করিতে সকলের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন, সহসা তাঁহার মনে হইল হয়ত পিছনের বালকটি সত্যই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে; অমনি তিনি ফিরিলেন। কিঞ্চিদূর আসিয়াই দেখিলেন বালকটি পথের ধারে বসিয়া পড়িয়াছে ও প্রবল জ্বরে তাহার সর্বদ্বা খর খর করিয়া কাঁপিতেছে। তখন তিনি ধরাধরি করিয়া একখানি গাড়ীতে চাপাইয়া স্বয়ং তাহাকে গৃহে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। এই গুণেই বালকেরা এত সহজে তাঁহার বশীভূত হইয়াছিল এবং সর্ববিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

এইসময়ে আর এক দিবস তিনি একটি বালক ও তাহার মাতাকে বিষম দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করেন। একখানি গাড়ী হঠাৎ তাহাদিগের উপর আসিয়া পড়ায় তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ক্ষিপ্ৰগতিতে একহস্তে বালকটিকে ধরিয়া টানিলেন ও অপর হস্তে তাহার মাতাকে ধরিয়া ফেলিলেন। এইরূপে উভয়েই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেল। পরকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার সময় তিনি কখনও নিজের বিপদ গ্রাহ্য করিতেন না।

সহপাঠীদিগকে তিনি যেমন প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন তাহারাও



## বিদ্যালয়ে

তঁাহাকে তেমনি ভালবাসিত। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বাল্যজীবনের বাহাতে পূর্ণ পরিণতি ও সার্থকতা তাহা তঁাহাতে পূর্ণমাত্রায় ছিল। অশ্রান্ত চঞ্চলতা, জীড়া, কোতুক, রহস্য, হাস্যপরিহাস প্রভৃতি যেসকল কমণীয় ভাবে শৈশবজীবনের পরিপুষ্টি, তাহা তঁাহাতে সম্যক বিকশিত হইয়াছিল। ক্লাশের প্রত্যেক বালককে তিনি এক একটা উদ্ভট নামে সম্ভাষণ করিতেন। ঐসকল নাম কতকটা তঁাহার কল্পনাপ্রবণ-মস্তিষ্কপ্রসূত এবং কতকটা আবার বিবিধ উপকথা ও উপভাষাদি হইতে সংগৃহীত।

পূর্বের বলিয়াছি তিনি বাল্যকালে ডানপিটে ছিলেন। এই ডানপিটে স্বভাব বা দুরন্তপনার জন্ত বালকমহলে সকলেই তাঁহার অতিশয় অনুরাগী হইয়াছিল। পড়াশুনার দিকে তাঁহার ঝোঁক সামান্যই ছিল। কারণ প্রতিদিনের নির্দিষ্ট পাঠ সমাপন করিতে তাঁহার এক ঘণ্টার অধিক সময় লাগিত না। বাকী সময়টা তিনি কেবলই নব নব ক্রীড়া-কৌতুক উদ্ভাবনে রত থাকিতেন। জল খাবারের পয়সা জমাইয়া হয় লজ্জেক্সস, না হয় মার্কেল অথবা নূতন ব্যাট কি বল কিনিতেন, এবং খুব অল্প বয়সেই ক্রিকেট খেলায় পটু হইয়াছিলেন। বছরের নয় মাস এই ভাবে খেলিয়া-বেড়াইয়া বাৎসরিক পরীক্ষার ২১৩ মাস পূর্ব হইতে খুব পড়ায় মন দিতেন। এই সময়ে ইতিহাস, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিরাগ ছিল। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার পিতার অনুরূপ ছিলেন। অঙ্ক সম্বন্ধে তাঁহার পিতা বলিতেন, ‘ও ত মুদীর দোকানের বিত্তে।’ প্রথম কয়েক বর্ষ মেট্রপলিটানে অধ্যয়নকালে তিনি অজীর্ণরোগে ভুগিয়া অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু যেসকল খাণ্ড এই পীড়ায় অনিষ্টকর, বালবুদ্ধিবশতঃ সুবিধা পাইলেই তাহা খাইতেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

ক্লাশে কোন নূতন ছাত্র ভর্তি হইলে তিনি সর্বাত্মে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহার কোন পূর্বপুরুষ, বিশেষতঃ ঠাকুরদা, সন্ন্যাসী ছিলেন কি না। সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি অনুরক্তি বাল্যাবধি কখনও তাঁহার হৃদয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। সুবিধা পাইলেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে—এটি তাঁহার বরাবর মনে মনে ছিল এবং শৈশবসম্পন্ন আবেগবশতঃ সঙ্গীদিগের নিকট বলিতেন, ‘বড় হইয়া আমি সন্ন্যাসী হইব, অমুক অমুক জায়গায় বাইব, অমুক অমুক করিব—ইত্যাদি।’ কখন কখনও ছেলেরা একত্র হইয়া পরস্পরের হাত দেখিত। কিন্তু হাতদেখার কাজটি তাঁহারই প্রায় একচেটিয়া ছিল। নিজের হাত দেখিয়া তিনি বলিতেন, ‘আমি সাধু হইব, এতে আর কোন ভুল নাই, আমার হাতে সন্ন্যাসী হবার খুব বড় এক চিহ্ন আছে।’ এই বলিয়া তিনি কতকগুলি কররেখা তাহাদিগকে দেখাইতেন। একজন বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ‘ওগুলি নাকি সন্ন্যাস-যোগের পরিচায়ক। নরেন সন্ন্যাসী হইবেন শুনিয়া অত্যাশ্চর্য্য সকলেই সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। তারপর কথা হইত যে বড় বড় সাধুরা কি করেন। কল্পনাবলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনে একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিতেন, ‘সন্ন্যাসী এই করে, এই করে।’ কিন্তু নরেন্দ্র বলিতেন, ‘না না, তোরা কিছু জানিসনে, বড় বড় সাধুরা সব হিমালয়ের উপর থাকেন, সে সব জায়গায় মানুষে যেতে পারে না। তাঁদের সঙ্গে কৈলাস পর্ব্বতের উপর রোজ মহাদেবের দেখা হয়। তোরা যদি সন্ন্যাসী হতে চাস্ তবে ঐসব পাহাড়ে বা গহন জঙ্গলে গিয়ে ঐরকম মহাত্মাদের পায়ে পড়তে হবে। তারপর তাঁরা এক একটা লম্বা বাঁশের উপর শুতে দেন। যদি তার উপর শুয়ে কেউ ঘুমতে পারে তারপর গেরুয়া পরিয়ে চেলা করে নেন।’



No. ....

Shri Shri বিজ্ঞানময় শ্রী শ্রী Anandam  
BANARAS

আহা! শৈশবের কল্পনা কি সরল!

নরেন্দ্রের এক সহপাঠীর বাটিতে একটি চাঁপাফুলের গাছ ছিল। যখন আর কিছু ভাল লাগিত না তখন ঐ চাঁপাগাছের ডালে পা বাঁধাইয়া হাত ছাড়িয়া মাথা নিচু করিয়া ঝুগ খাইতে নরেন্দ্র বড় ভালবাসিতেন। এমন কি দ্বিপ্রহরের রৌদ্রেও তাঁহার ঐরূপ করিতে ভাল লাগিত। চাঁপাফুল শিবের প্রিয়, নরেন্দ্রও চাঁপাফুল ভালবাসিতেন। একদিন তিনি উপরোক্ত প্রকারে দোল খাইতেছেন এমন সময় ঐ বাটির কর্তা—উক্ত সহপাঠীর বুদ্ধ ঠাকুরদাদা—নরেন্দ্রের গলা শুনিতে পাইয়া সেথায় উপস্থিত হইলেন। অতটুকু ছেলেকে ঐরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় গাছের উচ্চশাখায় দোহুল্যমান দেখিয়া ও চাঁপাফুলগুলির শোচনীয় অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বুদ্ধ ব্যস্ত-সমস্তভাবে বালককে গাছ হইতে নামিতে বলিলেন এবং ভবিষ্যতে ঐ গাছে চড়িতে নিষেধ করিলেন। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেন, ও গাছটার চড়লে কি হয়?’ বুদ্ধ বলিলেন, ‘ও গাছে একটা বৈষ্ণবদত্তি আছে, তার ভয়ানক চেহারা, নিশুতি রাতে সে একখানা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়!’ ঐ অদ্ভুত ভূতের কথা শুনিয়া নরেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—ভূতেরা কি করে, ঐরূপ বেড়াইয়া বেড়ান ছাড়া তাহাদের আর অণু কাজ আছে কি না, ইত্যাদি। এমন সময় বুদ্ধটি বলিলেন, ‘আর যারা ঐ গাছে চড়ে সে তাদের ঘাড় মটুকে দেয়।’ নরেন তখন কিছু বলিল না। কিঞ্চিৎ পরে বুদ্ধ ঔষধে ধরিয়াছে মনে করিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যেই বুদ্ধ চলিয়া গেলেন অমনি নরেন্দ্র পুনরায় বৃক্ষে আরোহণ করিলেন,—উদ্দেশ্য, ব্রহ্মদৈত্যের দেখা পাইলে তাহার গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া তাহাকে জব্দ

## স্বামী বিবেকানন্দ

করবেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী বলিল, “না ভাই, সাবধান, অমন কথা করিস্ নি, তা হলে সে তোর ঘাড়টা মটকাবে।” তাহাকে সত্য সত্যই ভীত দেখিয়া নরেন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, “তুই ছোঁড়া কি আহাম্মক! একজন একটা কথা বলে গেল বলেই কি সেটাকে বিশ্বাস করতে হবে? যদি তোর ঠাকুরদা বুড়োর ঐ বেক্সদতিয়র কথা সত্যি হত তা হলে অনেকক্ষণ আমার ঘাড়টা মুচড়ে যাওয়া উচিত ছিল।”

এটা অবশ্য একটা বালকের গল্প মাত্র। এখনও হয়ত অনেক বালকের সম্বন্ধে এরকম বা এর চেয়েও ভাল গল্প ঢের শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার উত্তরটি—‘একজন বলেছে বলেই কি বিশ্বাস করতে হবে?’ এই ভাবটা তাঁহার চিরদিন ছিল। তিনি বিনা বিচারে অন্ধের মত কোন জিনিস বিশ্বাস করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। শেষ জীবনে বলিতেন—

“বইয়ে লেখা আছে অতএব সত্য, এমনভাবে কোন জিনিসকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। অমুক লোক বলিয়াছে অতএব সত্য, এই বলিয়া কোন জিনিসকে হঠাৎ সত্য বলিয়া মানিও না। সত্যটা যে প্রকৃত কি, তাহা নিজে জানিবার চেষ্টা কর।”

উপরোক্ত সহপাঠীর পিতা নরেন্দ্রকে বড় স্নেহ করিতেন এবং ভবিষ্যতে তিনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবেন এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। একদিন নরেন্দ্রকে উপরোক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষ হইতে দোল খাইতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—“তুমি ছোকরা বৃক্ষ সমস্ত দিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে এই রকম করে খেলে বেড়াও! কখন পড়াশুনা কর কি?” নরেন্দ্র বলিলেন, ‘আজ্ঞে হাঁ, আমি ছুই-ই করি—খেলি,



## বিভালয়ে

আবার পড়িও।’ তখন পরীক্ষা আরম্ভ হইল—ভূগোল, অঙ্ক, কবিতা-আবৃত্তি সব বিষয়ের পরীক্ষা হইল। নরেন্দ্র চট্টপট্ সব জিনিসের উত্তর দিলেন। পরীক্ষক ভদ্রলোকটি অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিলেন, ‘বটে? বেশ বেশ—আচ্ছা, তোমায় দেখে কে? তোমার বাপ ত লাহোরে।’ নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, ‘হাঁ, বাবা লাহোরে আছেন বটে, কিন্তু মা ত এখানে আছেন। তিনিই আমার যা যা করতে হবে বলে দেন, আর আমি নিজেই পড়ি।’ ভদ্রলোকটি প্রকাশে আর অধিক কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, ‘হাঁ, তুমি কালে নিশ্চয়ই উন্নতি করবে। আমি প্রাণভরে তোমায় আশীর্বাদ করছি।’ তাহার পর হইতে তিনি বরাবর নরেন্দ্রের খোঁজখবর রাখিতেন ও বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহার জীবনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন।

নরেন্দ্রের যখন সাত-আট বৎসর বয়স তখনকার একটি ঘটনার তাঁহার সাহসের খুব পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে একদিন তিনি কয়েকজন সহপাঠীকে সঙ্গে লইয়া মেটেবুরুজে লক্ষ্মীএর ভূতপূর্ব নবাব ওয়াজিদ আলি সা’র পশুশালা দেখিবার জন্ত চাঁদপাল ঘাট হইতে নৌকারোহণ করেন। ফিরিবার সময় একজনের শরীর অসুস্থ হওয়ার নৌকার মধ্যে বসি করিয়া ফেলে। ইহাতে মুসলমান মাঝিরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে উহা স্বহস্তে পরিষ্কার করিবার জন্ত জেদ করিতে থাকে, কিন্তু বালকেরা অস্ত্র কাহারও দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইতে বলে এবং তৎপরিবর্তে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। মাঝিরা তাহাতে অসম্মত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে উহা সাফ করিবার জন্ত অনুযোগ করিতে থাকে এবং বালকেরা উহা অস্বীকার করায় তাহাদিগকে গালিগালাজ ও নানাবিধ কটুক্তি করিতে থাকে। অবশেষে ঘাটের

## স্বামী বিবেকানন্দ

কাছে আসিয়া উহা সাফ না করিলে নোকা ঘাটে লাগাইবে না, এইরূপ ভয় প্রদর্শন করে। তখন বচসা হইতে হইতে ক্রমে উভয় পক্ষে হাতাহাতির উপক্রম হইল এবং ঘাটে যত নোকার মাঝি ছিল সকলে মিলিত হইয়া বালকদিগকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিল। বালকেরা মহা বিপদে পড়িয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তিনি ইত্যবসরে যেই নোকাখানি একটু ঘুরিয়াছে, অমনি মস্ত এক লাফ দিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন, দূরে দুইজন শ্বেতকায় পুরুষ বায়ুসেবনার্থ ময়দানের দিকে চলিয়াছে। অমনি তিনি ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাদের নিকটে গিয়া ভাঙ্গা ইংরেজীতে আপনাদের অবস্থা জানাইলেন। ঐ দুই ব্যক্তি পল্টনের গোরা, তখন তাহারা তত প্রকৃতিস্থ ছিল না, মত্তপান করিয়া টলিতে টলিতে আসিতেছিল। কিন্তু নরেন্দ্রের সরল বিশ্বাস ও সাহস দর্শনে তাহারা হঠাৎ তাহাকে অভয় দিয়া বলিল—

‘All right my boy, all right my boy, don’t you worry.’

নরেন্দ্র তাঁহার ক্ষুদ্র হস্তে তাহাদের একজনের হস্ত ধারণ করিয়া তাহার অসংযত পদবিক্ষেপ যথাপথে পরিচালনে সাহায্য করিয়া নোকার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাঝিমাল্লা ও বালকেরা সকলেই অবাক! একে সাহেব, তায় গোরা, তায় আবার মাতাল! মাঝিরা ত তাহাদের দর্শন-মাত্রেই ভীত হইয়া পড়িল। তারপর যখন তাহারা হস্তস্থিত বেত উঠাইয়া বজ্রকর্থে বলিল, “আভি লেড়্কা লোগ্‌কো উতারনে দেও, নেহী তো মার ডালেগা।” তখন ‘আচ্ছা সাহেব, বহুত আচ্ছা সাহেব, আভি সাহেব’ বলিতে বলিতে মাঝিরা তখনই ঘাটে নোকা ভিড়াইল ও আর সকলে ভয়ে যে বাহার নোকায় সরিয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথের



## বিদ্যালয়ে

ব্যবহারে সৈনিকদ্বয় সেদিন একরূপ প্রীত হইয়াছিল যে তাঁহাকে তাহাদের সহিত থিয়েটার দেখিতে বাইবার জ্ঞাত আহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ধন্তবাদের সহিত তাহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের সাহসের পরিচয়স্বরূপ তাঁহার বাল্যজীবনের আরও দুই একটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ভূতপূর্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যে বৎসর প্রিন্স অব ওয়েলস্ রূপে ভারতভ্রমণে আগমন করেন সেই বৎসর কলিকাতা বন্দরে বিলাত হইতে 'সিরাপিস্' নামক ড্রেডনট জাতীয় একটা বড় মানোয়ারী জাহাজ আসিয়াছিল। তখন নরেন্দ্রের বয়স ১১ বৎসর। নরেন্দ্রের সঙ্গীরা ধরিয়া বলিল যে ঐ যুদ্ধের জাহাজ-খানা দেখিয়া আসিতে হইবে। জাহাজ দেখিতে হইলে বন্দরের বড় সাহেবের পাশ চাই, কিন্তু নরেন্দ্র কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহেন, তিনি চৌরঙ্গীতে বড় সাহেবের আফিসে গেলেন। সেখানকার চাপরাশী তাঁহাকে বালক দেখিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া বলিল, 'সরে পড় না এখান থেকে, অতটুকু মানুষ আবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে! লড়ায়ের জাহাজ দেখতে যাবে! পালাঃ!' তাহার এবস্ত্রকার সম্ভাবণে নরেন্দ্র প্রথমে একটু খতমত খাইলেন, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জ্ঞাত। পরক্ষণেই তাঁহার ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেখিলেন পিছন দিকে একটা লোহার সরু সিঁড়ি রহিয়াছে। মনে হইল ঐখান দিয়া বোধ হয় বড় সাহেবের কামরায় যাওয়া যায়। অমনি ধীরে ধীরে চাপরাশীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলেন, ঠিক জায়গাতেই আসিয়াছেন; তখন পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে অনেক লোক, সকলেই সাহেবের নিকট আপন আপন আরজী লইয়া উপস্থিত। তিনি

## স্বামী বিবেকানন্দ

পূর্ব হইতেই একটি দরখাস্ত লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যেই তাঁহার পালা আসিল অমনি সাহেবের সম্মুখে তাহা ধরিলেন। সাহেবও দ্বিক্ৰান্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র উহা লইয়া আর পূর্বপথে না গিয়া সোজা পথ দিয়া নীচে নামিলেন। পূর্বোক্ত দ্বারবান ত তাঁহাকে দেখিয়াই অবাক, জিজ্ঞাসা করিল, “তুম্ ক্যাসে উপর মে গিয়া থা?” তিনি মুখভঙ্গীসহকারে “হাম্ বাহ্ জান্তা” এই বলিয়া তাহার উপর এক কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

স্বামী সারদানন্দ এই সময়কার আর একটি ঘটনা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—“সিমলা পল্লীর বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্ত তখন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপরে একটি ‘জিম্জ্যাষ্টিকে’র আখড়া ছিল। হিন্দুমেলা-প্রবর্তক শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাটার অতি সন্নিবন্ধে থাকায় নরেন্দ্রনাথ বরস্ববর্গের সহিত ঐ স্থানে নিত্য আগমনপূর্বক ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। পাড়ার লোক মিত্রদ্বার সহিত পূর্ব হইতে পরিচয় থাকায় তাঁহাদিগের উপরেই তিনি আখড়ার কার্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখড়ার একদিন একটি ‘ট্রাপিঞ্জ’ (দোলনা) খাটাইবার জন্ত বালকেরা অশেষ চেষ্টা করিয়াও উহার গুরুভার দারুণ ফ্রেম খাড়া করিতে পারিতেছিল না। বালকদিগের ঐ কার্য দেখিতে রাস্তার লোকের ভিড় হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান ইংরাজ ‘নাবিক’কে দণ্ডায়মান দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ সাহায্য করিবার জন্ত তাহাকে অনুরোধ করিলেন। সেও তাহাতে সানন্দে সম্মত হইয়া বালকদিগের সহিত যোগদান করিল। তখন দড়ি বাঁধিয়া বালকেরা ট্রাপিঞ্জের শীর্ষদেশ



## বিভাগে

টানিয়া উত্তোলন করিতে লাগিলেন এবং সাহেব উহার পদদ্বয় গর্ত-  
মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। ঐরূপে  
কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে এমন সময়ে দড়ি ছিঁড়িয়া ট্রাপিজের  
দারুময় শরীর পুনরায় ভূতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা  
উঠিয়া পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য  
হইয়া পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্য ও তাহার ক্ষতস্থান হইতে  
অনর্গল রুধিরস্রাব হইতেছে দেখিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।  
কেবল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুই-এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ঘটনাস্থলে  
উপস্থিত থাকিয়া বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ  
করিলেন। নরেন্দ্রনাথ নিজের বস্ত্র ছিন্ন ও আর্দ্র করিয়া সাহেবের  
ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জলসেচন ও ব্যঞ্জন করিয়া  
চৈতন্যসম্পাদনে বৃত্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাহেবের চৈতন্য হইলে  
তাহাকে সম্মুখস্থ 'ট্রেণিং একাডেমি' নামক স্কুলগৃহের অভ্যন্তরে শয়ন  
করাইয়া শীঘ্র একজন ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত নবগোপাল বাবুর নিকট  
সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আসিলেন এবং পরীক্ষা করিয়া  
বলিলেন, 'আঘাত সাংঘাতিক নহে, এক সপ্তাহের শুশ্রূষায় সাহেব  
আরোগ্য হইবে।' নরেন্দ্রনাথের শুশ্রূষায় এবং ঔষধ ও পথ্যাদির সহায়ে  
সাহেব ঐ কালের মধ্যেই সুস্থ হইল। তখন পল্লীর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত  
ব্যক্তির নিকট চাঁদা সংগ্রহপূর্বক তাহাকে কিঞ্চিৎ পাথের দিয়া নরেন্দ্রনাথ  
বিদায় করিলেন। ঐরূপে বিপদে পড়িয়া অবিচলিত থাকা সম্বন্ধে  
অনেকগুলি ঘটনা আমরা নরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে শ্রবণ করিয়াছি।"

সকল প্রকারে তিনি আদর্শ বালক ছিলেন। অত্যাশ্রয় বালকেরা  
যেমন খেলাধুলা করে তিনিও সেইরূপ করিতেন, বরং অত্যাশ্রয় বালক

## স্বামী বিবেকানন্দ

অপেক্ষা একটু বেশী রকমই করিতেন। কিন্তু নিভুতে তাঁহার অন্তরের গোপনতম প্রদেশে একটা উচ্চতর ভাবের ধারা সদাই প্রবাহিত হইত। দেশ কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া তাহা কখনও কখনও ব্যক্ত হইয়া পড়িত। তখন তিনি আর বালক নহেন—বোধ হইত যেন যুগযুগান্তরের জ্ঞানরাজ্যের একজন পুরাতন পথিক। এই জ্ঞান-ধারা আমরা প্রকটিত দেখি তাঁহার শৈশবধ্যানে বা তন্ময়ত্বে, দেব-বিশেষের প্রতি অনুরাগে, সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও সন্ন্যাস-জীবনের আকাজক্ষায়। ইহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার পরিণত জীবনের আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আপনার মধ্যে একটা শক্তি অনুভব করিতেন এবং এমন অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেন যাহা তাঁহার সমবয়স্ক শিশুদিগের সমক্ষে কখনও উপস্থিত হইত না বা হয় না। সে জিনিসগুলি তাঁহার ভিতরকার—নিজস্ব। অন্তরের গূঢ়শক্তি যে অনুক্ষণ আত্মপ্রকাশের জন্ত একটা পথ খুঁজিতেছে—ইহা শৈশবের ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও তিনি প্রায়ই অনুভব করিতেন। তিনি যে বাহিরে এত চঞ্চল ছিলেন, এটা সেই অন্তর্ভূতের ফল। আনন্দের আশায় সেই শক্তি তাঁহার প্রতি ইন্দ্রিয়ে, প্রতি অবয়বে ছুটাছুটি করিত এবং খেলাধুলা প্রভৃতি বহির্বিশয়ে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু বৈরাগ্যসিদ্ধ পুরুষের মন বাহ্য বিষয়ে কত আনন্দ পাইবে? তিনি যে রস খুঁজিতেছেন, যে আনন্দ-পারাবারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন, সে ত বাহিরে নাই, সে যে ভিতরেই আছে! তাই তিনি যখন ধ্যানে তন্ময় হইতেন তখনকার তৃপ্তির নিকট খেলাধুলার তৃপ্তি যেন অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

পূর্বে নিদ্রাবেশের প্রাকালে যে-সকল অতীন্দ্রিয় দর্শনের কথা



## বিদ্যালয়ে

বলিয়াছি সে-সকল দর্শন বরাবর হইতেছিল, কিন্তু তাহা ছাড়া আর একটির উল্লেখ এখানে করিব। ধ্যানকালে প্রথম প্রথম তিনি জ্ঞানাকির আলোর স্থায় বিন্দু বিন্দু আলোককণা দেখিতে পাইতেন, কিন্তু পরে দেখিতেন যেন একটা জ্যোতিঃপিণ্ডের মধ্য হইতে একখানা রশ্মিপূর্ণ মেঘ উড়িয়া আসিতেছে; ক্রমে সেটা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত ও সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দোণ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করিত। এই জ্যোতিঃ-দর্শনের সহিত আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হওয়ার যে নিগূঢ় সন্ধক আছে তাহা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের বাক্যে প্রমাণিত হয়।

## পিতামাতার নিকট শিক্ষা

সন্তানের জীবনের উপর পিতামাতার প্রভাব যে সর্বাপেক্ষা অধিক তাহা সুবিদিত। নরেন্দ্রনাথের জীবনেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সাধারণতঃ বালকেরা পিতার নিকট হইতে বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের আদর্শ এবং মাতার নিকট হইতে হৃদয়বৃত্তি ও নৈতিক আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই সিদ্ধান্তের ন্যূনাধিক ইতর-বিশেষ পরিলক্ষিত হইতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার বিজ্ঞাবুদ্ধি, গাভীৰ্য্য ও বিবেচনা-শক্তিকে এতদূর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, অল্প কোনও লোককে তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না, কিন্তু যদি কখন পিতার কোন কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ না হইত তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ পিতৃমত খণ্ডনপূর্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। এমন কি তাঁহার ধর্মজীবনের পথপ্রদর্শক পরমহংসদেবকেও তিনি প্রথম প্রথম অস্বীকার বলিয়া বোধ করেন নাই, এবং যেখানেই তাঁহার সহিত মতের অনৈক্য হইত সেইখানেই স্পষ্টবাক্যে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতেন। কিন্তু এই মত-বিরোধকে কেহ যেন আত্মগর্ভগ্রস্ত প্রতিকূলাচরণ বলিয়া মনে না করেন। ইহা স্বমত-পোষণার্থ অন্ধ বিদ্বেষোহিতা নহে, কিন্তু প্রকৃত সত্যপরায়ণতা,—সত্যের অল্প যুক্তির সহিত যুক্তির সংঘর্ষ। তিনি প্রতি পদে বিচার করিয়া চলিতেন, বিচার ব্যতীত কাহারও বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যাহা স্বীয় বিচার ও যুক্তিপ্রমাণের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইত তাহাই গ্রহণ



## পিতামাতার নিকট শিক্ষা

করিতেন এবং যাহা প্রতিকূল মনে হইত তাহার বিরুদ্ধে আপনার সমুদয় বুদ্ধিতর্ক নিঃশেষে প্রয়োগ করিতেন। এই যে স্বভাব—ইহা তাঁহার পিতারই শিক্ষার ফলে গঠিত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ বাবু পুত্রের বুদ্ধিবৃত্তি-বিকাশসাধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে-সকল বিষয়ের আলোচনার জ্ঞানের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের আবশ্যক হয়, সেইসকল বিষয়েই তিনি পুত্রের পহিত বহুক্ষণ আলাপ করিতেন এবং সর্বদাই পুত্রকে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করিতেন। আপন মত ঘাড়ে চাপাইয়া উহার ভাৱে কোমল শিশুবুদ্ধিকে পিষ্ট করিলে যে তাহা ক্রমশঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইবে ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, সেই জ্ঞান স্বত্বশক্তির পরিচালনা দ্বারা কতকগুলি পুস্তক মুখস্থ করাকেই তিনি শিক্ষা মনে করিতেন না;—যদ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা ও বিচারবুদ্ধি দৃঢ় হয় তাহাকেই জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বামীজী এইরূপে পিতার নিকট হইতে প্রত্যেক বিষয়ের মূলমন্ত্রগুলি লাভ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গীর্ণতার পরিধি অতিক্রম করিয়া উদার দূরদৃষ্টিতে সত্যকে অবলোকন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক জিনিসের শুধু উপরিভাগ না দেখিয়া তলভাগ প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা শৈশব হইতেই তাঁহার হৃদয়ে উন্মেষিত হইয়াছিল, এবং পিতৃ-সাহায্যে তিনি জটিল বুদ্ধিতর্কের বহু-বিস্তৃত জালের মধ্য হইতে সারভাগ নিষ্কাশন ও তাহাকে অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ ভাষায় লোকসমক্ষে স্থাপন করিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসাদি সংসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, এবং যে শিক্ষা দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য ব্যাপক ও লৌকিক ব্যবহারে ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্যের জ্ঞান সম্যক্ পরিষ্কৃত হয়, সেইরূপ শিক্ষা তিনি পিতার নিকট হইতে পাইয়া-

## স্বামী বিবেকানন্দ

ছিলেন। ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব সত্তার সহিত যে শিক্ষার সম্বন্ধ বা পরিচয় নাই এরূপ শিক্ষা বা এরূপ চিন্তা ও জ্ঞানকে বিশ্বনাথ বা নিতান্ত লঘু জ্ঞান করিতেন। বোধ হয় সেইজন্যই নরেন্দ্রনাথও ধর্মসম্বন্ধে মোটামুটি একটা প্রচলিত মত বা অন্ধবিশ্বাস এবং বস্তুতন্ত্রহীন দার্শনিক যুক্তিবাদের পরিবর্তে সজীব ও সাক্ষাৎ অনুভূতির এত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং তাহাই লাভ করিবার জন্ত সকলকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বনাথ বাবুর অন্তঃকরণ অতি উচ্চ ছিল। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বহু ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। জাতি বা বংশ দ্বারা লোকের মর্যাদা নির্ধারণ করা তাঁহার স্বভাব ছিল না, বাহ্যিক মধ্যে মনুষ্যত্ব খুঁজিয়া পাইতেন তাহাকেই আদর ও সম্মান করিতেন। পরম্পরাগত জাতীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদিকেও তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তদ্বিষয়ে একটা গৌরব অনুভব করিতেন। নরেন্দ্র বাল্যজীবনে পিতৃ-প্রকৃতির এই সব বিশেষ্য বিশেষ অভিনিবেশসহকারে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতার প্রত্যেক ভাব তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

এইরূপে বহু বিষয়ে নরেন্দ্র পিতার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। পিতার বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তজ্জন্ত তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিক টান ছিল জননীর উপর। জননীকে তিনি যথার্থ দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। সুখে-দুঃখে, বাল্যে-যৌবনে, সংসারে-সন্ন্যাসে, স্বদেশে-বিদেশে, সামান্য অবস্থায় এবং সম্মান ও যশের সর্বোচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান হইয়াও কখন তাঁহার কথা বিস্মৃত হন নাই। মাত্রাণ্ডে অবস্থানকালে একবার কোনসূত্রে জননীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ



## পিতামাতার নিকট শিক্ষা

পাইয়া এতদূর কাতর ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না টেলিগ্রামে তাঁহার নিরাময়-সংবাদ পাইয়াছিলেন ততক্ষণ তাঁহার চিন্তা-বিক্ষুব্ধ হৃদয় কিছুতেই প্রশান্ত হয় নাই। শেষ জীবনে তিনি প্রায়ই বলিতেন, “যে মাকে সত্য সত্য পূজা করিতে না পারে সে কখনও বড় হইতে পারে না।” তিনি একবার অনেক ভাবিয়া গর্বের সহিত বলিয়াছিলেন, “আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্ত আমি মার নিকট [শুণি।”

ভুবনেশ্বরী মাতা পুত্রদিগকে সতত এই উপদেশ দিতেন—“আজীবন সত্যপথে থাকিও, পবিত্র হইও, নিজের মর্যাদা রক্ষা করিও এবং কখনও অপরের মর্যাদা লঙ্ঘন করিও না বা অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না। খুব শাস্ত হইবে কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে।”

‘স্বাধীনতা রক্ষা করা’ যে অতিশয় মহৎ বস্তু তাহা নরেন্দ্র মর্শ্বে মর্শ্বে অনুভব করিয়াছিলেন, সেইজন্ত তিনি উত্তরকালে কখনও অপরকে উপদেশ দিবার সময় জোর করিয়া নিজের মত গলাধঃকরণ করাইতেন না বা তাহাদিগকে আপন পথে চালাইবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি শুধু পথ নির্দেশ করিতেন ও উচ্চ উচ্চ ভাব প্রদান করিতেন, তারপর যাহার যে ভাবে ইচ্ছা তাহা গ্রহণ বা কার্যে পরিণত করুক।

বাল্যকালে নরেন্দ্র মাতার নিকট কোন কথা গোপন রাখিতেন না। মাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন বলিয়া ভাল হউক, মন্দ হউক, যখন যাহা করিতেন, দেখিতেন বা শুনিতেন ছুটিয়া আসিয়া মাকে তাহা না শুনাইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। মেট্রপলিটান স্কুলে অধ্যয়নকালে একদিন ক্লাসের একটি বালকের কিন্তুত্বকিমাকার আচরণে ছেলেরা অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছিল। শিক্ষক বালকটিকে

## স্বামী বিবেকানন্দ

ভৎসনা করিলে সে তাহা গ্রাহ্য করা দূরে থাকুক বরং নির্লজ্জের ভাষা উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। তদর্শনে ক্লাসের অগ্রাগ্র বালকের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা দুঃসহ হইয়া উঠিল। নরেন্দ্র নিকটেই ছিলেন। তাঁহাকে ঐ হাসিতে যোগ দিতে দেখিয়া শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এমনভাবে তাঁহার কান মলিতে লাগিলেন যে অবশেষে কণ হইতে অঙ্গুর রক্তপাত হইতে লাগিল। অপমানিত, ব্যথিত নরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ পুস্তক লইয়া ক্লাসের বাহিরে বাইতে উত্তত হইয়াছেন এমন সময়ে পুঙ্জনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই স্থান দিয়া বাইতেছিলেন। তিনি এই নৃশংস শাসনবিধি প্রত্যক্ষ করিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ক্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিক্ষককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ‘আমি জানিতাম তুমি একজন মানুষ, এমন দেখিতেছি তুমি একটা পশু।’ তারপর তিনি নরেন্দ্রকে আশ্বস্ত করিলেন। অগ্র বালকেরাও তাহাদের প্রণয়াম্পদ, দলপতি ও সর্ববিষয়ে প্রধান সহপাঠীকে এতপ্রকার অপমানিত হইতে দেখিয়া বিবম উত্তেজিত হইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষককে সমুচিত তিরস্কার করায় সকলে শান্ত হইল। তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে মেট্রপলিটান স্কুল হইতে দৈহিক দণ্ডবিধান-প্রণালী উঠিয়া যায়।

বাল্যকাল হইতে নরেন্দ্র নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন পূর্বে আর একজন শিক্ষক ভূগোল পড়ায় ভুল হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে প্রহার করেন। নরেন্দ্র শিক্ষককে পুনঃ পুনঃ বলিলেন, ‘আমার ভুল হয় নাই, আমি ঠিকই বলিয়াছি।’ ইহাতে শিক্ষক আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হাতে সপাসপ কয়েক ঘা বেত্রাঘাত করিলেন। নরেন্দ্র নীরবে সহ্য করিলেন। ক্ষণকাল পরেই শিক্ষক মহাশয় বুঝিলেন



## পিতামাতার নিকট শিক্ষা

পারিলেন তাঁহার নিষেধই ভ্রম হইয়াছে। তখন নরেন্দ্রের নিকট তিনি আপনার ভ্রম স্বীকার করিলেন। তদবধি আর কখনও তাঁহাকে সামান্য ছাত্রজ্ঞানে উপেক্ষা করেন নাই।

উপরি উক্ত ছইটি ঘটনাই নরেন্দ্র গৃহে গিয়া জননীর নিকট বিবৃত করেন। জননী তাঁহার বেদনায় সাস্থনা দান করিয়া বলিয়াছিলেন, “বাছা, যদি তোমার ভুল না হইয়া থাকে তবে ইহাতে কি আশে যায়? ফল বাহাই হউক না কেন, সর্বদা বাহা সত্য বলিয়া মনে করিবে, তাহা করিয়া যাইবে। অনেক সময় হয়ত ইহার অল্প অল্প ও অপ্রীতিকর ফল সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তথাপি সত্যকে কখনও ত্যাগ করিও না।”

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নরেন্দ্র মাতার এই উপদেশ পালন করিয়াছিলেন। অনেক সময় এতদূর তাঁহাকে নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, অনেক সময় প্রিয় ও নিকটতম বন্ধুদিগের সহিতও মনান্তর হইয়াছে, তথাপি বাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে তিনি কখনও এক পদ বিচ্যুত হইতেন না।

আর একটি উপদেশ তিনি এই সময়ে শিখিয়াছিলেন এবং আত্মজীবন পালন করিয়াছিলেন। সেটি হইতেছে এই—“জীবনে মরণে কখনও কর্তব্যপরাঙ্কুহ হইও না।”

নরেন্দ্রের যখন চতুর্দশ বর্ষ বয়স (১৮৭৭ খ্রীঃ) তখন একবার তাঁহার পিতা মধ্য-প্রদেশে রায়পুর নামক স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ গমন করেন। এই সময়ে নরেন্দ্র মেট্রপলিটানের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। বিশ্বনাথ বাবুর রায়পুর গমনের কয়েক মাস পরে তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণও তথায় গমন করিলেন। তখন কেবল নাগপুর পর্য্যন্ত রেল-লাইন ছিল।

## স্বামী বিবেকানন্দ

এলাহাবাদ ও জব্বলপুর হইয়া নাগপুর পর্য্যন্ত ট্রেনে বাওয়া চলিত, কিন্তু তাহার পর গো-শকট ব্যতীত সেই দীর্ঘপথ অতিক্রমের অল্প উপায় ছিল না। এক পক্ষেরও অধিককাল ক্রমাগত গো-যানে যাইতে হইত। পথের দুই পার্শ্বে বিচিত্র বৃক্ষলতা-ফল-পুষ্প-শোভিত বিবিধ-বনবিহঙ্গ-কাকলী-পূরিত নিবিড় অরণ্য ও বিদ্যাচলের গগনস্পর্শী শৃঙ্গমালা। 'ধীর মন্থরগতিতে চলিতে চলিতে গো-যানসকল ক্রমে ক্রমে এমন এক স্থানে উপস্থিত হইল যেখানে পর্বতশৃঙ্গদ্বয় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয়া বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে।' বনস্থলীর অপূর্ব শোভা-সন্দর্শনে নরেন্দ্রের প্রাণে এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হইল। পর্বত-পৃষ্ঠ-নিবদ্ধ-দৃষ্টি নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন—একদিকে পর্বতগাত্রের দিখর হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাটলের মধ্যে 'মক্ষিকাকুলের যুগযুগান্তর পরিশ্রমের নিদর্শনস্বরূপ একখানি প্রকাণ্ড মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে। তখন বিষয়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা-রাজ্যের আদি-অন্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন অনন্তের ভাবে এমন তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের নিমিত্ত বাহ্য সংজ্ঞার এককালে লোপ হইল।' তিনি বলিতেন, "কতক্ষণ যে ঐ ভাবে গো-যানে পড়িয়া ছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ঐ কথা কেহ জানিতে পারে নাই।" পুণ্ড্র্যপাদ স্বামী সারদানন্দ বলেন, "প্রবল কল্পনা সহায়ে ধ্যানের রাজ্যে আরুঢ় হইয়া এককালে তন্মগ্ন হইয়া বাওয়া নরেন্দ্রনাথের জীবনে ইহাই বোধ হয় প্রথম।"

রায়পুরে স্কুল ছিল না, সুতরাং নরেন্দ্র অধিকাংশকাল পিতৃসন্নিধানে অবস্থান করিতেন। তাহার ফলে তিনি প্রত্যহ বিবিধ নূতন শিক্ষালাভ



## পিতামাতার নিকট শিক্ষা

ও জ্ঞানসঞ্চয় করিতেছিলেন। এ শিক্ষা বিদ্যালয়ের মানুষী শিক্ষা নহে। পূর্বেই বলিয়াছি বিশ্বনাথ বাবু কিরূপ সযত্নে পুত্রের মনোবিকাশ-সম্পাদনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। প্রচলিত প্রথামত পুস্তক কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে পুত্রকে নিযুক্ত না করিয়া তিনি তাহার সহিত চিন্তার আদান-প্রদান দ্বারা উচ্চভাবের বীজ বপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার জন্ত অনেক সময় পিতাপুত্রে ঘোর তর্কযুদ্ধ বাধিয়া বাইত, ফলে কখনও পিতা, কখনও বা পুত্র জয়লাভ করিতেন। নরেন্দ্র-জননী পুত্রের বিজয়লাভেই সমধিক আনন্দিত হইতেন।

ইহা ছাড়া বিশ্বনাথ বাবুর বাসায় অনেক বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হইত। ইহাদের মধ্যে যেসকল বিষয় আলোচিত হইত নরেন্দ্র তাহা স্থির হইয়া শ্রবণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে তৎসম্বন্ধে নিজের স্বাধীন মতামতও ব্যক্ত করিতেন। বয়োবৃদ্ধগণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তাদর্শনে অনেক সময়ে তাঁহাকে আপনাদের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন।

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত এইরূপ একজন পিতৃবন্ধুর সহিত কথা বলিতে বলিতে একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে খাতনামা গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে বহু গদ্য ও পদ্যংশ আবৃত্তি করিয়া এরূপ স্তুতি করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, “বালক, একদিন না একদিন তোমার নাম আমরা গুনিতে পাইব।” ষাঁহার পরবর্তীকালে স্বামীজীর বঙ্গসাহিত্য-রচনায় দক্ষতা দেখিয়াছেন তাঁহার। জানেন ঐ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন সাহিত্যিকের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সার্থক হইয়াছিল।

তিনি আবাল্য এরূপ আত্মনির্ভরশীল ছিলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে কাহারও অপেক্ষা নিজেকে হীন মনে করিতেন না। তিনি যত বড়ই পণ্ডিত,

## স্বামী বিবেকানন্দ

জ্ঞানী, বয়োবৃদ্ধ বা সম্মানার্থ হউন না কেন, বালক নরেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করিবার যো ছিল না। যদি কেহ কখনও বালক ভাবিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেন তবে আর তাঁহার নিস্তার ছিল না। একবার তাঁহার পিতার একজন বহুদিনের বন্ধু কোন বিষয়ে তাঁহাকে উপহাস করিয়া দ্বিধা অবহেলার ভাব দেখাইয়াছিলেন। তিনি ইহাতে সে ব্যক্তির উপর চটিয়া গিয়া ভাবিতে থাকেন, ‘কি আশ্চর্য্য! আমার পিতা আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন না, আর এ লোকটা আমার তুচ্ছজ্ঞান করে!’ তেজে অগ্নিস্থলিঙ্গবৎ হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘আপনার মত কতকগুলি লোক আছেন যাহাদের ধারণা—বয়স কম হইলে বুদ্ধি বৃদ্ধি-বিবেচনাও কম হয়; এটা কিন্তু নিতান্ত স্পর্ধা ছাড়া আর কিছু নয়।’ তিনি এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্য্যন্ত আর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই।

এইরূপে বয়সে স্নকুমার হইলেও বুদ্ধি ও শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ দিন দিন প্রবীণত্ব লাভ করিতেছিলেন।

দুই বৎসর রায়পুরে যাপন করিয়া বিশ্বনাথ বাবু সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। নরেন্দ্র তখন সর্বাংশে পরিবর্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। নিদ্রের প্রতি তখন তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, শরীর বেশ পুষ্ট ও সবল হইয়াছে এবং সমবয়স্কদিগের তুলনায় যথেষ্ট জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দুই বৎসর বাহিরে বাহিরে থাকায় শিক্ষকেরা তাঁহাকে প্রথমে এক্সট্রা ক্লাসে ভর্তি করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে অতিকষ্টে ‘বিশেষ অনুমতি’ (special permission) পাইয়া তিনি ভর্তি হইলেন। তারপর তিনি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন এবং অনায়াসে



## পিতামাতার নিকট শিক্ষা

তিন বৎসরের পাঠ এক বৎসরে আয়ত্ত করিলেন। বোল বৎসর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং মেট্রপলিটানের মধ্যে একমাত্র তিনিই সে বৎসর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য পিতার নিকট হইতে স্বামীজী একটি সুন্দর পকেটঘড়ি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি এক প্রদর্শনীতে মুষ্টিযুদ্ধ-প্রতিযোগিতায় (boxing competition) প্রথম পুরস্কারস্বরূপ একটি মনোহর রৌপ্যনির্মিত প্রতাপতি উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নীও ঐ প্রদর্শনীতে মথমলের উপর সূচীকর্ষের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার পান।

## বাল্যজীবনের শেষ কথা

নরেন্দ্র যখন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন বয়সের অনুপাতে তাঁহার বিদ্যাসঞ্চয় নিতান্ত সামান্য হয় নাই। সমগ্র পাটীগণিত ও উচ্চতর গণিতের কিয়দংশ, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের বহু পুস্তক এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস—এইগুলি তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পুস্তকের কীট ছিলেন না—রঙ্গ-তামাসা, আমোদ-প্রমোদ পড়াশুনা অপেক্ষা কম ভালবাসিতেন না। অভিনব ক্রীড়াকৌতুক উদ্ভাবনের জন্ত তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করিতেন।

নরেন্দ্র রায়পুরে পিতার নিকট রন্ধনবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। ‘সকলের চেয়ে ভাল রাঁধিব’ এইরূপ একটা জেদ তাঁহার বরাবর ছিল। খেলার সাথীদের নিকট অবস্থানুসারে এক আনা দুই আনা চাঁদা লইয়া মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি করা তাঁহার একটা প্রধান সখ ছিল। খরচার-বেশীর ভাগ অবশ্য তিনিই দিতেন এবং পাকের কার্যও স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন, তবে অত্যন্ত বালকেরাও তাঁহাকে সাহায্য করিত। পোলাও, মাংস, নানাপ্রকার খিচুড়ী ও অত্যন্ত বহুবিধ রসনাতৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্য রন্ধন করা হইত। রন্ধন অবশ্য খুব ভালই হইত। কিন্তু তিনি খুব ঝাল ভালবাসিতেন বলিয়া মাংস প্রভৃতিতে অতিরিক্ত লঙ্কা দিতেন।

এই সময়ে বালক নরেন্দ্রের নবোদ্ভিন্ন জ্ঞানচক্ষু সদা জাগ্রত থাকিয়া চতুর্দিক হইতে মনের আহাৰ অন্বেষণ করিতেছিল। রায়পুরে তিনি দাবাখেলা শিখিয়াছিলেন এবং ভাল ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলাতেও জয়লাভ করিতেন। এই সময়ে কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালার প্রথম



## বাল্যজীবনের শেষ কথা

স্বত্বপাত হয়। তিনিও অমনি তদনুকরণে একটি নাট্যগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বাটার লোক ও পাড়া-প্রতিবাসীর নিকট এক আনা দর্শনী-মূল্য আদায় করিয়া এই নূতন সখ মিটাইবার খরচা বোগাড় করিতে লাগিলেন। তিনি সকল রকম ক্রীড়ায় আমোদ পাইতেন। ম্যাজিক লঠনের গুপ্তরহস্য আবিষ্কার করিয়া তৎসাহায্যে সকলকে ছবিদেখান হইতে নোকাচালান, অসিচালনা—কিছুই বাদ ছিল না। সর্বাপেক্ষা তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল সঙ্গীতে। তিনি আঠৈশব সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন; অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীতচর্চায় মনোনিবেশ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না উৎকৃষ্ট গায়ক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন ততদিন অধ্যবসায়ের সহিত সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ-স্বর স্বভাবতঃই মিষ্ট ছিল, তাহার উপর শিক্ষা ও সাধনাগুণে উহা আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ১

তিনি আবাল্য কিরূপ তেজস্বী ও প্রত্যাশপন্নমতি ছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার একস্থানে থিয়েটারের অভিনয় হইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ আদালতের এক পিয়াদা রক্ষমন্ডের উপর গিয়া এক প্রধান অভিনেতাকে একখানি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখাইয়া বলিল, ‘আমি আইন ও আদালতের হুকুম অনুসারে আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।’ সভামধ্যে একটা হলস্থল

---

১ সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যার প্রতি তাঁহার পিতা মাতা উভয়েরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামীজী বলিতেন, তাঁহার পিতা মুকণ্ঠ-ছিলেন এবং নিধুবাবুর টপ্পা প্রভৃতি গাহিতে পারিতেন। তাঁহার মাতা ভুবনেশ্বরীও বৈষ্ণব ভিক্রুক ও রাতভিখারীদিগের ভজনগান একবারমাত্র শুনিয়াই মূর-তাল-লয়ের সহিত আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

পড়িবার উপক্রম হইল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একজন সতেজ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও, যতক্ষণ না পালা শেষ হয় ততক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাক গে। এরকম করে সব লোককে বিরক্ত করবার মানে কি?” সকলেই সেই তীক্ষ্ণ স্বর শুনিয়া চিনিলা, সে সুস্পষ্ট আদেশবাণী আর কাহারও নহে—নরেন্দ্রের। অমনি বিংশতিকণ্ঠে চীৎকার উঠিল, ‘বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, শীগ্গির বেরোও।’ বাহারা নিকটে ছিল তাহার। নরেন্দ্রের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, “বাহবা ভায়া—বাহবা, তুমি না থাকলে আজ সব পণ্ড হত।”

এইরূপ তেজস্বিতার জহুই তিনি সকলের এত প্রিয় ছিলেন। খেলাধুলা ও ছুষ্ঠামিতে তিনি সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বটে, কিন্তু ছেলেমানুষির ভিতরেও মনুষ্যোচিত তেজ ও দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

তিনি প্রতিবেশিগণের সকলেরই স্নেহভাজন ছিলেন। বড় হউক, ছোট হউক, উচ্চজাতি হউক, নীচজাতি হউক, সকল পরিবারের সহিত তিনি একটা-না-একটা সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। এদেশে সাধারণতঃ চৌদ্দ-পনের বৎসরের বালক অপর পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিতে কিস্কিৎ সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু নরেন্দ্রের এরূপ সঙ্কোচভাব বিন্দুমাত্র ছিল না। প্রতিবেশীরা সকলেই যেন তাঁহার আপনার লোক ছিলেন। তিনি কাহাকেও পিসী, কাহাকেও মাসী, কাহাকেও খুড়ী, কাহাকেও মামী, কাহাকেও দিদি বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এমন কি একটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোককেও তিনি মাসী বলিয়া ডাকিতেন। কাহারও নিকট তাঁহার লজ্জা বা সঙ্কোচ ছিল না। যে বাটীতে যাইতেন তাহাই যেন তাঁহার নিজের বাটী। এইরূপে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন,



## বাল্যজীবনের শেষ কথা

স্নেহ করিতেন এবং তিনিও নিকট-আত্মীয়জ্ঞানে তাঁহাদিগের সহিত সরল হাওয়ালাপ করিতেন, আবার তাঁহাদের ব্যথার ব্যথী হইয়া বিপদে সাহায্য ও সাহসনা দান করিতেন।

গল্পবর্ণনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। ‘আলিবাবা ও চল্লিশ জন দস্যু’ বা ঐরকম একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প বর্ণনা করিয়া কল্পনা-প্রবণ বাল্যসখাদিগের সরল প্রাণে কোতুহলের তুকান সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ছিল।

বাস্তবিক তিনি সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত বালক ছিলেন—সহৃদয়, তেজস্বী, প্রথরবুদ্ধি, উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, খেলাধুলায় আমোদ-প্রমোদে উন্মত্ত, যে-কোন নূতন বিষয় দেখিবার ও শুনিবার জন্য ব্যগ্র এবং যে-কোন বাধাবিঘ্ন অতিক্রমে উৎসাহশীল ও উদ্যোগী। এবিষয়ে তিনি আমাদের দেশের সাধারণ বালকদিগের মত ‘মুখবোজা ভালমানুষ’টি বা ‘সাতচড়ে কথা কয় না’, ‘নড়ে ভোলা’ গোছেয় ছিলেন না। ঠিক সাহেবদের ছেলের মত,—কর্শাকর্শ, চঞ্চল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দীপ্ত হতাশনের মত ভেজঃপূর্ণ।

## কলেজে

ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রের বাল্যক্রীড়ার অবসান হইল। যে সকল সঙ্গীর সহিত নিত্য নূতন ক্রীড়া-কৌতুক অনুসন্ধানে রত থাকিতেন, এক্ষণে তাহাদের অনেকেই নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে ভাবিয়া পরীক্ষায় কৃতকার্যতা-জনিত আনন্দের মধ্যেও তিনি দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হায়! বাহাদিগের সহিত এতকাল আমোদ-প্রমোদে কাটিল, বাহাদিগকে তিনি কত অদ্ভুত অদ্ভুত আদরের নামে সম্ভাষণ করিতেন, বাহারা তাঁহার নেতৃত্বে কত সুখ ও গৌরব অনুভব করিত, এক্ষণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! সেই বিদ্যালয়-গৃহ—বাহা তাঁহার ক্রীড়াশব্দে প্রতিধ্বনিত হইত, সেই ক্লাস—যেখানে তিনি সকলের প্রথম ছিলেন—সবই ছাড়িয়া যাইতে হইবে! কোমলহৃদয় নরেন্দ্রের প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। এখন কলেজে পড়িতে যাইতেছেন, স্মরণীয় পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর হইতে হইবে, আর ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিবেন না, সৈনিকদলের দায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দূর দূর স্থানে ‘মার্চ’ করিয়া যাইতে বা কৃত্রিম রণ-অভিনয় করিতে পারিবেন না—এইসকল চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যথার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল এবং তিনি নূতন জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যে শীঘ্রই আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

প্রথমে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পরবৎসর উহা ত্যাগ করিয়া জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে



## কলেজে

ভর্তি হইলেন। কলেজে প্রবেশের পর দুই বৎসর নরেন্দ্র পাঠ্যদিতে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিলেন এবং বিশেষভাবে সাহিত্যের অন্বেষণে রত হইয়া রচনা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সমধিক উন্নতিলাভ করেন। Logic (তায়) ও Philosophy (দর্শন) খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ইংরেজী ভাষার রচনা, বক্তৃতা ও কথোপকথন শিক্ষার জন্য অধিকতর পরিশ্রম করিয়া শীঘ্রই এসকল বিষয়ে কলেজের ছাত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। বিদ্যার্জন দ্বারা মনোমন্দির ভূষিত করিতে হইবে—এখন হইতে ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল।

ইংরেজী ভাষার কৃতবিদ্য হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে বহুদিন হইতে সঞ্চিত ছিল। একবার মেট্রপলিটান স্কুলে ছাত্রগণের পারিতোষিক বিতরণ-উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়, সেই সময় একজন শিক্ষকেরও বিদায় গ্রহণ করিবার কথা ছিল। নরেন্দ্রের সহপাঠীরা তাঁহাকে ধরিয়া বলিল যে ঐ শিক্ষককে একটি বিদায় অভিনন্দন দিতে হইবে; নরেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন। সেদিন বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্ভীক নরেন্দ্র সপ্রতিভভাবে সকলের সমক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ধরিয়া ইংরেজীতে উক্ত শিক্ষকের স্থানান্তর-গমনে ছাত্রদিগের হৃদয়ে কিরূপ ক্লেশ হইতেছে তৎসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার খুব প্রশংসা করিলেন। ইহার বহুদিন পরে সুরেন্দ্র বাবু স্বামীজীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "He was the greatest public orator India had ever known." (ভারতবর্ষে ইহার তায় বক্তা জন্মগ্রহণ করেন নাই।) কলেজে অধ্যয়নকালে নরেন্দ্র বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করিতেন। কিন্তু তিনি স্বভাবতঃই বাক্পটু

## স্বামী বিবেকানন্দ

ছিলেন,—অভ্যাস না করিলেও বাগ্মিতার অল্প প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই। সুবক্তা হইতে গেলে যেসকল গুণের আবশ্যক তাহা তাঁহাতে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। সুন্দর সুগঠিত মূর্তি, সুশ্লীলিত অথচ মেঘমল্লের তায় গম্ভীর বর্ণনাময়, সুচারু বচনবিভাস ও আবৃত্তিপ্রণালী দ্বারা শ্রোতার চিন্তাকর্ষণের ক্ষমতা—সকলই তাঁহার ছিল।

যাঁহারা কলেজে নরেন্দ্রের সহিত পরিচিত বা বন্ধুত্বত্রে আবদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সকলেই বলেন যে তিনি নিজের ক্ষমতা উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং অতি স্বাভাবিকভাবে এই ক্ষমতার ব্যবহার করিতেন। দেশী বিদেশী সব অধ্যাপকই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন ও তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতেন, ‘এই বালকের মধ্যে প্রভূত শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এমন দিন আসিবে যেদিন সমগ্র জগৎ তাঁহার পরিচয় পাইবে।’

দুই বৎসর পরে তিনি ফাষ্ট আর্টস্ (এফ, এ,) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতে লাগিলেন এবং আর দুই বৎসর পরে অর্থাৎ কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এল, পড়িতে শুরু করিলেন। ইতিমধ্যে—অর্থাৎ বি, এ, পাশ করার অল্পদিন পরেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি নানা সাংসারিক গোলযোগে ও বিষম অনাক্ষেপে পতিত হন। সুতরাং বি, এল, পাশ করিবার সুযোগ আর তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু ইহার কিছু পূর্বে হইতেই (বি, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করার সময়ে) তাঁহার মনোরাজ্যে বিষম চিন্তা-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল। সে বিষম অন্তর্বাটিকা পিতৃবিয়োগে প্রবলতর রূপ ধারণ করে, কিন্তু পরিশেষে পরমহংসদেবের পদাশ্রয়ে এ ঝটিকা প্রশমিত হয় এবং তিনি সন্দেহ-তরঙ্গের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ লাভ করিয়া প্রকৃত পস্থা-নির্দ্ধারণে সমর্থ হন। এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ



## কলেজে

পর পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে; এখানে শুধু সংক্ষেপে তাহার একটু আভাস প্রদত্ত হইল। ফাষ্ট আর্টস পাশের পর হইতে অর্থাৎ ১৮ বৎসর হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের ইতিহাস অতি চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। যে বিরাট শক্তি শীঘ্রই সভ্যজগতে তুহুল আন্দোলন উত্থাপিত করিবার জ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছিল, যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিবারাত্র সে আর ক্ষুদ্র রক্তমাংসের গভীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিল না—আত্মপ্রকাশের জ্ঞান প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই দেখা যায় এই বয়ঃসন্ধিকালই ঘোর পরিবর্তনের সময়। এই সময়েই তাঁহারা সাধারণ ও স্বীয় অসাধারণ গুণব্যপথের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ‘কোন পথে বাই, কোন পথে গেলে ইষ্টলাভ—সত্যলাভ হইবে, জীবন ধন ও সফল হইবে, জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও সার্থক হইবে’—এবংবিধ সমস্তাজালে নিপতিত হন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা আপন পথ ঠিক করিয়া ফেলেন এবং এই জাল কাটিয়া বহির্গত হন। পাঠক দেখিবেন, নরেন্দ্রনাথের জীবনেও এই প্রকার হইয়াছিল। উপস্থিত আমরা তাঁহার কলেজে অধ্যয়নকালীন চরিত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

স্কুলের ছাত্র কলেজেও তিনি শীঘ্রই সকল বালকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পদে পদে অপর অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে সকলে আপনা হইতেই তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। প্রণালীবদ্ধ চিন্তা, তর্ক ও যুক্তিতে কেহ তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ক্লাসে তর্ক আরম্ভ হইলে খেলার সময় পর্য্যন্ত তাহার জেয় চলিত। যুক্তি ও বিচার-সাহায্যে প্রত্যেক জিনিস খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করা এখন হইতেই তাঁহার অভ্যাস হইয়াছিল।

## স্বামী বিবেকানন্দ

বলা-কহায় কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। রহস্য-বিজ্ঞপে, আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়ায়, সঙ্গীতে,—সকল বিষয়েই তিনি সমান অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার সিংহবিক্রমে সকলে যেন তটস্থ থাকিত। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি পূর্ববৎ নূতন একটা কিছু শুনিলে বা করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেইদিকে ছুটিতেন। কিন্তু স্কুলে পড়িবার সময় যেমন তিনি অধিকাংশ কালই ক্রীড়ামগ্ন থাকিতেন, কলেজে পড়িবার সময় সেরূপ ছিলেন না। কলেজ-জীবনে তিনি খুব অধ্যয়ন-রত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অধ্যয়ন শুধু কলেজ-পাঠ্য পুস্তকে সীমাবদ্ধ ছিল না। নভেল, নাটক, মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক রচনাদির প্রতি তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল। তাহা ছাড়া গণিত, ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকারের দর্শনই তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অয়ত্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি বিস্তৃত ও উদার ছিল। একবার একজন সহপাঠী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন পরীক্ষাকে তিনি গ্রাহ করেন না কেন। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—“পরীক্ষাটা কিছুই নয়, পাশ করাই ত জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আর পাশের জন্ত পড়া মুখস্থ করা মানে শুধু স্মরণশক্তির অপব্যবহার করা। পাশটা শুধু করিতে হইবে বলিয়া বতটুকু পড়া দরকার তাহাই করা উচিত।” তিনি বলিতেন, “এখনকার ছাত্রদের লক্ষ্য জ্ঞানার্জন নয়, তাই দেখি ডিগ্রীটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়াশুনার শেষ। প্রকৃত জ্ঞানলাভ কাহাকে বলে, তাহার উদ্দেশ্য কি এবং চরিত্রের উপর তাহার প্রভাব কতদূর—এ সম্বন্ধে এদেশের ছাত্রদের বেশ পরিষ্কার ধারণা হওয়া উচিত।” এ বিশ্বাস তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত ছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদিন নিজের পাঠ্যবিষয় স্থির করিয়া মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতেন।



## কলেজে

কলেজে অধ্যয়নকালে নরেন্দ্রনাথ যে-সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষ বৃত্ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গণিত ও গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) অগ্রতম। জ্যোতিষে তাঁহার সবিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি 'Godfrey's' Astronomy' নামক পুস্তকখানি সমগ্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের গণিত- (Higher Mathematics) অভ্যাসে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। বার বছর বয়সে মুক্তবোধ-ব্যাকরণের সমুদয় সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং চৌদ্দ বৎসরে সংস্কৃতে বেশ সুন্দর রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা অনুরাগ ছিল বাঙ্গালা ভাষার প্রতি।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত রকমের ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, এবিষয়ে তাঁহার জননীৰ সহিত তাঁহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁহার মাতার নিকট কোন কবিতা একবার পাঠ করিলে তিনি তারপর যে-কোন সময়ে আগাগোড়া তাহা মুখস্থ বলিতে পারিতেন। নরেন্দ্রনাথে এই শক্তি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তিনি ইচ্ছামাত্র যে-কোন বিষয়ে অল্পক্ষণেই মনঃসংবন করিতে পারিতেন এবং তাহার পর সে-বিষয় আর কখনও তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে অপহৃত হইত না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি সময়ে সময়ে যেন দৈবানুগৃহীত বলিয়া মনে হইত এবং তদর্শনে সাধারণ লোকের বিস্ময় ও ভক্তির সীমা থাকিত না। তিনি যে-জিনিস একবার শুনিতেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তাহার প্রতি পংক্তি আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদীপাবলী'র বলেন, "শৈশব হইতেই তাঁহার পাঠাভ্যাসের রীতি ইতিসাধারণ বালকের ছায়া ছিল না। বাল্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরে দৈনিক পাঠাভ্যাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার

## স্বামী বিবেকানন্দ

অতঃপর একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, ‘তিনি বাটীতে আসিলে আমি ইংরেজী বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকগুলি তাঁহার নিকট আনয়ন করিয়া কোন পুস্তকের কোথা হইতে কতদূর পর্যন্ত সেদিন আয়ত্ত করিতে হইবে তাহা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া বদৃচ্ছা শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকিতাম। মাষ্টার মহাশয় যেন নিজে পাঠাভ্যাস করিতেছেন এইরূপ ভাবে পুস্তকগুলির ঐসকল স্থানের বানান ও অর্থাদি দুই-তিন বার আবৃত্তি করিয়া চলিয়া যাইতেন। উহাতেই ঐসকল আমার আয়ত্ত হইয়া যাইত।’ বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার দুই-তিন মাস মাত্র থাকিবার কালে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকসকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন; অতঃপর আপন অভিরুচিমত অতঃপর পুস্তকসকল পড়িয়া কাল কাটাইতেন। ঐরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনেক সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐরূপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে কখন কখন অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে, একদিন তিনি পূর্বোক্ত কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভের দুই-তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি, অ্যামিতি কিছুমাত্র আয়ত্ত হয় নাই; তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং চব্বিশ ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত করিয়া পরীক্ষা দিয়া আসিলাম।’ ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও অপূর্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।”

পাঠানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি এই মেধাশক্তি নরেন্দ্রের বিশেষ উপকারে আসিয়াছিল। অধীত বিষয়গুলি তিনি প্রয়োজনমত অতি সহজ স্বাভাবিক পথে পুনরুদিত করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া তিনি এত অল্প



## কলেজে

সময়ে বহু বিষয় অধিকার করিতেন এবং সে-সকল বিষয় এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার স্মরণ থাকিত যে, অতের পক্ষে তাহা বিশ্বাস করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে যাহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন তাঁহারা অনেকে এখনও জীবিত থাকিয়া নিজ মুখে এ বিষয়ের প্রমাণ দিতেছেন। সেই জন্ত আমরা এরূপ অসম্ভব ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহারা বলেন, যে-পুস্তক তিনি একবার পাঠ করিতেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় প্রায় সমস্ত দিন বন্ধুবান্ধবদের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া অধিক রাত্রিতে ইতিহাস বা তুর্কহ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় মগ্ন হইতেন এবং ৪০।৫০ পৃষ্ঠা শেষ করিয়া উঠিতেন। ঐ ৪০।৫০ পৃষ্ঠা সেদিন হইতে তাঁহার মনের নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া বাইত। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া তিনি চা ও কফি-পানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এত স্মৃতিশক্তি যাহার, তাঁহার পক্ষে অল্প দিনে বহু বিত্তা আয়ত্ত করা বিচিত্র কি? ইতিহাসপাঠে তাঁহার বরাবরই অনুরাগ ছিল। শুধু ঘটনাসমূহের বিবরণ সংগ্রহ করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। যেসকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া একটা জাতি বা তদন্তর্গত শক্তিশালী পুরুষদিগের ক্রিয়াসমূহ প্রকাশ পায়, ইতিহাসপাঠ দ্বারা সেই-সকল অবস্থার পরিচয়লাভ ও পর্যালোচনা করিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেন। Green's 'History of the English People' (ইংরেজ জাতির ইতিহাস), Alison's 'History of Europe' (ইউরোপের ইতিহাস) ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বিশেষভাবে পড়িয়াছিলেন Gibbon's 'Decline

## স্বামী বিবেকানন্দ

and Fall of the Roman Empire' (রোমক সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংস)। অতুলবিক্রম সম্রাট নেপোলিয়নকে তিনি প্রকৃত বীর বলিয়া সম্মান করিতেন এবং নেপোলিয়নের সেনাপতিদিগের মধ্যে 'মার্শাল নে'-কে খুব উচ্চাঙ্গ প্রদান করিতেন। দুর্বলতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন, বিশেষতঃ যখন তাঁহার ইতিহাস-জ্ঞান এইসকল বীরবৃন্দের চিত্র তাঁহার কল্পনার সম্মুখে আনিয়া ধরিত। শক্তিসঞ্চয়ই যে মহৎ কার্যের দ্বারস্বরূপ ইহা তিনি জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু অপরাপর দেশের ইতিহাসপাঠেই পরিতুষ্ট ছিলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন যে, বোধ হইত যেন সকলই তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশীয় হিন্দু নৃপতি ও মোগল বাদশাহ-গণের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে নরেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেন। উত্তরকালে যখন সন্ন্যাসীর বেশে সমস্ত ভারতভূমি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তখন এইসব প্রাচীন কাহিনী, সেই বহুবর্ষাভীত ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানসমূহ-সন্দর্শনের সহিত যুগপৎ স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া ভারতের বিগত গৌরবের কল্পনাময়ী মূর্তির নিকট তাঁহার হৃদয়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত করিয়া ফেলিত এবং ভাবোদ্বেলিত হৃদয়ে তিনি নিরীক্ষণ করিতেন যেন ঐসব অতীত গৌরব শুধু ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবের প্রতি অঙ্গুলিসংস্পর্শ করিতেছে।

যুবকমাত্রেই সাধারণতঃ কাব্যাহুরাগী হইয়া থাকেন। নরেন্দ্রও পঠদশায় কবিতার অতিশয় ভক্ত ছিলেন। ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে Wordsworthকেই তিনি কাব্যগগনের প্রবতারা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং উক্ত কবির উচ্চতাবর্ণ কবিতার অধিকাংশ স্থলই তাঁহার



## কলেজে

কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ছন্দোবদ্ধারপূর্ণ শব্দবিন্যাসমাত্রকেই কবিতা মনে করিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল প্রকৃত কাব্য বহুবর্ণাঙ্কিত চিত্রপটের স্থায় একখানি মনোরম শব্দময় চিত্রবিশেষ। ইহা যেন আদর্শকে লোকলোচনের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার শ্রেষ্ঠতম শিল্প, সত্যকে সাধারণ জগতের অঙ্গীভূত করিবার একমাত্র কৌশল। তাঁহার ideal (আদর্শ) চিরজীবন তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক ছিল। তিনি এই স্বরচিত আদর্শজগতেই বাস করিতেন এবং মনে করিতেন, মানবজীবনের ভিত্তি এই অন্তরের অন্তরতম আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত, আর জীবনের ব্যর্থতার কারণ শুধু এই আদর্শের সম্যগ্‌দর্শনাভাব। তিনি যাহা করিতেন, যাহা ভাবিতেন সবই তাঁহার হৃদয়নিহিত আদর্শের পরিপোষক ছিল। ইতিহাস, কাব্য, দর্শন বা বিজ্ঞান সবই তাঁহার চক্ষে সেই আদর্শের ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি বা প্রকাশ ব্যতীত আর কিছু বোধ হইত না।

কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন প্রকৃত সত্যলাভের জন্ত বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বি, এ, ক্লাসে পড়িবার সময় তিনি পিপাসিত চাতকের স্থায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে সত্যানুদধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! পুস্তকের মধ্যে সে সত্য কোথায়! তাই পরবর্তী কালে 'Song of the Sannyasin' (সন্ন্যাসীর গীতি) শীর্ষক কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—  
'Where seek'st thou? That freedom, friend, this world  
Nor that can give. In books and temples Vain thy search.'

অবেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর ?

পাবে না তো হেথা, কিম্বা এর পর ;

শাস্ত্রে বা মন্দিরে বুথা অবেষণ ;—

## স্বামী বিবেকানন্দ

হার্ভার্ট স্পেন্সারের হুর্কোথ্য দর্শনের প্রতিই তিনি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং উহা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ক্যার্ট ও শোপেনহায়ার নামক জার্মান পণ্ডিতদ্বয়ের এবং অগষ্ট কোমং ও জন ষ্টয়ার্ট মিলের দার্শনিক মতও উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি প্রাচীন আরিস্টটল-মতও উপেক্ষা করেন নাই। এইসকল অধ্যয়নের ফলে এসময়ে তাঁহার হৃদয়ে কি ঘোর পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আমরা পর পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব। এখন পাঠক শুধু এইটুকু জানিয়া রাখুন যে, এইসকল দার্শনিক মতবাদের পুঞ্জানুপুঞ্জ অধ্যয়ন উত্তরকালে সাধারণকে হিন্দুধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষে ও বিপক্ষবর্গের বিরুদ্ধমত-খণ্ডনে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়ে তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে সমুদয় টীকা-ভাষ্য নিভুল হইতে পারে, কিন্তু তিনি দেখিলেন উহাদিগকে বর্তমান যুগধর্মের উপযোগী করিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথম প্রথম হিন্দুদর্শনসমূহ পড়িতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, বুঝি ইহাদের ভিত্তি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত, এক আঘাতেই উহা চূরনার হইয়া যাইবে। এই বিষম সন্দেহ যতদিন পর্যন্ত না অপসৃত হইয়াছিল ততদিন তিনি নিদারুণ অন্তর্ধাতনা অনুভব করিয়াছিলেন। তারপর বিশেষ একাগ্রতার সহিত পাশ্চাত্যদর্শন-অধ্যয়নে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন, হিন্দুদর্শন যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সত্যকে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছে পাশ্চাত্যদর্শনের মূল সূত্রগুলি শুধু তাহারই ক্ষীণ আভাস মাত্র। তাহারাই সেই পূর্ণ সত্যের দিকে কতকটা মাত্র অগ্রসর হইয়াছে।

অধ্যয়নের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইলেও নরেন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক



## কলেজে

স্মৃতি ও আমোদপ্রিয়তা বর্জন করেন নাই। পূর্বের ত্যায় এখনও কোন একটা নূতন জিনিস বা বিষয় দেখিলেই সব ত্যাগ করিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিতেন। ছাত্রদিগের মধ্যে তাঁহার ত্যায় রসিক কেহ ছিল না। কোন ঘটনার কৌতুকের দিকটা সর্বত্রই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইত। তাঁহার সহায়্যাবলিগণের মধ্যে অনেকেই স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় ছিলেন। একে এই রঙ্গপ্রিয় প্রকৃতি, তাহার উপর আবার যখন সকলে একত্র হইতেন তখন তাঁহাদের স্মৃতির বহর দেখে কে? এমন অনেকদিন গিয়াছে যেদিন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহার মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া সকলে সারা কলিকাতার পথে গান গাহিয়া বেড়াইয়াছেন। রবিবার বা অগ্র ছুটির দিনে সকলে একত্রে গঙ্গান্নানে যাইতেন। গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ, লক্ষ্মীস্নান, জলক্রীড়া হইত ও সঙ্গে সঙ্গে হাসি-তামাসা-গল্পের বান ডাকিত। পূজাপার্কণ উপলক্ষে রাজপথসমূহ আলোকমালায় বিভূষিত হইলে এইসকল যুবকদল ভ্রমণে বহির্গত হইতেন ও উচ্ছ্বসিত আনন্দের রোলে গগন বিদীর্ণ করিতেন।

নরেন্দ্র ছিলেন ইহাদের দলপতি। বাহাতে সকলে বোল আনা আমোদ উপভোগ করিতে পায় সে-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত। কিন্তু এই-সকল আমোদের কোনটিতেই দোষের সংস্পর্শ থাকিত না। যৌবনে প্রাণ ও মনের স্মৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম, এ আমোদ তাহারই ফল; কিন্তু ইহাতে কলুষের লেশমাত্র ছিল না। এইসকল সরল, নির্দোষ, পুরুষোচিত আমোদ উপলক্ষে নরেন্দ্রের সহিত অনেকের আমরণ সৌহার্দ স্থাপিত হয়। নরেন্দ্র-চরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ ছিল—পবিত্রতা ও নিষ্কলতা। এবিষয়ে তাঁহার আদর্শ অতি উচ্চ ছিল এবং এ আদর্শ হইতে তিলপরিমাণ বিচ্যুতি বা খর্ব্বতা তাঁহার সহ্য হইত না। যৌবনকাল অতি সঙ্কটময়।

## স্বামী বিবেকানন্দ

আমোদপ্রমোদ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে পাপের পথে পদার্পণ করা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু বাল্যে মাতার নিকট নরেন্দ্র শিখিয়াছিলেন—সৎ কি, সাধুতা কাহাকে বলে; আর যৌবনে নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র-অধ্যয়ন, বিচার ও চিন্তাশীলতা দ্বারা বুঝিয়াছিলেন পবিত্রতা কি, সাধুতা কি। সেইজন্ত শত আমোদ-প্রমোদের মধ্যেও তিনি চরিত্রের বিশুদ্ধতা হারান নাই। এসম্বন্ধে তাঁহার একজন যৌবনসহচর (ইনি পূর্বে সুনীতি কুনীতির বিশেষ ধার ধারিতেন না, কিন্তু পরে স্বামীজীর মতামুবর্তী হন ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন) বলেন, “যৌবনে স্বামীজী পবিত্রতার জলন্ত বিগ্রহ ছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রায়ই over-puritanical (অতিরিক্ত মাত্রায় পবিত্রতাভক্ত) বলিয়া ঠাট্টা করিতাম, কিন্তু এক এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতে গেলে যেন কথা আটকাইয়া যাইত,—স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম তাঁহার তুলনায় আমি কত হীন।” তিনি আরও বলেন, “নরেনের ভেতর থেকে যেন একটা আধ্যাত্মিক তেজ ফুটে বেরোত, তার কাছে তিষ্ঠান যেত না।” শুধু ইনি নহেন, নরেন্দ্রের অত্যাশ্চর্য বন্ধুরাও তাঁহার মধ্যে ঐরূপ তেজ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সারা জীবন নরেন্দ্র-চরিত্র এই পবিত্রতার মহিমময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। কি ধর্ম, কি ঈশ্বর—সবই তিনি ইহার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। এই পবিত্রতাই তাঁহার চরিত্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। তিনি জীলোকমাত্রকেই মাতৃ-সম্বোধন করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতই অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগকে মাতৃরূপা জ্ঞান করিতেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতে অনুরাগ ছিল। প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠের সময় হইতেই তিনি রীতিমত গীতবাহুর চর্চা আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ আহম্মদ খাঁ



## কলেজে

শিষ্য বেণী গুপ্ত নামে একজন ওস্তাদের নিকট তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতেই পারদর্শী ছিলেন। বিশ্বনাথ বাবু বাল্যাবধি পুত্রের সঙ্গীতপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে উহাতে সম্যক্ অধিকার জন্মে না জানিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্র ওস্তাদের নিকট হইতে রাগরাগিনী শিক্ষা করেন ও তাল-মান-লয় সম্বন্ধে বিধিমত উপদেশ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে নরেন্দ্র চারি-পাঁচ বৎসর ধরিয়া ঐ ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বাজাইতেও বেশ শিখিয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গীতেই তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যেখানে বাইতেন সেখানেই গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইতেন,—সকলেই তাঁহাকে ওস্তাদের ছাত্র খাতির যত্ন করিত এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন ‘অথরিটি’ (প্রমাণস্বরূপ) বলিয়া গণ্য করিত। প্রাচ্য সঙ্গীতের সহিত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তুলনা দ্বারা তিনি সঙ্গীতবিজ্ঞা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন কি, কোন দরিদ্র সঙ্গীতপুস্তক-প্রকাশককে তাঁহার পুস্তক-বিক্রয়ের সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি ‘ভারতীয় সঙ্গীততত্ত্ব’ সম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন, এবং শেষে নিজেও কয়েকটি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীতগুরু তাঁহার প্রতিভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া অত্যাশ্রয় শিষ্য অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক অধিক বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা নিজের সুখোজ্জল হইবে জানিয়া তাঁহাকে শিখাইবার জন্ত প্রাণপণ যত্ন করিতেন। নরেন্দ্র তাঁহার নিকট অনেক হিন্দী, উর্দু এবং ফার্সী গানও শিখিয়াছিলেন। ঐগুলির অধিকাংশ মুসলমানদিগের পরীক্ষাদিতে গীত হয়।

## স্বামী বিবেকানন্দ

জেনারেল এসেম্বলীজ কলেজের ছাত্রেরা প্রায়ই দল বাঁধিয়া তাঁহার গান শুনিতে বসিত। একদিন একজন ইংরেজ অধ্যাপক ক্লাসে আসিতে কিছু দেরী করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ক্লাসে প্রায় দুইশত ছাত্র ছিল। অধ্যাপকের আসিতে বিলম্ব আছে মনে করিয়া তাহারা সকলে নরেন্দ্রকে একটি গান গাহিতে অনুরোধ করিল, কারণ সময়টা তাহা হইলে বেশ কাটে। নরেন্দ্র গাহিতে আরম্ভ করিলেন, আর সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিল। ইতোমধ্যে অধ্যাপক ক্লাসের নিকট আসিয়া মনোহর সঙ্গীতশ্রবণে স্তব্ধ হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং গান থামিলে সর্ষবদনে ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। ক্লাসে প্রবেশ করিয়া তিনি গায়কের খুব প্রশংসা করিলেন,—অবশ্য তাঁহার নাম কেহ তাঁহাকে বলিল না।

পাঠক দেখিবেন স্বয়ং পরহংসদেবও নরেন্দ্রের এই সুকণ্ঠের সঙ্গীতে একদিন মুগ্ধ হইয়া ভাবাবিষ্ট ও সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং খেতড়ি রাজসভাতেও তিনি দরবারী, কানাড়া, ইমন কল্যাণ ও বাগেশ্রী আলাপ করিয়া ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

বন্ধুবর্গের নিকট অবস্থানকালে নরেন্দ্র প্রায়ই সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতেন। তাঁহারাও ‘এনকোর’ ‘এনকোর’ (‘চলুক’ ‘চলুক’) ধ্বনিতে তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রামের অবকাশ দিতেন না। তিনিও উৎসাহে অধীর হইয়া ক্রমশঃ গানে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়া চলিয়া যাইত কেহই টের পাইতেন না। এখনও অনেকে বলেন, যখন তিনি একাকী থাকিতেন হ্রস্ব গাহিতে গাহিতে এতদূর আত্মহারা হইয়া পড়িতেন যে, আহার করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন এবং কতখানি সময় যে চলিয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক করিতে



## কলেজে

পারিতেন না। কোন কোন দিন এমন হইত যে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে তেল মাখিতে বসিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে গান ধরিয়াছেন—এদিকে হয়ত খুব তাড়াতাড়ি খাইয়া বাহির হইতে হইবে,—কিন্তু গান আরম্ভ করিয়া আর স্নান বা খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে নাই, একেবারে তাহাতে ডুবিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীতের উপর এমনই তাঁহার ঝোঁক ছিল।

তিনি যেমন গাহিতে পারিতেন তেমনি সুন্দর নাচিতেও পারিতেন। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে ‘বীরোচিত কলা’ বলিয়া নৃত্যবিদ্যার খুব আদর ছিল এবং ধর্মোৎসবদির সময় নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। নরেন্দ্র স্বাভাবিক কলানুরাগবশতঃ নৃত্যকালে অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিতেন, আর সেই সঙ্গে যদি সঙ্গীতটি উচ্চভাবব্যঞ্জক হইত তাহা হইলে ভাবের প্রেরণায় নৃত্যসৌষ্ঠব আরও বর্দ্ধিত হইত। এ বিষয়ে তিনি ঠিক গ্রীকদের মত ছিলেন। আশৈশব সৌন্দর্য্যানুরাগী, স্বয়ংও সুন্দরদর্শন, তাহার উপর বহিঃসৌন্দর্য্যের সহিত আন্তরসৌন্দর্য্যের সম্বন্ধবেত্তা; স্মৃতির ঠাঁহার স্মৃকণ্ঠের সুধাস্রাবী সঙ্গীত ও তৎসহ ললিত বপুর তরঙ্গায়িত ভঙ্গী যুগবৎ শ্রোতা ও দর্শকের প্রাণ হরণ করিত। এ সময়ে বন্ধুবান্ধবদের কোন উৎসব-সভা হইলে তিনি যদি সে স্থলে উপস্থিত না থাকিতেন তবে মনে হইত যেন সভার অঙ্গহানি হইয়াছে। কারণ তাঁহার মত আনন্দ-তুফান তুলিতে কেহই পারিত না। তাঁহার সংস্পর্শমাত্রেই স্থানটি যেন চঞ্চল ও প্রাণময় হইয়া উঠিত, সভামধ্যে একটা হর্ষের হিল্লোল বহিয়া যাইত। তাঁহার সকলরকম গান জানা ছিল। যে যেমন চাহিত তাহাকে সেইরূপ গান শুনাইয়া সন্তুষ্ট করিতেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং সাগ্রহে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে ‘নরেন কোথা?’ ‘নরেন কোথা?’

## স্বামী বিবেকানন্দ

‘তাকে সঙ্গে আন নি কেন?’—এইরূপ একটা হৈ-চৈ পড়িয়া বাইত। তিনি না আসা পর্য্যন্ত আসর যেন বেশ জমিত না এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না। সমস্ত কলেজ-জীবনভোর তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগের নিকট এইরূপ প্রেমাম্পদ বন্ধু ছিলেন এবং গল্প রহস্য ও ক্রীড়া-কৌতুকাদি দ্বারা তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন।

গান-বাজনার সঙ্গে আর একটা জিনিসের উপর তাঁহার ঝোক ছিল। সেটি হইতেছে অভিনয়। পূর্বে বলিয়াছি, সে সময়টা এদেশে রঙ্গালয়ের জন্মকাল। সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয় তখন সবে আরম্ভ হইয়াছে এবং সামাজিক আমোদ-প্রমোদে ভদ্র ও গণ্যমাত্র ব্যক্তিগণ কর্তৃক অভিনয়ের বেশ প্রচলন হইয়াছে। নরেনও সখের অভিনয় আরম্ভ করিয়া বন্ধুদিগের হৃদয়ে অভিনয়-প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিলেন। তবে তিনি বেসকল বিষয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন চিত্তের উন্নতিসাধনই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকিত। কেশব বাবুর ‘নববৃন্দাবন’ নাটক-অভিনয়কালে তিনি বোগীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সুগঠিত অবয়বদর্শনে সকলেই পুলকিত হইতেন। সে অবয়বে সিংহাবয়বের সৌন্দর্য্য ছিল। তাহার উপর প্রাণটি খোলা, সাদা ও সাদাই স্মৃতিসমুদ্রে ভাসমান। আর তিনি সহজেই সব কাজে গা ঢালিয়া দিতেন। সকল আমোদ-আহ্লাদ-রঙ্গশ্রোতে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে সমর্পণ করিতেন।

উপরোক্ত আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত অত্র কয়েকপ্রকার ক্রীড়ায়ও নরেন্দ্র খুব যোগ দিতেন—এগুলিতে প্রভূত অঙ্গচালনার আবশ্যক হয়; যথা—দৌড়ান, লাফান, কুস্তি, জিম্জিমাষ্টিক, সস্তরণ-প্রতিযোগিতা, দাঁড় টানিয়া গঙ্গাবক্ষে বিচরণ, ফাঁকা মাঠে বহুদূর পর্য্যন্ত দ্রুত ভ্রমণ



## কলেজে

ইত্যাদি। যে-সকল খেলার শরীর দৃঢ় ও সবল হয়, হৃদয়ে সাহস আসে, মনের তেজ বাড়়ে তাহাতে তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুরাগী ছিলেন। তৎফলে তাঁহার মাংসপেশীগুলি শক্ত ও পুষ্ট হইয়া দেহের সৌন্দর্য আরও বর্দ্ধন করিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই তিনি ঘোড়া ভালবাসিতেন। তাঁহার আত্মীয়ের একটা সাদা 'পনি' ঘোড়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঐ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়া তাঁহার একটা প্রধান সখ ছিল। তিনি যে জিম্জিমাষ্টিকের আখড়ায় ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন সেখানে লাঠিও খেলা হইত। লাঠির প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আসক্তি ছিল। কতকগুলি মুসলমানের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল, তাহাদের নিকটই লাঠিখেলা শিক্ষা হয়। কত অল্পবয়সে তিনি লাঠিখেলার নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর, মেটপলিটান স্কুলে পড়েন। একটা মেলা উপলক্ষে জিম্জিমাষ্টিকের খেলা দেখান হইবার কথা ছিল। তিনিও দর্শকরূপে সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অত্যাশ্চর্য খেলা শেষ হইলে লাঠিখেলা আরম্ভ হইল এবং ক্রমশঃ খেলার উৎসাহ কমিয়া আসিল, এমন সময়ে সহসা নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোষণা করিলেন— তাহাদের মধ্যে যে-কেহ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা-প্রদর্শনে সম্মত, তিনি তাহারই সহিত খেলিতে প্রস্তুত। দলের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বলবান সেই তাঁহার সম্মুখীন হইল। তারপর ঘোর শব্দে লাঠিযুদ্ধ চলিল। দর্শকেরা ক্রীড়ার ফল দেখিবার জন্য বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, কারণ নরেন্দ্র অপেক্ষা নরেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীর বয়স ও শারীরিক শক্তি দুইই অধিক ছিল। কিন্তু মুসলমান ওস্তাদদের শিক্ষাশ্রমে নরেন্দ্র লাঠিচালনায়

## স্বামী বিবেকানন্দ

এমনি পরিপক্ব হইয়াছিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিসামর্থ্যকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া পন্নতাড়া কসিতে কসিতে হঠাৎ কোশলে তাহাকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন; ফলে তাহার হস্তস্থিত ষষ্টিখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া ঝন ঝন শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। তদদর্শনে দর্শকবৃন্দের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। নরেন্দ্র জিতিলেন বলিয়া সর্বোচ্চ পুরস্কার পাইলেন এবং সেদিন হইতে মেট্রপলিটনের বালকবৃন্দের গৌরবহীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

তাহার শরীরে বা মনে বিন্দুমাত্র জড়তা ছিল না। সেজন্ত যৌবনের সমস্ত উৎসাহ বাহ্যপ্রকৃতির অনুরাগে জ্ঞানস্পৃহায় পরিণত হইয়াছিল। খেলা ও পড়া এই দুইটি তাহার যৌবনের প্রধান কার্য ছিল, তবে এসময়ে পড়ার দিকে ঝোঁকটা ছিল কিছু বেশী। সতের বৎসরের শেষ হইতে আর তিনি শুধু খেলার ঝোঁকে খেলিতেন না, যে খেলায় শরীর বা মনের উপকার হয় শুধু এরূপ খেলায় যোগ দিতেন এবং বেশীর ভাগ গভীর বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপ্ত থাকিতেন। ইহার পর হইতে আমরা তাহাকে অধ্যয়নরত ছাত্ররূপে দেখি।

কলেজে পাঠকালে তিনি বাহ্য বেশভূষার পারিপাট্য আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। ছাত্রদিগের মধ্যে কাহাকেও সৌখীনবাবু দেখিলে তিনি অনেকসময় তাহার মুখের উপর হুকথা শুনাইয়া দিতেন—বিশেষতঃ যদি তাহার বেশে বা ভাবভঙ্গীতে নারীজনোচিত দুর্বলতা প্রকাশ পাইত।

বি, এ, পরীক্ষার দিন নিকটবর্তী হইলে নরেন্দ্র নিজ বাটীতে বালকদিগের চীৎকার, লোকজনের গুণ্ডগোল ও অত্যাচার অসুবিধার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভমানসে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেখানেই দিবারাত্রি থাকিতেন, শুধু আহারের সময় দুইবেলা বাটী যাইতেন। মাতামহীর আলয়ে বহির্কাটীর একটি



## কলেজে

ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে তিনি থাকিতেন। ঘরের সম্মুখে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। অন্তরমহলের সঙ্গে এ অংশের কোন সংস্রব নাই। এই গৃহে বসিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতেন এবং সাধারণতঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত দৈনিক পাঠ আয়ত্ত না হইত ততক্ষণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন না। তিনি অনেকদিন পরে একজন বন্ধুর নিকট এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া গল্প করিয়াছিলেন, “আমি ঘরের ভিতর বই নিয়ে বস্তুম, আর পাশেই একটা পাত্রে গরম চা ও কফি থাকতো; ঘুম পেলেই পাত্রে একটা দড়ি বাঁধতুম, তারপর ঘুমের ঘোঁকে বেহাশ হয়ে পড়লে যেই পাত্রে দড়িতে টান পড়তো অমনি আবার জেগে উঠতুম।”

কিন্তু পড়াশুনার ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল। বন্ধুবান্ধবরা বাঁহার যখন ইচ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং একবার তাঁহার তর্ক-যুক্তি বা গান-বাজনা আরম্ভ হইলে সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় ১৩১৭ সালের ফাল্গুনের ‘উদ্বোধনে’ প্রকাশিত “স্বামীজীর স্মৃতি” শীর্ষক প্রবন্ধে এই কালের একটি সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। “নরেন নিজেই এই অপূর্ব ছোট ঘরটির নাম রাখিয়াছিলেন ‘টঙ্ক’। কাহাকেও সঙ্গে লইয়া সেখানে যাইতে হইলে বলিতেন, ‘চল টঙ্কে যাই।’ ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চারি হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তাহার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাশিসের খাট, তাহার উপর ময়লা একটি ক্ষুদ্র বালিশ, মেজের উপর একটি ছেঁড়া মাছুর পাতা, এক কোণে একটি তাষুরা। তাহারই নিকট একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখন ঐ মাছুরের উপর পড়িয়া থাকে, কখনও বা ঐ খাটির নীচে পড়িয়া থাকে, কখনও বা

## স্বামী বিবেকানন্দ

তিনি তাহার উপর চড়িয়া বসিয়া থাকেন। ঘরের একপাশে একটি থেলো হুকো, তাহার নিকট একটি তামাকের গুল ও ছাই ঢালিবার সর, তাহার কাছে তামাক, টিকে ও দেশলাই রাখিবার একটি মৃত্তিকা-পাত্র, আর কুলুঙ্গিতে, খাটের উপর, মাছরের উপর হেথা-সেথায় ছড়ান পড়িবার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ি খাটান, তাহাতে কাপড়, পিরাণ ও একখানি চাদর ঝুলিতেছে। ঘরে ছোট একটি ভাঙ্গা শিশিও রহিয়াছে—সম্প্রতি তাঁহার পীড়া হইয়াছিল, তাহারই নজীর। নরেন মনে করিলেই বাড়ী হইতে পরিষ্কার বালিশ, উত্তম বিছানা ও একটু ভাল ভাল দ্রব্যাদি আনিয়া, ছুই-একখানি ছবি প্রভৃতি দিয়া আপনার ঘরটি বেশ সাজাইতে পারিতেন। করিতেন না যে তাহার একমাত্র কারণ, তাঁহার ওসব দিকে কোন প্রকার খেয়ালই ছিল না। সেজ্ঞা ঘরে সর্বত্র একটা ঘেন বাসাড়ে বাসাড়ে ভাব, প্রকৃত কথা আত্ম-তৃপ্তির বাসনা তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতে কোন বিষয়ে দেখা যাইত না।

“নরেন আজ মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে কোন বন্ধুর আগমন হইল—বেলা তখন এগারটা। আহাঙ্গাদি করিয়া নরেন্দ্র পাঠ করিতেছেন। বন্ধু আসিয়া নরেনকে বলিলেন, ‘ভাই, রাত্তিরে পড়িস, এখন ছোটো গান গা।’ অমনি নরেন পড়িবার বই মুড়িয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেতারের সুর বাঁধিয়া নরেন গান ধরিবার আগে বন্ধুকে বলিলেন, ‘তবে বাঁয়াটা নে।’ বন্ধু কহিলেন, ‘ভাই, আমিত বাজাতে জানি নি, ইন্ধুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারবো?’ অমনি নরেন আপনি একটু বাজাইয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, ‘বেশ করে দেখে নে দিকি। পারবি বই কি, কেন পারবি নি?’



## কলেজে

কিন্তু শক্ত কাজ নয়, এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে বা, তা হলেই হবে।’ সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলিয়া দিলেন। বন্ধু দুই বার চেষ্টা করিয়া কোনরকমে ঠেকা দিতে লাগিলেন, গান চলিল। তান-নয়ে উন্নত হইয়া ও উন্নত করিয়া নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলিল—টপ্পা, থেয়াল, টপথেয়াল, থেয়ালব্রুপদ, বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোলসহ ঠেকাটি দেখাইয়া দেন যে, এক দিনে কাওয়ালী, একতালা, আড়াঠেকা, মধ্যমান এমন কি সুরকাঁক তাল পর্যন্ত তাহার দ্বারা বাজাইয়া লইলেন। বন্ধু মধ্যে মধ্যে তামাক সাজিয়া নরেনকে খাওয়াইতেছেন ও আপনি খাইতেছেন; সেটা কেবল বাজান-কার্য্য হইতে একটু অবসর না লইলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নাই। হিন্দি গান হইলে নরেন তাহার মানে বলিতেছেন ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাব-তরঙ্গের সহিত সুর-লয়ের অপূর্ব ঐক্য দর্শাইয়া বন্ধুকে বিমোহিত করিতেছেন। দিন কোথা দিয়া চলিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল, বাড়ীর চাকর আসিয়া একটি মিটমিটে প্রদীপ দিয়া গেল, ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুইজনের হাঁশ হইলে সেদিনকার মত পরস্পর বিদায় লইয়া নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনার্থ চলিয়া গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

“এই প্রকারে নরেনের পাঠে যে কতই ব্যাঘাত ঘটিত তাহা বলা যায় না। নরেনের সহিত এই সময়ে যাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে তিনিই এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখিয়াছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হউক না কেন, নরেন্দ্র নির্বিবকার।

\*

\*

\*

“বি, এ, পরীক্ষার জন্ত টাকা জমা দিবার সময় আসিল, সকলেই

## স্বামী বিবেকানন্দ

আপনাপন বেতন ও পরীক্ষার ফি জমা দিল। হরিদাসের (নরেন্দ্রের একজন সহপাঠী) অবস্থা ভাল নয়, তাহার উপর এক বৎসরকাল বেতন দেওয়া হয় নাই। তখন এ প্রকার ধারে পড়াশুনা ছেনারেল এসেম্‌ব্লিতে চলিত। পরীক্ষার সময় সমস্ত টাকা আদায় করা হইত। বাহারা নেহাত সমস্ত বেতন দিতে অপারক তাহাদের কিছু কিছু আবার তেমন তেমন স্থলে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। এই সমস্ত ছাড়ছাড়ের ভার রাজকুমার নামক একজন বুদ্ধ কেরাণীর উপর সম্পূর্ণ হস্ত ছিল। রাজকুমার সাদাসিদে লোক, একটু-আধটু নেশাটা-আশটা করেন, কিন্তু গরীব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া। তাঁহার দয়ার গুণেই অক্ষম ছাত্রেরা বিনা বেতনে পড়িতে পায়। বেতন সম্বন্ধে রাজকুমারের উপর কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস প্রগাঢ়। রাজকুমার স্বয়ং তদন্ত করিয়া কাহাকেও অর্ধ বেতনে, কাহাকেও বা বিনা বেতনে ভর্তি করেন। রাজকুমার যাহা করেন কর্তৃপক্ষ তাহাই মঞ্জুর করেন, কাজেই ছাত্রমহলে রাজকুমারের বেজায় প্রতিপত্তি। সকলেই বুড়ো কেরাণীকে বড় ভালবাসে, রাজকুমারও ছেলের জহরী, কে কেমন ছেলে বেশ পাকা রকম জানেন। নরেন্দ্রের অক্ষম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কোন উপায়ে ফির টাকা যোগাড় করিয়াছেন, সম্বৎসরের বেতনের টাকার কিন্তু যোগাড় করিতে না পারিয়া একদিন নরেন্দ্রকে সেকথা জানাইলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, 'তুই ভাবিস্‌নি, একজামিনের জন্তে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্তুত হ। আমি রাজকুমারকে বলে সব ঠিক করে দেব, তোর মাইনেটা মাপ করিয়ে দেব, কেবল ফির যোগাড়টা করিস্‌।'

‘বন্ধু উত্তর করিলেন, ‘ভাই, ফির যোগাড় আছে, মাইনেটা মাপ হলে সব গোল মিটে যায়।’

‘নরেন্দ্র কহিলেন, ‘তবে ভাবনা কি, সব ঠিক হবে এখন।’ হুই-



## কলেজে

এক দিন পরে তাঁহারা দুই বন্ধু একত্রে কেরানী রাজকুমারের ঘরের সম্মুখে পদচারণ করিতে করিতে গল্প করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আরও অনেক ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে রাজকুমার আসিলেন। অনেক ছেলে একত্র দেখিয়া রাজকুমার একবার সকলের বাকী-বকেয়া বেতনের তাগাদা করিলেন, একটু জোর তাগাদা—‘অমুক দিনের মধ্যে যে মাইনের টাকা না দেবে এবার তাকে পাঠান হবে না।’ ছেলেরা রাজকুমারকে ঘেরিয়া আপন আপন দুঃখ-কাহিনী বলিয়া বকেয়া বেতনের ক্ষমার জ্ঞপ্তি আদ্য করিতে লাগিল। কতকগুলি ভাল ছেলে রাজকুমারের প্রিয়পাত্র। অল্প ছেলেদের বিষয় তদন্ত করিতে হইলে রাজকুমার অনেক সময় তাহাদের দ্বারাই করেন। নরেন তাহাদের মধ্যে একজন এবং নরেন্দ্র বেশ জানিতেন যে, তাঁহার উপরোধ রাজকুমার এড়াইতে পারিবেন না। রাজকুমারের মাথায় পাকার-কাঁচায় চুল, গৌঁফও তজ্জপ, কেবল তাহার উপর তামাকের ছোপের দাগ দুইপার্শ্বে; কখন তাঁহার চাপকানের বা জামার বোতাম দেবার অবকাশ হইত না। কাঁধে চাদরখানি জাহাজি কাছির মত পাকান। রাজকুমার যাইয়া আপনার চেয়ারের হাতলে চাদরখানি বাধিয়া তত্পরি উপবিষ্ট হইলেন, অমনি বন্বন্ব শব্দে ছেলেরা টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিল। রাজকুমারের চারিধারে বেজায় ভিড়। নরেন্দ্র ভিড় ঠেলিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন, ‘মহাশয়, অমুক দেখছি মাইনেটা দিতে পারবে না, তা আপনি একটু অনুগ্রহ ক’রে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভালরকম পাস হবে। আর না পাঠালে তার সব মাটি হয়।’

“রাজকুমার দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিলেন, ‘তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিশ করতে হবে না, তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা।’

## স্বামী বিবেকানন্দ

আমি ওকে মাইনে না দিলে পাঠাব না।' নরেন্দ্র তাড়া খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া আসিলেন; তাঁহার বন্ধুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, অতীব বিমর্ষ হইয়া নরেনের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ক্লাসে চলিলেন। নরেন্দ্র অপদস্থ হইবার পাত্র নহেন, বন্ধুর ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্তরালে লইয়া কহিলেন, 'তুই হতাশ হচ্ছিস্ কেন? ও বুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি বলছি, তোর একটা উপায় করে দেব, তুই নিশ্চিন্ত হ। আমি যেমন করে পারি তোর একটা উপায় করব। তোর একজামিন দিতে পেলেই ত হল? ভাবিস্নি ভাই, নিশ্চয় বলছি তোর উপায় করবো, এই আমার প্রতিজ্ঞা।' বন্ধুর মুখের অন্ধকার যুটিয়া পুনরায় তাহাতে আশার আলোক দেখা দিল। বন্ধু ভাবিল, নরেন বড়লোকের ছেলে, বাপ উকিল, তাঁহার গান শিখিবার জ্ঞান বেতন দিয়া গুস্তাদ রাখেন, নরেন হয়ত বাপকে বলিয়াই অক্ষম বন্ধুর কোন উপায় করিয়া লইবেন, তাই তাঁহার এত আত্মপ্রত্যয়। রাজকুমার যখন বকেয়া বেতন না দিলে পরীক্ষা দিতে পাঠাইবেন না তখন নরেন নিশ্চয়ই টাকার যোগাড় করিবেন। বন্ধু এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নরেন্দ্র কলেজ হইতে বাটী আসিয়া হেদোর ধারে একটু-আধটু বেড়াইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। অতদিন সন্ধ্যার পরে আসেন, আজ একটু ব্যস্ত হইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই আসিলেন, কিন্তু বাটী না যাইয়া সিমুলিয়ার বাজারের সম্মুখে পদচারণ করিতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে হেদোর দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাজারের একটু পশ্চিমে যাইয়া দক্ষিণে একটি গলি, গলির মোড়ের উপরেই একটি বৃহৎ গুলির আড্ডা। ইতোমধ্যে আড্ডায় যাইয়া নরেন আড্ডাধারীর সহিত চুপি চুপি দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।



আড্ডাধারী বিনা বাক্যব্যয়ে ষাড় নাড়িয়া 'না' বলিল। নরেন আবার হেঁদোর দিকে ছুই-চারি পদ অগ্রসর হইয়াই পার্থের আর একটি গলির ভিতর যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঘেরিয়াছে, বেশ গা ঢাকা মত হইয়াছে, এমন সময় গলির সম্মুখে রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত। অমনি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার পথরোধ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। নরেন্দ্রনাথের দাঁড়াইবার ভঙ্গি দেখিয়াই রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। নিম্ন ভাব চাপিয়া কহিলেন, 'কিরে দত্ত, এখানে কেন?'

"নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'কেন আর কি, আপনার জন্ত দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মশাই, আমি বেশ জানি হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না, তাকে কিন্তু পাঠাতে হবে, নইলে ছাড়ব না। যদি আমার কথাটি না রাখেন ত আমিও কলেজে আপনার কথা রটাব; কলেজে টেঁকা দায় করে তুলব। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ও বেচারার কেন করবেন না?' হিরপ্রতিভ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া রাজকুমারের মুখ শুকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আদর করিয়া নরেন্দ্রের গলদেশে হস্ত জড়াইয়া কহিলেন, 'বাবা, রাগ কচ্ছিঁ কেন? তুই বা বলচ্ছিঁ তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলচ্ছিঁ আমি কি তা করব না?'

"নরেন্দ্র একটু বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন, 'তবে কেন সকাল বেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন?'

"'কি জানিঁ, তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো ঐ বায়না ধরবে, তখন কাকে রেখে কাকে দেব, বাবা? আমি তখন এক বিষম বিপদে পড়ব। আমার আড়ালে বলতে হয়, তুই ছেলেমানুষ, ওসব

## স্বামী বিবেকানন্দ

ত বুঝিনি, কারুর সামনে কি ওকথা বলে? তুই নিশ্চিন্ত হ।  
মাইনের টাকাটা মাপ হবে, তবে ফির টাকা ত আর মাপ হয় না, সেটা  
দেবে ত ?

“সেটার উপায় হতে পারে, তবে মাইনেটা আপনাকে ছেড়ে দিতে  
হবে। সে এক পয়সা দিতে পারবে না।”

“আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে’ বলিয়া রাজকুমার আড্ডার আশেপাশে  
বেড়াইয়া নরেন চলিয়া গেলে আড্ডায় ঢুকিলেন।

“নরেন্দ্র বুড়োর ভাবগতিক দেখিয়া যাইতে যাইতে মুখে কাপড়  
চাপিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সহপাঠী বন্ধুটির বাসা  
নরেন্দ্রনাথের বাসা হইতে বেশী দূর নহে, চোরবাগানে ভুবনমোহন  
সরকারের গলিতে। পর দিন প্রত্যুষে বন্ধুর বাসায় সূর্যোদয়ের পূর্বেই  
উপস্থিত হইয়া বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করিয়া গান ধরিলেন—

ভয়রে!—ঝাঁপতাল

অনুপম-মহিম-পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান

নিরমল পবিত্র উষাকালে।

ভানু নব তাঁর প্রেম-মুখছায়া

দেখ ঐ উদয়গিরি শুভ্র ভালে ॥

মধু সমীরণ বহিছে আজি শুভদিনে

তাঁর নাম গান করি অমৃত ঢালে,

চল সবে ভক্তিভাবে ভগবত-নিকেতনে

প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়-থালে ॥

“নরেনের মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সহপাঠী শব্দা পরিত্যাগ করিয়া  
তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কহিলেন, ‘ওরে, খুব সুখি



## কলেজে

কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকটা আর দিতে হবে না।' এই বলিয়া পূর্বদিনের সমস্ত ঘটনা—রাজকুমারকে ভয় দেখান, ভয়ে তাঁহার কি প্রকার মুখের বিকৃতি হইয়াছিল তাহার নকল, তাহার পর কেমন করিয়া প্রতিদিন এদিক-ওদিক উঁকি মারিয়া ফন্ ফন্ করিয়া গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন, ইত্যাদি নকলের সঙ্গে গল্প করার সকলের মধ্যে মহা হাসির রোল উঠিল।

“পরীক্ষার আর বেশী দেয়ী নাই, বোধ হয় মাসখানেকও নাই, বিপুলকলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's History of England) নরেন্দ্রনাথের একবারও পড়া হয় নাই। পরীক্ষায় পাস করিতে হইবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন চেষ্টাই তাঁহার সহপাঠী-বন্ধুরা দেখেন না, মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্র পূর্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু-আধটু পড়াশুনা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু তথায় যাইলে অধিক সময় কথাবার্তা বা গান গাওয়াই হইত। তাঁহার মাতুলালয়ে যে ছোট ঘরটিতে থাকিতেন তাহার উত্তরে দ্বিতলে তদপেক্ষা একটি বড় ঘর। এই ঘরের পশ্চিমে একটি চোরকুঠরী বা দোছতীর ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরের ভিতর দিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। হামাগুড়ি দিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতে হয়, এত ছোট। তাহার দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র জানালা। এই সময় একদিন প্রাতে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহার নিকট যাইয়া ‘নরেন’ বলিয়া ডাকিলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটি তাঁহাকে ঘরের মধ্যে চারিদিকে খুঁজিয়া না পাইয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। এমন সময় নরেন কহিলেন, ‘এই চোরকুঠরীর ভেতর আছি।’ সেইখান হইতেই বন্ধুর সহিত কথাবার্তা কওয়া হইল, পরে বন্ধু শুনিলেন বিগত দুইদিন ঐ কুঠরীর মধ্যে বসিয়া নরেন

## স্বামী বিবেকানন্দ

ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতেছেন। সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছেন যে, একাসনে বসিয়া পাঠ শেষ করিয়া তবে কুঠরী হইতে বাহির হইবেন। নরেন্দ্র কার্য্যতঃ তাহাই করিলেন। তিন দিনে ঐ বিপুলকার্য্য পুস্তকখানি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন। পরীক্ষার দিন আসিল, নরেনের কোন উদ্বেগ বা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার জ্ঞান কোন উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

“আজ পরীক্ষার প্রথম দিন, সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই নরেন শয্যা ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে চোরবাগানে হরিদাস ও দাশরথির (হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকিল বাবু দাশরথি সান্ম্যাল) বাসায় উপস্থিত। বন্ধুরা এখনও শয্যায় শায়িত। তাঁহাদের ঘরের দ্বারে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন—

ভৈরবী—রাঁপতাল

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ  
তোমারি রচিত ছন্দ মহানু বিশ্বের গীত।  
মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে  
আনিও ছয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।  
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,  
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।  
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভামাঝে বসি,  
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।

“নরেনের গলার আওয়াজ পাইয়া বন্ধুরা শশব্যস্তে উঠিয়া দরজা খুলিলেন। দেখিলেন নরেন আনন্দ-প্রদীপ্ত বদনে একখানি পুস্তক হস্তে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন। হয়ত একটু পাঠ করিবেন ভাবিয়া বন্ধুর



## কলেজে

বাসায় আসিয়া উপস্থিত, কিন্তু ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়া যে ভাবোচ্ছ্বাসের বশ্য ছুটাইলেন, তাহার অবরোধ করিয়া পড়াশুনা করা আর সেদিন হইল না। বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ‘আমরা যে শিশু অতি’, ‘অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারই’ প্রভৃতি গান ও গল্প চলিল। পাশের ঘরে নরেনের অপর এক সহপাঠী বাস করিতেন। নরেনের গান প্রথম আরম্ভ হইলেই তিনি তথায় আসিয়া জুটিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ শুনিলার পর পরীক্ষার কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি গানের সভা-পরিত্যাগকালে বন্ধুভাবে নরেনকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, নরেন একটু হাসিলেন মাত্র, কিন্তু গানের স্রোত থামিল না দেখিয়া বন্ধু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। একজন বন্ধু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘নরেন, একজামিনের দিন কোথায় একটু-আধটু খুঁৎ খাঁৎ বা আছে সেটুকু সেয়ে নেবে, না তোমার দেখছি সকল বিপরীত, বেড়ে ফুর্তি কচ্ছ।’

“নরেন উত্তর করিলেন, ‘হ্যাঁ, তাই ত করছি, মাথাটা সাফ রাখছি; মগজটাকে একটু জ্বিরেন দেওয়া চাই, নইলে এই দুঘণ্টা বা মাথায় ঢোকাবে সেটা ঢুকে আগেকার গুলোকে গুলিয়ে দেবে বই ত নয়। এতদিন পড়ে পড়ে যা হল না তা কি আর দু’এক ঘণ্টায় হয়? হয় না। একজামিনের দিন সকাল বেলাটা কেবল ফুর্তি, কেবল ফুর্তি করে শরীর মনকে একটু শান্তি দিতে হয়। ঘোড়াটা খেটে এলে তাকে ডলাই মলাই করে যেমন তাজা করে নিতে হয়, মগজটাকেও তাই করতে হয়।’ ”

এইকালে নরেন কঠোর ব্রহ্মচারীর ত্রায় দিন কাটাইতেন এবং অর্ধেক রাত্রি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। চিন্তা ও দর্শনালোচনার ফলে এবং

## স্বামী বিবেকানন্দ

স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ব্রহ্মচর্য্য যে ধর্ম্মজীবনের প্রথম অপরিহার্য্য সোপান ইহা তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত বেদান্তনির্দিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যপালন ব্যতীত প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব। তজ্জন্ত এখন হইতে তিনি ব্রহ্মচারীর মত থাকিতে অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তবে অস্ত্রের পক্ষে ব্রহ্মচারী হওয়া বলিলে যেমন অশুদ্ধি বা অপবিত্রতা হইতে বলপূর্ব্বক মনকে ফিরাইয়া শুদ্ধি ও পবিত্রতার দিকে লইয়া যাওয়া বুঝায়, তাঁহার পক্ষে ঠিক তাহা বুঝাইত না। আশৈশব তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল সৎ, উচ্চ ও মহৎ। যৌবনারম্ভে শুধু এই প্রবৃত্তি আরও প্রখর ও বলবতী হইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সৎকার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অর্থে পাঠক মন্দের সহিত ঘন্থে জয়ী হইবার চেষ্টা বুঝিবেন না, কিন্তু ভালর প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বুঝিবেন।

এই সময়ে তিনি পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলে সাদরে তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া গান শুনিতেন বা গল্পগুজব করিতেন। মাতুলালয়ে অবস্থানকালে সামাজিক বা অশ্রু কোন সমস্তা সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে সে-বিষয়ের আলোচনায় নরেন্দ্রের মুখমণ্ডল উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। বয়স্কেরা তাঁহার সে ভাব দেখিয়া বলিত, “ওঃ নরেন, তুমি ভাই অদ্ভুত ছেলে, তোমার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই খুব উজ্জ্বল !”

তাঁহার চরিত্রে দুইটি অসমঞ্জস প্রকৃতি অতি সুসমঞ্জসরূপে পরস্পর বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিত—একটি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব, অপরটি আনন্দের শুদ্ধবিগ্রহরূপে জগৎরস-আনন্দের ভাব। পরবৈরাগ্যের জলন্তমূর্ত্তি ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দ যৌবনের প্রথমে এইরূপে গড়িয়া



## কলেজে

উঠিতেছিলেন। অবৈতের একনিষ্ঠ প্রচারক হইয়াও যিনি ব্যবহারিক জীবনে কৰ্মশীলতা ত্যাগ করিতে কখনও উপদেশ দেন নাই এবং জগৎ প্রকৃতপক্ষে শূন্য হইলেও যিনি অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মানুভূতির পূৰ্ণ পর্য্যন্ত জগৎকে শূন্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে সৰ্ব্বথা নিষেধ করিয়াছেন, তিনি যৌবনারম্ভে গৃহস্থাশ্রমে জীবনটাকে কত মধুরভাবে ভোগ করিতে পারা যায় তাহা দেখাইয়াছিলেন। জীবনযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট জগৎসত্তা না থাকিতে পারে, কিন্তু আর সকলের নিকট তা আছে, সুতরাং জগৎটা ভোগের বস্তু; কিন্তু ইহা অজ্ঞানীর ভোগ নহে, স্বার্থ-বিভূষিত উদ্ধাম লালসার তাড়নায় হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া ভোগের পশ্চাতে উন্মত্তবৎ দৌড়ান ও প্রতি পদে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হওয়া নয়, এ ভোগ প্রকৃত সম্ভোগ—স্বার্থের লেশমাত্র নাই, মলিন বাসনার ছায়াসম্পর্ক-শূন্য, বিশুদ্ধ প্রেমের পরিপূর্ণ আনন্দের বিচিত্র লীলাবিলাস। অন্তরে বৈরাগ্যের দীপ্ত ছতাসন, সুতরাং আসক্তি নাই। আসক্তি নাই—কিন্তু আনন্দ আছে। পিউরিট্যানদের (Puritan) মত জোর করিয়া মনকে ভোগ-বিমুক্ত করিবার চেষ্টায় প্রাণে নিরানন্দের সৃষ্টি নাই, প্রতিহত বিষয়বাসনার নিৰ্ম্মম দংশনে বিষজ্বালার উৎপত্তি নাই, পরন্তু সহজ সরল নিকাম ভোগে পূর্ণ পরিতৃপ্তি, পরম শান্তি ও অল্পস্র আনন্দ আছে।

জগৎকে এইরূপ নিকামভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়াই বাটীতে অসংখ্য দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি প্রায়ই দরিদ্র বন্ধুবান্ধবদিগের দৈন্ত, অভাব ও নিরাশার স্নানচ্ছবির মধ্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ইহাদের সংসর্গে তাঁহার যে আনন্দ হইত, প্রচুর ঐশ্বৰ্য্যের মধ্যেও তিনি সে আনন্দ খুঁজিয়া পাইতেন না।

## স্বামী বিবেকানন্দ

এই সময়ে স্পেন্সারের দর্শনালোচনা তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ঐ মতবাদের কোন কোন প্রসঙ্গের সমালোচনা করিয়া হার্বার্ট স্পেন্সারকে পত্রও লিখিয়াছিলেন। দার্শনিকপ্রবর তাহাতে অতিশয় ক্রীত হইয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা ও সাধুবাদ করিয়া একটি উৎসাহপূর্ণ উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শুনা যায় নাকি গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তাঁহার সমালোচনানুযায়ী নিম্নমতের কতক কতক পরিবর্তন করিবেন এইরূপ আশা দিয়াছিলেন। স্পেন্সারের মত লোক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে নরেন্দ্রের উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল। অন্ততঃ তিনি বুঝিলেন যে চিন্তাশীল লোকেরা তাঁহার কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন না, কথাটার মূল্য আছে। সে-সময়ে রেভারেণ্ড হেষ্টি (Rev. W. W. Hastie) সাহেব জেনারেল এসেমব্লিঙ্ক্, ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ পণ্ডিত-দিগের মধ্যে তখন কেহই পাণ্ডিত্যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। নরেন্দ্র তাঁহার নিকট দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিতকুলচূড়ামণি সুপ্রসিদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ও উক্ত হেষ্টি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রের এক ক্লাস উপরে পড়িতেন। এই হেষ্টি সাহেব বলিয়াছিলেন :—“Narendra Nath Dutta is really a genius! I have travelled far and wide, but I have never yet come across a lad of his talents and possibilities, even in the German Universities, amongst philosophical students. He is bound to make a mark in life.” (নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকৃতই একজন প্রতিভাবান বালক। আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন একটি ছাত্র আর দেখি নাই, এমন



কলেজে

কি আর্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রদিগের মধ্যেও নহে। এ বালক নিশ্চয়ই জগতে একটা নাম রাখিয়া যাইবে।) নরেন্দ্র নিজেও বিশ্বাস করিতেন কোন মহৎ কার্য-সম্পাদনের জন্তই তাঁহার জন্ম হইয়াছে।

বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্যান ও প্রার্থনা করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। সেজষ্ঠ স্পেন্সার প্রমুখ পণ্ডিতগণের বিচারপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থের সঙ্গে 'ঈশাবূসরণ' (Imitation of Christ) নামক ভক্তিগ্রন্থও তিনি আদরের সহিত পাঠ করিতেন।

তঁাহার ইংরেজী জীবনীলেখকগণের এই উক্তি বাস্তবিক সত্য—  
নরেন্দ্রনাথ তঁাহার সমসাময়িক যুবকগণের মধ্যে একজন অদ্ভুত যুবক ছিলেন।  
ছষ্টমিতে বালক, সপ্তমিতে ওস্তাদ, বিদ্যাবুদ্ধিতে পণ্ডিত এবং সাংসারিক  
ব্যাপারে চিন্তাশীল দার্শনিক—এমন একটি ছেলে আর কোথাও পাওয়া  
যাইত না।

## মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা

কলেজে পাঠকালে নরেন্দ্র ষেগকল পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাঁহার মনে অজ্ঞেয়বাদ বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের ছায়া পতিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি স্পেন্সারের গ্রন্থাবলী তাঁহার মনের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎপ্রণীত ‘মূলতত্ত্ব-বিজ্ঞান’ ( The Science of the First Principles ) নামক গ্রন্থখানি ধর্মবিশ্বাসের মূলে সহজেই প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করে। সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া নরেন্দ্রের বহুদিনের ধর্মবিশ্বাস কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া গেল। কিন্তু তিনি নিজে অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন, বিনা যুক্তিতে কোন বিষয় বিশ্বাস বা গ্রাহ্য করিতেন না। যতক্ষণ সে-বিষয়টি যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইত ততক্ষণ তাহাকে ত্যাগ করিতেন না, বরং নিজের চিন্তাশাশ্রির মধ্যে সযত্নে একস্থানে রক্ষা করিতেন। এখন হইতে তিনি পুরোহিতশ্রেণীর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাদের প্রাধাত্যে আস্থাশূন্য হইলেন। দেখিলেন যে তাঁহাদের প্রভুত্ব ও জনসাধারণের অন্ধবিশ্বাস সমগ্র জাতির ধর্মজীবন বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং তিনি তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। স্পেন্সারের যুক্তি তিনি অকাট্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁহার উপর নির্ভর না করিলেও অনেকটা তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিলেন। হেগেল, শোপেনহায়ার এবং মিলকেও তিনি কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার জীবনের পরিচালক বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু স্পেন্সারকেই সর্বাপেক্ষা অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহার বোধ



## মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা

হইতে লাগিল। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান এবং পুরোহিত-দিগের সঙ্গীর্ণতা ও প্রতারণায় বিরক্তচিত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সাধারণ নীতিকে অতিক্রম করা যে পাপ ও সর্বতোভাবে অস্বাভাবিক, ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এ-বিষয়ে তিনি অগস্ত কোনতের দর্শনের (Positivism) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ব্যবহারিক জীবনে উহাকেই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বোধে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই অজ্ঞেয়বাদ অধিক দিন তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিতে পারিল না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতই কেহ স্রষ্টা নাই বা থাকিলেও তাঁহাকে জানা যায় না—ইহা তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই বিদ্রোহী মন তাঁহাকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল। তিনি যতই বিচার করিতে লাগিলেন, ততই ঘোরতর সন্দেহাত্মকতার তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে আরও প্রচণ্ডভাবে ঘিরিতে লাগিল। তিনি মনোমধ্যে বিষম যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং কোনদিকে সত্যের ক্ষীণতম আভাসমাত্রও না পাইয়া অতিশয় বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নৈতিক জীবনের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ উপস্থিত হইল না। তাঁহার আবাল্য বিশ্বাস, গৃহের শিক্ষা ও জীবনযাপন-প্রণালী তাঁহাকে এই সত্যের দিক হইতে কিছুতেই বিচলিত করিতে সমর্থ হইল না। তৎকালে তাঁহার মনের এইরূপ ভাব হইয়াছিল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনে যতই গভীর সন্দেহ হউক না কেন, সেই ছলে ব্যবহারিক জীবনের বিশুদ্ধতা নষ্ট করা কোন বুদ্ধিমান মনুষ্যেরই উচিত নহে। মানুষের বিচারশক্তি যতই অগ্রসর হউক না, তাহার একটা সীমা আছে, অনেক বিষয় জানিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সুতরাং হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত করিয়া তাহার স্থলে তিনি শুদ্ধ বিচারকে

## স্বামী বিবেকানন্দ

প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত হইলেন না। হৃদয় যাহা উচিত বা ত্রাসসম্বত বলিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিতেছিল, কেবল বুদ্ধি বা বিচারের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি অসম্মুচিতচিত্তে সেই দিক অনুসরণ করিতে ছিলেন। হৃদয়ের প্রেরণাতেই তিনি কঠোর ত্যাগীর জীবন যাপন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া বিধবার ত্রাস শুভ্র বস্ত্র পরিধান ও ভূষায়া শয়ন করিতে লাগিলেন। মনের মধ্যে যে ত্যাগের ভাব বহুশ্রোতের মত হু হু করিয়া আসিতে লাগিল তাহাকে রোধ করা আবশ্যক মনে করিলেন না,—বরং জীবনের পূর্ণ পরিণতির জন্ত তাহার সম্যক উপযোগিতা আছে বলিয়া অনুভব করিলেন।

এদিকে বাটার লোকেরা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পিতামাতা সকলেরই ইচ্ছা যে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যতবারই তাঁহারা নরেন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছেন, ততবারই একটা না একটা অদৃষ্টপূর্ব প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শেষ বারে তাঁহার পিতা মানবলীলা সংবরণ করেন। সেটা তাঁহার বি, এ, পরীক্ষা দিবার অল্পদিন পরেই ঘটে। পরিবার-মধ্যে তাঁহার বিবাহ লইয়া এত উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছিল বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের সেদিকে কোন খেয়ালই ছিল না।' তিনি দর্শনশাস্ত্র

---

১ তাঁহার পিতামাতার ইচ্ছা ছিল বিবাহের পর তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবেন ও সেখানে তিনি সিভিল সার্ভিস কিংবা ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্ত চেষ্টা করিবেন। কলেজে পড়িবার সময় নরেন্দ্রের মনেও 'বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস দিব' এইরূপ একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু বিবাহবিষয়ে তাঁহার মত হয় নাই; কারণ পরমহংসদেব তাঁহার বিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং ঐ কথা শুনিয়া কালীমাতার নিকট কাদিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, ওর বিয়ে-টিয়ে খুঁসিয়ে দে।' নরেন্দ্রও সেই হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন কিছুতেই বিবাহ করিবেন না, এবং পিতার ভৎসনায় ও গৃহবহিষ্কৃত হইবার ভয়প্রদর্শনেও কোন ফল হয় নাই।



## মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা

আলোচনা ও চিন্তার ফলে ঐহিক ভোগ-সুখটাকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ তাঁহাকে আর কিছু শিক্ষা দিক বা নাই দিক জীবনটা যে স্বপ্নবৎ অস্থায়ী ও অলীক এবং জগতের তাবৎ পদার্থই নিরর্থক, এইটুকু বিশেষ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিল। এই অসার স্বপ্নসম জীবনের মধ্যে সত্যকে লাভ করাই যে চরম সার্থকতা, এইটি স্থির করিয়া তিনি ক্রমাগত বিচারের সাহায্যে তাহারই নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাকে প্রতিপদে অবিস্থানের সহিত বুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা জিনিস সত্য বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ না হইতেছিল ততক্ষণ তিনি কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু প্রমাণের জ্ঞান বিধিযত চেষ্টা করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিরত ছিলেন না। নিজের ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা তিনি অনেকটা পরিকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন, এতটা চেষ্টা ও সংগ্রাম বিফলে যাইবে না, এমন দিন আসিবে যেদিন তিনি যাহা চাহিতেছিলেন তাহা লাভ হইবে এবং সন্দেহ ও অজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া দীপ্ত সত্যের সম্মুখে অবস্থান করিবেন। কিন্তু এত সন্দেহ ও বিচারের মধ্যেও তিনি পূর্বাভাস্ত ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করেন নাই। ধ্যান যখন জমিয়া আসিত তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্তর্লীন অবস্থায় থাকিতেন, সেখানে আর সন্দেহ বা অবিস্থানের প্রবেশাধিকার ছিল না। ঐ সময়টা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, কারণ এ আর চিন্তা বা করনা মাত্র নহে, প্রকৃতই একটা অনুভূতি, সাক্ষাৎ উপলব্ধি। নরেন্দ্র-চরিত্রে এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সংশয়াকুল চিন্তা দুইটি পাশাপাশি অবস্থিতি করিত। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। সন্দেহবাদীদের স্থায়ী তিনি অন্ধকারের মধ্যে আপনার পথ হারাইয়া

## স্বামী বিবেকানন্দ

ফেলেন নাই। অন্ধকারেও আলোর আশায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে ছিলেন। ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল সত্যলাভের প্রতিজ্ঞা ততই তাঁহার মনোমধ্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদে অনুসন্ধিৎসু মন অধিক দিন পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না, নরেন্দ্রও পারিলেন না। ‘জ্ঞানের সীমা এতদূর পর্য্যন্ত, এর বেশী আর জানিবার উপায় নাই’ এভাবে বেশী দিন চলিল না। যদিও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্মপ্রবৃত্তি সন্দেহ ও বিচারের পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া প্রায় প্রাণ হারাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তথাপি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও ত্যাগের মাঝখানে একদিন তাহা ফিরিয়া আসিল এবং অজ্ঞেয়বাদকে নির্বাসিত করিয়া তাহার স্থানে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানময় ও প্রেমময় ঈশ্বরকে সগোরবে প্রতিষ্ঠিত করিল। সেদিন হইতে তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস হইল যে, ঈশ্বর প্রকৃতই আছেন, যদিও আমরা তাঁহাকে চর্মচক্ষে দেখিতে পাই না। সেদিন হইতে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা আসিয়া তাঁহার মস্তককে সহজেই সেই উপাশ্রু ঈশ্বরের চরণোদ্দেশে অবনত করিয়া দিল। সেদিন হইতে তিনি তাঁহাদের বাটার পূজার দালানে সঙ্গীদিগের নিকট কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনের পিপাসা মিটিতেছিল না। তিনি এমন একজন প্রাণের দোসর খুঁজিতেছিলেন যিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে অভীষিত পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু এরূপ কেহ জুটিল না। তিনি সংকল্প করিলেন যেমন করিয়াই হউক ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। সেইজন্ত এমন একজনকে খুঁজিতে লাগিলেন যিনি স্বয়ং ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাকেও দর্শন করাইয়া দিতে পারিবেন। ভক্তের ভগবান স্মরণ হইয়া



## মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা

একদিন তাঁহাকে তাঁহার বাস্তবিতের সহিত মিলন করাইয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাঠক দেখিবেন সহজে বা শীঘ্রই তাহা হয় নাই। মন্তকে অশেষ চিন্তাভার ও হৃদয়ে বিপুল বেদনার বোঝা লইয়া তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছিল এবং ধৈর্য্যের সহিত অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল—তবে তিনি বাস্তবিতের দর্শন পাইয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যেদিন যেদিন তাঁহাদের উপাসনা বা বক্তৃতা থাকিত সেইদিনই তিনি উপস্থিত হইতেন এবং শীঘ্রই রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলী ও ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইলেন। সেসময়ে বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন নব্যবঙ্গের নেতা। কেশব বাবুর অনেক ভক্ত। তাঁহার গভীর ভাব, ধর্ম্মোৎসাহ ও আকর্ষণী শক্তিতে নরেন্দ্র যুগ্ম হইলেন এবং অকুণ্ঠচিত্তে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইত—তিনিও যেন কালে কেশব বাবুর মত হইতে পারেন। এক হিসাবে তাঁহার এ বাসনা পূর্ণও হইয়াছিল। উত্তরকালে তিনিও বক্তৃতাকুশল লোকশিক্ষক বলিয়া কেশব বাবুর ত্রায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, কেশব বাবুর ত্রায় প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি নূতন কিছুই প্রতিষ্ঠা করেন নাই, বরং স্বীয় মতকে পুরাতনেরই অভিব্যক্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

পুরাতন কঙ্কালসার সমাজের অত্যাচারে ব্যথিতচিত্ত নরেন্দ্রনাথ কতকগুলি বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের সহিত একমত হইলেন। জাতিভেদের দোরাণ্ডা ও জীজ্ঞাতির শিক্ষাহীনতা তাঁহার চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় পরিবার ও আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিলেন। তাঁহার মাতা ধীরভাবে সব শ্রবণ

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিলেন, কিন্তু পুত্রের সত্যপ্রিয়তা ও অকপটতার উপর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলিয়া মুখে কিছু বলিলেন না, মনে করিলেন কালে তিনি আপনিই ভালমন্দ বিচার করিতে সমর্থ হইবেন।

নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে করিতে ক্রমে রীতিমত খাতার নাম লিখাইয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন। এমন কি, যখন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন তখনও হয়ত ব্রাহ্মদিগের খাতার তাঁহার নাম ছিল। কিন্তু তখন তাঁহার আদর্শ ব্রাহ্ম-আদর্শের বহু উপরে উঠিয়াছে এবং সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার কল্পনা ব্রাহ্মসমাজবদ্ধ সংস্কার অপেক্ষা আরও আমূল পরিবর্তনের সংকল্প গঠিত করিয়াছে। কিন্তু এই সংস্কারের পথ ও উপায় সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের সহিত তাঁহার মতের বিস্তর ব্যবধান হইয়া পড়িয়াছিল। শেষ জীবনে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন যে বিনাশমূলক-সংস্কার অপেক্ষা গঠনমূলক-সংস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত সংস্কার করিতে হইলে বাহিরের আঘাতে জন-সাধারণের দীর্ঘকালের বিশ্বাস ও ধারণার উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত না করিয়া তাহাদের বুদ্ধিকে শিক্ষিত, মার্জিত ও উন্নত করিয়া অন্তরের মধ্য হইতে স্বতঃই সেই সংস্কার প্রবৃত্তিকে জাগাইতে হইবে, নতুবা কৃতকার্যতার আশা বড় কম। পুরুষপরম্পরাগত রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে নিন্দা বা অবজ্ঞা না করিয়া যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বজায় রাখিতে হইবে ও মন্দ ভাগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিদেশীয় ভাব বা বিজাতীয় আদর্শের পশ্চাতে দৌড়াইলে বা তাহাদের বাহা শ্রেয় ও প্রেয় তাহাকেই অন্ধের ছায়া আমাদিগেরও একমাত্র শ্রেয় ও প্রেয় বোঝে গ্রহণ করিলে হিতে বিপরীত হইবে মাত্র, আর কিছু লাভ হইবে না। পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া নূতনের অন্ধ-অন্ধকরণ প্রকৃত সংস্কার নহে,



## মনোরাজ্যে তুমুল ঝটিকা

কিন্তু চতুর্দিক হইতে পুরাতনের উপর যে নবরশ্মি পতিত হইতেছে তাহার সাহায্যে পুরাতনের সারাংশকে চিনিয়া, বাছিয়া ও নূতনের সহিত তাহাকে কতকটা মিলাইয়া কর্মজীবনে আপনাদের হৃদয় ও মনের অংশীভূত করিয়া লওয়াই প্রকৃত সংস্কার।

নরেন্দ্র গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ভারতের অনেক সমস্যা তখন তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ হিন্দুধর্মের প্রসার সাধন করিয়া তাহার মধ্যে জাতীয়তাবকে জাগ্রত করিয়া তোলাই এখন তাঁহার প্রধান ধ্যেয় বস্তু হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়া নরেন্দ্র সমবয়স্ক বয়স্কাগণের নিকট অগ্নিময়ী ভাষায় বিশৃঙ্খল ও অবনত হিন্দুসমাজের সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তরে তিনি কখনও নিজেকে হিন্দু ব্যতীত আর কিছু মনে করিতেন না। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দু বলিয়া বিবেচনা করিতেন,— তবে সমাজের সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে পারিতেন না।

## অকুল চিন্তাসাগরে আশ্রয়

প্রথম প্রথম ব্রাহ্মসমাজে মিশিয়া নরেন্দ্র কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার মনে সর্বদাই কেশব বাবুর ছায়া প্রচারক হইবার বলবতী বাসনা উদ্ভিত হইত। সে-সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেক চরিত্রবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াও তিনি বেশ প্রীতি লাভ করিতেন। দিন কতকের জ্ঞান মনটা যেন শান্ত হইল, কিন্তু তাহার পর আবার পূর্ববৎ অশান্তি আরম্ভ হইল। কেবল ভাবিতে লাগিলেন—কৈ, ঈশ্বরের দর্শনলাভ হইল কৈ? ব্রাহ্মসমাজে যখন তিনি গান গাহিতেন, তখন ক্ষণিকের জ্ঞান প্রাণে ভগবৎরসের আনন্দ পাইতেন, কিন্তু সেও ক্ষণিক। সুতরাং তিনি আবার একান্ত চিন্তে আলোকের জ্ঞান প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রাণের উৎকর্ষায় তিনি একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি তখনকার শিক্ষিত লোকদিগের নিকট একজন উচ্চশ্রেণীর ধর্ম-শিক্ষক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি শান্তি ও সত্যকামনায় কতকটা ত্যাগীর ছায়া জীবন যাপন করিতেছিলেন এবং সদাসর্বদা প্রায় ধ্যানধারণাতেই অতিবাহিত করিতেন। তিনিই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে ধর্মপথে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বহির্বিকাশ সাধন করেন। সুতরাং নরেন্দ্র মনে করিলেন তাঁহার নিকট যাইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। মহর্ষি তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া গভীর ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিলেন। শীঘ্রই একটি দল সংগঠিত হইল, সেখানে মহর্ষি প্রত্যহ কিয়ৎক্ষণের



## অকুল চিন্তাসাগরে আশ্রয়

অল্প ধ্যানাভ্যাস-প্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধ্যানান্তে কে কেমন উপলব্ধি করিতেছে তাহার পরিচয় লওয়া হইত। নরেন্দ্র উপলব্ধি করিতেন যেন একটা জ্যোতির্বিন্দু ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে অণুগুলের মধ্যভাগে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। তারপর যেন সেই জ্যোতির্বিদ্যুৎ হইতে নানাবিধ অসংখ্য উজ্জ্বল রশ্মি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে। তারপর তাঁহার জ্ঞান যেন সাধারণ সসীম ক্ষেত্র ছাড়িয়া এক অজ্ঞেয় অসীম রাজ্যের মধ্যে গিয়া পড়ে, কিন্তু ঠিক এই স্থানে আসিলেই তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইত এবং সেই আলোকরশ্মি-উদ্ভাসিত বর্ণমালা অন্তর্হিত হইত। মহর্ষি বুঝিলেন, এ যুবকটি সাধারণ যুবক-সম্প্রদায় হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। সুতরাং তিনি তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং নিজে যতদূর পারিলেন এ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিলেন। এমন কি অপরের নিকট তাঁহাকে একজন অসাধারণ সুশুশ্রূষা যুবক বলিয়াও প্রকাশ করিলেন। নরেন্দ্র শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে প্রত্যহ তাঁহার নিকট যাতায়াত ও তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন না—শান্তি মিলিল না।

একদিন তিনি মহর্ষির গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকামধ্যে গমন করিয়া দ্রুতগতি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি তখন উপাসনা করিতে ছিলেন। নরেন্দ্র কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়, আপনি কি স্বয়ং ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?” সহসা এই তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অপূর্ব্ব প্রশ্নে মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিলেন। একবার—দুইবার—তিনবার তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তিনি ক্ষণকাল নরেন্দ্রের নেত্রমধ্যে দৃষ্টি

## স্বামী বিবেকানন্দ

সন্নিবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “বৎস! তোমার চক্ষুদ্বয় ঠিক যোগী-দিগের চক্ষের স্থায়!”

ইহার পর কিছুদিন গেল, কিন্তু নরেন্দ্রের চিন্তের অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মহর্ষির উত্তরে তিনি বিশেষ পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি ত ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন একথা বলেন নাই,—কি করিয়া এখন ঈশ্বর লাভ করা যায়? তিনি জানিতেন যে, দর্শন আদি শাস্ত্র অতি তুচ্ছ। তাহারা শুধু ভগবানকে বুঝিবার একটুকু কীর্ণ চেষ্টা মাত্র। পুস্তকের মধ্যে ভগবদর্শনলাভ অসম্ভব; তবে কি করা যায়? তখন তাঁহার মনে হইল পরমহংসদেবের কথা। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি প্রথম পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঐ বৎসর তিনি পরীক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নামে পরমহংসদেবের এক শিষ্য একদিন স্বকীয় সিমুলিয়ার বাসভবনে পরমহংসদেবকে আনয়ন করিয়া একটি ছোটখাট উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তত্পলক্ষে একজন সুগায়কের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি আর কাহাকেও না পাইয়া প্রতিবেশী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রকে সাদরে নিজালয়ে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। ঐ দিবস নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন; ভজনাদি সাজ হইলে সুরেন্দ্র বাবু ও রামচন্দ্র দত্তের নিকট তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং এক দিবস তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেধরে যাইবার জন্ত তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে যখন তাঁহার পিতা এক ধনাঢ্যের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ স্থির করিতেছিলেন এবং কন্যার পিতা দশ সহস্র মুদ্রার পরিবর্তে ঈদৃশ সর্বগুণসম্পন্ন জামাতারত্ন-লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া



## অকূল চিন্তাসাগরে আশ্রয়

আপনার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতেছিলেন, সেই সময়ে নরেন্দ্রকে উক্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত দেখিয়া ও তাঁহার আন্তরিক ধর্ম-ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতৃ-অঙ্গে লালিত তাঁহাদেরই এক আত্মীয় (রামদাদা—ভক্ত ৮রামচন্দ্র দত্ত) তাঁহাকে বলেন, “ভাই, তুমি ধর্ম ধর্ম করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? যদি প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জানিতে ও ঈশ্বরলাভ করিতে চাও তবে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট যাও।” তাহার পর একদিন জন দুই-তিন বয়স্ক সমভিব্যাহারে নরেন্দ্র উপরোক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে সঙ্গে লইয়া শকটারোহণে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। ঠাকুরকে দেখিতে এই তাঁহার প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গমন ও ঠাকুরের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ।<sup>১</sup> এদিন ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে গান গাহিতে বলায় তিনি তাঁহার সম্মুখে ব্রাহ্মসমাজাদৃত ‘মন চল নিজ নিকেতনে’ এই গানটি গাহিলেন। ঠাকুর তাহা শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। গাহিবার পর ঠাকুর হঠাৎ উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উত্তরের বারাগাওয় লইয়া গেলেন ও ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে যেন বহুদিনের পরিচিতের স্থায় বলিতে লাগিলেন, ‘এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোমার পথ চেয়ে হাঁ করে বসে আছি—তা কি একটিবারও মনে করতে নেই? বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার যে ঠোঁট পুড়ে যাবার মত

<sup>১</sup> ‘শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গ’কার বলেন, এইটি দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার (‘উদ্বোধন’—আখিন, ১৩২২); কিন্তু ‘কথামৃত’কার বলেন ইহাই স্বামীজীর পরমহংসদেবকে প্রথম দর্শন (কথামৃত, ৩য় ভাগ, প্রথম সংস্করণ, ২৮৬ পৃঃ)। ‘কথামৃত’কারের মতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে দর্শনের পর রাজমোহনের বাড়ীতে দ্বিতীয় দর্শন হয়। (কথামৃত, ৩য় ভাগ, ২৮৭ পৃঃ)

## স্বামী বিবেকানন্দ

হয়েছে।' এইসব বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে আবার কৃতাজ্ঞলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমি জানি তুমি কে। তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নরনারায়ণ, জীবের দুর্গতি-নিবারণের জন্তই তোমার শরীরধারণ হইয়াছে, ইত্যাদি।' নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে এবস্ত্রকার কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে একপ্রকার উন্মাদ (monomaniac) বলিয়া স্থির করিলেন। সুতরাং বেশী কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন মাত্র। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে স্বহস্তে মাখন, মিছরি ও সন্দেশ খাওয়াইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া একত্রে খাইবার কথা বলিলে ঠাকুর 'ওরা খাবে এখন, তুমি খাও না' বলিয়া সবটুকু তাঁহাকে খাওয়াইয়া ছাড়িলেন। তারপর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, শীঘ্র আর একদিন একলা আমার কাছে আসবি?' তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নরেন্দ্র আসিব বলিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হইলেন।

বাটাতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরের অদ্বুত আচরণ ও ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদবৎ অবস্থার কথা যদিও কয়েকদিন বারংবার তাঁহার মনে হইয়াছিল, তথাপি কার্য্যগতিকে আর উক্ত অঙ্গীকারপালনের সুযোগ ঘটে নাই। মাসাধিক কাল পরে আবার একদিন তিনি একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখিতে যান। ঠাকুর সেইদিনও পূর্বদিনকার মত ছোট তক্তাপোশখানির উপর বসিয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্র জানন্দে হাত ধরিয়া তক্তাপোশেরই

---

১ 'লীলাপ্রসঙ্গ'প্রণেতা বলেন, দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনই পরমহংসদেব স্বামীজীকে এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু 'কথামৃত', ৩য় ভাগের (প্রথম সংস্করণ) ২৮৭ পৃষ্ঠায় আছে—প্রথম দিন নয়, অথ আর একদিন।



## অকূল চিন্তাসাগরে আশ্রয়

একধারে বসাইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া অন্তর্দৃষ্টিতে কি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ভাবিলেন, পাগল বোধ হয় আবার কোন পাগলামি করিবে। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে ঠাকুর সহসা তাঁহার দক্ষিণ পদ দিয়া নরেন্দ্রের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ-মাত্রই নরেন্দ্রের বোধ হইল গৃহের ভিত্তিসমূহ ও চতুর্দিককার জিনিসপত্র, গাছপালা, চন্দ্রসূর্য্য সব যেন সবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁহার অস্তিত্বকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! তিনি হঠাৎ দারুণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যু-সম্ভাবনার আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, ‘ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!’ এতচ্ছবণে ঠাকুর প্রথমে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, পরে তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, ‘তবে এখন থাক, তাড়াতাড়িতে কাজ নেই, সময়ে হবে।’ কিঞ্চিৎ পরে নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন। সেদিনের ঘটনায় তাঁহার ধারণা হইল ঠাকুর সম্ভবতঃ খুব ভাল হিপনটিজম্ (Hypnotism) বা মেসমেরিজম্ (Mesmerism) জানেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে দুর্ব্বলচিত্ত ক্ষীণমস্তিক লোকেরাই ত ঐরূপে বশ হয়; চিরদিন নিজের মানসিক দৃঢ়তার উপর বিশ্বাস থাকায় ব্যাপারটা কি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

উপরোক্ত ঘটনার প্রায় সপ্তাহকাল পরে নরেন্দ্র পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তখন ঠাকুরকে পরীক্ষা করিবার ভাব তাঁহার মধ্যে খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন রাসমণির বাগানে জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া পার্শ্ববর্তী যদু মল্লিকের বাগানে প্রবেশ করিলেন, এবং উদ্ভানে ও গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া উদ্ভানমধ্যস্থ একটি গৃহে আসিয়া উপবেশন করার কিঞ্চিৎ

## স্বামী বিবেকানন্দ

পরেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্র ধীরভাবে উক্ত অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুর পূর্ব দিনের মত হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। পূর্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও নরেন্দ্র ঐ স্পর্শে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তবে এদিনে পূর্ব দিনের তায় না হইয়া একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে চেতনালাভ হইলে দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহাকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া দ্বিৎ হস্ত করিতেছেন।

‘লীলাপ্রসঙ্গ’কার বলেন, ঐদিন নরেনের বাহ্য সংজ্ঞা লোপ হইলে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কে সে—কোথা হইতে আসিয়াছে—কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে)—কতদিন এখানে (পৃথিবীতে) থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নরেন্দ্রও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐসকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। তাহা হইতে ঠাকুর জানিতে পারেন যে তিনি নরেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা ভাবিয়াছিলেন সেগুলি সব সত্য এবং তিনি (নরেন্দ্র) প্রকৃতই যাহা, যেদিন তাহা জানিতে পারিবেন, সেদিন আর দেহ রাখিবেন না,—সংকল্প দ্বারা যোগমার্গে দেহত্যাগ করিবেন। তিনি নরেন্দ্রকে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এইরূপে অষ্টাদশবর্ষ বয়সের সময় হইতে নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের নিকট মध्ये মध्ये যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তখনও তিনি সেই অলোকসামান্য মহাপুরুষের অদ্ভুত চরিত্র সম্যক্ অবধারণ করিতে পারেন নাই। কখনও মনে করিতেন, তিনি উন্মাদ—ঈশ্বরের ভাবনা ভাবিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কখনও ভাবিতেন, না, ইনি সত্যই সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ,—কিন্তু ঠিক তাঁহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন



## অকুল চিন্তাসাগরে আশ্রয়

না। তিনি নিজের আন্তরিক ধর্মপিপাসা-শান্তি-মানসে ব্রাহ্মসমাধে ও অগ্রাগ্র স্থানে মিশিতেন বটে, কিন্তু যখন কিছুতেই সত্যনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন না, যখন বুঝিলেন এমন কি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, তখন তিনি স্থির করিলেন পরমহংসদেবকে এ সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসা করিবেন। মনে ভয় হইতে লাগিল পাছে তিনিও বলেন, 'না, আমারও ঈশ্বরদর্শন হয় নাই।'

একদিন তিনি ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইলেন এবং পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি না। পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, 'হাঁ গো, এই যেমন তোমার দেখছি।' পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে শুধু তিনি নিজে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহাকেও দেখাইয়া দিতে পারেন বলিয়াছিলেন। তাঁহার যেসকল অদ্ভুত অদ্ভুত রূপ দর্শন হইত, প্রথম প্রথম ইংরেজী-শিক্ষিত বাহ্যবুদ্ধিমানসহায় নরেন্দ্রনাথ তাহাদের বাস্তব-সত্তার সন্দিহান হইয়া ঐসকল দর্শনের বিষয় হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি পরমহংসদেবের প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও অমৃতময় উপদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ প্রসারতা লাভ করিতেছিল এবং অনেক অন্তঃসংগ্রাম ও তর্ক-বিরোধের পর অবশেষে তিনি পরমহংসদেবের সকল কথা সত্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ছ'এক দিনে হয় নাই, তিনি দীর্ঘ পাঁচবৎসর কাল ধরিয়া প্রতিপদে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া-ছিলেন ও সম্পূর্ণ প্রমাণসহায়ে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনও তাঁহার প্রতি সন্দেহ ত্যাগ করেন নাই।

## পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট

ইতিমধ্যে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে নরেন্দ্রনাথের জীবনে এক বিবশ পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ বাবু পরলোকগমন করেন। তখন নরেন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। সবে বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছেন। পরীক্ষার দিনকতক পরে একদিন তিনি বরাহনগরের বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত গান-বাজনা করিয়া আহারাদির পর সকলে একগুঁহে শয়ন করিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন দোড়াইতে দোড়াইতে আসিয়া সংবাদ দিল যে, হৃদরোগে বিশ্বনাথ বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদে নরেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও শোককাতর-হৃদয়ে যথাবিধি পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করিলেন।

তারপর বড় কষ্ট আরম্ভ হইল। অনেক অর্থ উপার্জন করিলেও মুক্তহস্ত বিশ্বনাথ বাবু বড় কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং কিঞ্চিৎ ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর সংসার চলা ছুফর হইয়া উঠিল। শোকাতুর নরেন্দ্রনাথ ভগ্ন-হৃদয়া জননীকে অনেক সাহসনা দিলেন ও বলিলেন সব ঠিক হইয়া যাইবে। মাতা দুঃখের মধ্যে পুত্রের হৃদয়ের বল দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। কয়েক সপ্তাহ একরূপে কাটিয়া গেল, কিন্তু তারপর প্রকৃতই অন্নকষ্ট আরম্ভ হইল। নরেন্দ্র তখন বি, এল, পড়িতেছিলেন। অর্থভাবে দীনদরিদ্রের বেশে কলেজে যাইতেন। দূর-দূরাস্তরে যাইতে হইলেও কখন পদব্রজে



## পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট

ব্যতীত গাড়ীতে যাইতেন না। যেসকল গাড়োয়ানেরা পূর্বে তাঁহার নিকট অনেক বকশিস পাইয়াছে তাহারা এখন তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া কখন কখন তাঁহাদের পূর্বগোরব স্মরণ করিয়া বিনা ভাড়ায় তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত, কিন্তু তিনি এই-সকল সুযোগ গ্রহণ করিতেন না। সেসব দিন যে কি অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে তাহা তিনি ও তাঁহার মাতাই জানিতেন। বাহিরের লোকে তাহার শতাংশের একাংশও টের পায় নাই।

১ স্বামীর মৃত্যুর পর দারিদ্র্যে পতিত হইয়া ভুবনেশ্বরী দেবীর বৈধা, সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণরাজি বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যিনি প্রতিমাসে সংসার পরিচালনা করিতেন, সেই তাঁহাকে তখন মাসিক ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতে হইত, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে একদিনের নিমিত্ত বিষয় দেখা যাইত না। ঐ অল্প আয়েই তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সকল বন্দোবস্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে, লোকে দেখিয়া তাঁহার মাসিক ব্যয় অনেক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী তখন কিরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসর হয়। সংসারনির্বাহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই অথচ তাঁহার সুখ-পালিতা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্রসকলের ভরণপোষণ এবং বিদ্যালিক্ষার বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্বাহ করিতে হইবে—তাঁহার পতির সহায়ে যেসকল আত্মীয়গণ বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছিলেন তাঁহারা সাহায্য করা দূরে থাকুক, সময় পাইয়া শ্রাঘ্য অধিকারসকলেরও লোপনাশনে কৃতসঙ্কল্প। তাঁহার অশেষ-সদৃশগণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও অর্থকর কোনরূপ কাজকর্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিত্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন—এইরূপ ভীষণ অবস্থায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বেরূপ ধীরস্থিরভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভক্তিপ্রস্ফুর্ত হৃদয় উদয় হয়।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ

## স্বামী বিবেকানন্দ

কয়েকমাস পরে পাহুকা-ব্যবহারও তাঁহার পক্ষে যেন একটা বিলাসের মধ্যে পরিগণিত হইয়া দাঁড়াইল। পরণে মোটা গুণচটের মত কাপড়, উদরে অন্ন নাই, সমস্তদিন মধ্যাহ্নের প্রথর রোদ্দ্রে অনাহারে নগ্নপদে চাকরীর চেষ্টায় দরখাস্ত হাতে অফিসে অফিসে ঘুরিতে হইয়াছে। কখনও কাহারও নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য বা সহানুভূতি পান নাই, বরং পূর্বে যাহারা তাঁহাকে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পাইলে জীবন ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, তাহারও এখন অনেকে তাঁহার দুঃসময় দেখিয়া মুখ বাঁকাইতে লাগিল বা ক্ষমতা স্বত্বেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইল। দেখিয়া শুনিয়া সংসারটা তাঁহার নিকট আশ্চর্য্যিক সৃষ্টি বলিয়া বোধ হইত।

সারদানন্দ স্বামী বলেন—এই সময়ে এক দিন রোদ্দ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার পায়ের তলায় ফোঁস্কা হইয়াছিল এবং তিনি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মন্থমেণ্টের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐস্থানে দুই-এক জন বন্ধু আসিয়া জুটিল ও তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে সাহায্য দিবার জন্য ‘বহিছে ক্রপাধন নিঃখাস পবনে,’ এই গানটি গাহিতে লাগিল। স্বামীজী বলিতেন, “শুনিয়া মনে হইয়াছিল যেন সে মাথায় গুরুতর আঘাত করিতেছে। বাটীতে বুদ্ধাক্ত জননী ও ভাই-ভগিনীদের কথা স্মৃতিপথে উদ্ভিত হওয়ায় ক্ষোভে, অভিমানে নৈরাশ্র্যব্যঞ্জকস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, ‘নে নে, চুপ কর; ক্ষুধার তাড়নায় যাদের মা-ভাইকে কষ্ট পাইতে হয় না, দৈন্ত্য অভাব যে কি তাহা যাহারা কখনও টের পায়নি, টানা পাখার তলায় বসিয়া এসব কল্পনা তাদের ভাল লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত; কিন্তু কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ



## পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট

হইতেছে।” বন্ধুটি বোধ হয় তাঁহার কথায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ দিয়া ঐসকল কথা নির্গত হইয়াছিল, তাহা তিনি কিরূপে বুঝিবেন! নরেন্দ্র প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিতেন গৃহে খাদ্যদ্রব্য কি আছে না আছে। যেদিন বুঝিতেন অনটন, অথচ হস্তে অর্থ নাই, সেদিন মাতাকে “আমার নিমন্ত্রণ আছে” বলিয়া বাহির হইতেন, বা নিজে সামান্য কিছু খাইয়া অধিকাংশ অপরের জ্ঞাত রাখিয়া দিতেন, কোন কোন দিন বা একেবারে উপবাসে কাটাইতেন।

কিন্তু এত দুঃখ-দৈত্যের মধ্যেও নরেন্দ্র হৃদয়ে বল হারান নাই বা বাহিরে কোনরূপ দুর্বলতার চিহ্ন ব্যক্ত হইতে দেন নাই। ভিতরে যতই দৈত্য থাকুক না কেন, বাহিরের লোকে তাহা জানিবে কেন? দত্তবংশ চিরদিন মানসদ্বন্ডে সমুদ্রত ছিল, হঠাৎ সেই বংশগৌরবকে তিনি নত করিতে পারিলেন না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে অনেক ধনিসন্তান বেড়াইতে যাইবার সময় পূর্বের জ্ঞাত তাঁহার বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইতেন ও উদ্যানাদিতে গিয়া সঙ্গীতাদি আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেন। তিনি তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে অনিচ্ছাসম্বন্ধেও তাঁহাদের সহিত যাইতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু কখনও অন্তরের কথা তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেন না। তাঁহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও ঐবিষয়ে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না। দেখিতেন বটে, তিনি দিন দিন শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছেন, তথাপি উহার মূলে যে পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ ব্যতীত আর কিছু আছে, এরূপ সন্দেহ করিতেন না। স্বামীজী বলিতেন, “সময় বুঝিয়া

## স্বামী বিবেকানন্দ

অবিভ্যাপিণী মহামায়াও এইকালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্ন রমণীর পূর্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল, অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা-প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল।” এই অবস্থায় আর একদিন কয়েকজন ধনিপুত্র তাঁহাকে এক বাগান-বাটীতে লইয়া গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিবার জন্ত আহ্বান করে ও দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অমোঘ ঔষধ বলিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিবার পরামর্শ দেয়। এমন কি বলিতে লজ্জা হয় যে, উক্ত চরিত্রহীন বন্ধুবর্গ একজন বারানসীকেও তাঁহার নিকট লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে তাহার পূর্ব পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করেন ও কেন সে ঐরূপ অশ্লীলতা গ্রহণ করিয়াছে, উহাতে তাহার মনে বিন্দুমাত্র স্নেহ আছে কিনা এবং সে পরকালের সম্বল কিছু করিয়াছে কিনা ইত্যাদি এমন কতকগুলি কথা উত্থাপন করেন যে, স্ত্রীলোকটি লজ্জিতা ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করে, এবং আর সকলের নিকট গিয়া বলে, ‘ওরূপ লোকের নিকট কি আমায় পাঠাতে আছে?’ সেখান হইতে বাহির হইয়া নরেন্দ্র পরিচিত যাহার সহিত দেখা হইল তাহাকেই বলিলেন, ‘আমি আজ মদ ও মেয়েমানুষ লইয়া আমোদ করিয়াছি।’ বাটীতে স্বীয় জননীর নিকটও ঐকথা প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ কয়েক ব্যক্তি পরমহংসদেবের কর্ণে এই কথা তুলিলে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “নরেনের জন্ত তোমাদের মাথাব্যথার দরকার নাই, আমি জানি তাহার দ্বারা জীবনে কখনও বোঝিৎসঙ্গ হইবে না।”



# PRESENTED

## পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট

এইরূপ করিবার একটা কারণ ছিল, গোপনে কোন কার্য করা চিরদিন তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন ভয় বা লজ্জায় কোন বিষয় লুকাইবার অভ্যাস তাঁহার নাই। স্মরণীয় ঈশ্বর নাই, বা থাকিলেও তাঁহাকে ডাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি থাকা না থাকাতে কাহারও কিছু আসে যায় না,—নিরাশাভারাক্রান্ত হৃদয়ে এরূপ ধরনের অভিমানসূচক কথা স্পষ্টবাক্যে লোকের নিকট প্রকাশ করিতে এখন তাঁহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হইত না। তাহার উপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত চরিত্রহীন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মিলিয়া আনন্দ-প্রমোদ করিতে থাকায় শীঘ্রই রব উঠিল তিনি নাস্তিক হইয়াছেন এবং দুঃশরিত্র লোকের সংসর্গে মত্তপান ও বেঞ্চালয়ে গমন পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। এই অবস্থা নিন্দায় তাঁহার আবাল্য-তেজস্বী হৃদয় আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, স্মরণীয় তিনি আরও ইচ্ছা করিয়া লোক দেখাইবার জন্ত সকলকে বলিতে লাগিলেন যে, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ নিজ দুর্দশা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্ত যদি কেহ মত্তপান বা বেঞ্চা-গৃহে গমন করে তাহাতে দোষই বা কি? শুধু তাহাই নহে, যদি তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন যে ঐরূপ করিলে প্রকৃতই সুখ হয়, তাহা হইলে তিনিও ঐরূপ করিতে রাজী আছেন, সেজন্ত লোকনিন্দাত্তর গ্রাহ্য করিবেন না।

স্বামীজী বলিতেন, “ঐরূপ অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে, জীবনে যেসকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল সেইসকলের কথা উজ্জলবর্ণে মনে উদ্ভিত হওয়ার ভাবিতে থাকিতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও

## স্বামী বিবেকানন্দ

নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; জীবনে যতই কেন দুঃখকষ্ট আসুক না, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐরূপ দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়া শান্তি সুদূরপরাহত হইয়া রহিল—সাংসারিক অভাবের ভ্রাস হইল না।

“গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, এখনও পূর্বের গ্রায় কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্নপদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড়পদার্থের গ্রায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্ত চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না! এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানাবর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অল্প এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর গ্রায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যেসকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেইসকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, অনন্তর বাটা ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বপ্নই বিলম্ব আছে।”

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ



## পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট

নরেন্দ্র সংসার চালাইবার জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'ফ্রী-মেনসন' হইলে যদি কোন সুবিধা হয় এই ভাবিয়া দিনকতক উহাদের দলে মিশিলেন। কয়েকমাস বিদ্যাসাগরের বহুবাজারের স্থলে শিক্ষকতা করিলেন, কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় তাহা ত্যাগ করেন। দিনকতক এটর্নি নিমাই বসুর articulated clerk (এটর্নি হইবার জন্য শিক্ষানবীশ) হইয়াছিলেন, কিন্তু টাকা জোগাড় না হওয়াতে ছাড়িয়া দেন। ফলে এটর্নির আফিসে পরিশ্রম এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জন হওয়ায় কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনরূপ কর্ম জুটিল না এবং মাতা ও ভ্রাতাদিগের ভরণ-পোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও হইয়া উঠিল না।

দিনকতক পরে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার কয়েকজন জ্ঞাতি ভদ্রাসনখানি ভাগাভাগি করিবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। ভদ্রাসনের ষে-অংশ অপেক্ষাকৃত ভাল ও অধিক পরিসর, তাঁহার সেই অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এমন অবস্থা হইল যে আদালতে না গেলে মিটে না। নরেন্দ্র প্রথম প্রথম যাহাতে গৃহের গোলযোগ প্রকাশ্য আদালতে গিয়া লোকের কর্ণে না উঠে তাহার জন্য আপসে মিটাইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু বখন তাহা হইল না তখন তিনি আহত সিংহের ত্যায় দৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (Barrister W. C. Bonarji) তাঁহার পক্ষে মকদ্দমা গ্রহণ করিলেন। মামলা অনেক দিন ধরিয়া চলিল, এই উপলক্ষে নরেন্দ্রের সাহস ও বুদ্ধিনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষের ইংরেজ ব্যারিষ্টার তাঁহাকে আদালতের সমক্ষে একজন খেয়ালী ছোকরা (fanatic) প্রতিপন্ন

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিবার মানসে 'চেলা' বলিয়া সম্বোধন করেন, কিন্তু নরেন্দ্র ঘাড়াইবার পাত্র নহেন। তিনি জানিতেন সাহেব বিদেশী লোক, সুতরাং নিজে চেলা শব্দের অর্থ অবগত নহেন। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Do you know, sir, what a chela is?' (মহাশয় চেলা কাহাকে বলে আপনি জানেন কি?) সাহেব দেখিলেন ছেলেটি বড় সোজা নয়, তিনি আরও অনেক জেরা করিলেন, কিন্তু বড় সুবিধা করিতে পারিলেন না। বিচারক নরেন্দ্রের সপ্রতিভ উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়া ও তাঁহাকে আইন ক্লাসের ছাত্র জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "Young man, you will make a very good lawyer" (যুবক, তুমি একজন ভাল উকীল হবে)। 'অপর পক্ষের এটর্নিও আদালতের বাহিরে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন, "জজ সাহেবের যা মত আমারও তাই, বাস্তবিক আইন-ব্যবসায়ই তোমার উপযুক্ত। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।" মকদ্দমাটি মিটিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় আরম্ভ হইয়া তাঁহার দেহত্যাগের পরও কিছুদিন চলিয়াছিল; ফলে বিশ্বনাথ বাবুর পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু খরচার দায়ে তাঁহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে যে দুঃখকষ্ট গিয়াছে তাহা বর্ণনাভীত। নরেন্দ্র একদিন দুঃখ সহ করিতে না পারিয়া পরমহংসদেবের কৃপা ভিক্ষা করিতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন। ছুটিতে ছুটিতে পা হইতে চটি পড়িয়া গিয়াছিল, পথের ধারের জঙ্গলে হাত পা ক্ষত-বিক্ষত কিন্তু তথাপি ভ্রক্ষেপ নাই। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া পরমহংসদেবের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "কি করি বলুন, কি করি? কোন আশা দেখছি না। আপনি মা কালীকে বলিয়া कहিয়া



## পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট

আমাদের সাংসারিক দুঃখনিবারণের একটা উপায় করিয়া দিন।” পরমহংসদেব তাঁহাকে স্বয়ং মার কাছে গিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। নরেন্দ্র প্রথমে সন্মত হইলেন না, কারণ দেবদেবীতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না, কিন্তু পরে পরমহংসদেবের পুনঃ পুনঃ আদেশে ভবতারিণী দেবীর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যাহাকে তিনি এতদিন পাষণময়ী বলিয়া ভাবিতেন তিনি পাষণময়ী নহেন, সত্যই চৈতন্যরূপিণী, অনন্তস্নেহময়ী, বরাভয়দাত্রী জগজ্জননী। তিনি দেবীর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বিবেক-বৈরাগ্য ও জ্ঞানভক্তি প্রার্থনা করিলেন, টাকা-পয়সার কথা মনেই হইল না। মাকে দর্শন করিয়া পরমহংসদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কিরে, মাকে বলিয়াছিস ত?’ তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; বলিলেন, ‘না মহাশয়, সে-কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।’ পরমহংসদেব পুনরায় তাঁহাকে কালীঘরে পাঠাইলেন, কিন্তু সেবারও ঐ প্রকার হইল। এইরূপে নরেন্দ্র সাংসারিক অভাব জানাইবার জন্ত তিন তিন বার দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু তিনবারই ধনরত্ন-প্রার্থনার পরিবর্তে বিবেক-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। শেষে পুনরায় পরমহংসদেবকে ধরিয়া বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে বলিয়াছিলেন, “যা, মার ইচ্ছায় আজ থেকে আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।”

বিশ্বনাথ বাবু ইতঃপূর্বে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ( ব্যারিষ্টার আর, মিত্রের ) কন্যার সহিত নরেন্দ্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এখন এই দুর্দশার সময়ে উক্ত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে সংসারের অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কারণ কন্যার পিতা

## স্বামী বিবেকানন্দ

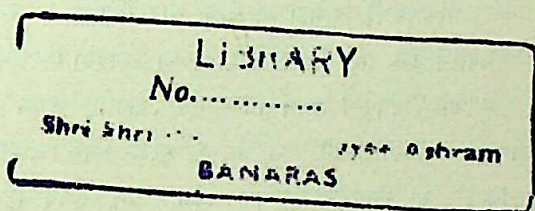
যৌতুকস্বরূপ প্রচুর অর্থ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহবিমুখ নরেন্দ্র কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি পূর্ববৎ পরিশ্রম সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন এবং এসময়ে একরূপ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিলেন। মাতা বরাবরই পুত্রের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্ধ্য লক্ষ্য করিয়া আসিতে-ছিলেন, এখন তাঁহার শঙ্কা হইল পাছে সাধুসংসর্গের প্রভাবে তিনি একেবারে সংসার ত্যাগ করেন। অনেকসময় ঐবিষয়ে কথা উত্থাপিত হইত, কিন্তু নরেন্দ্র স্পষ্ট কোন জবাব দিতেন না। তবে তাঁহার আচরণে বেশ বুঝা যাইত যে, মাতাকে তিনি দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিয়া সহসা কোথাও যাইবেন না। কিন্তু তিনি বিবাহবিষয়ে মাতৃ-অনুরোধ রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। বাটার সকলেই তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি..কোনক্রমেই নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া গৃহে বাস করিলেন। তারপর যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার উপর আর নির্ভর..না করিলেও সংসার চলিবে, তখন তিনি অল্প অল্প করিয়া সংসার ছাড়িলেন। প্রথম প্রথম অধিকাংশ সময়ই দক্ষিণেধরে কাটাইতেন, তার পর পরমহংসদেব পীড়ার নিমিত্ত কাশীপুরের বাগানে আনীত হইলে প্রায় সেখানেই থাকিতেন। ক্রমে যত তাঁহার পীড়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ততই অধিকক্ষণ তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং পরমহংসদেবের দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি দিবারাত্রের মধ্যে কখনও তাঁহার সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নাই।

সংসার ত্যাগ করিলেও নরেন্দ্র একেবারে সংসারের সহিত সকল



## পিতৃবিয়োগ ও সাংসারিক কষ্ট

সম্বন্ধ ছিল করিলেন না। যখন তিনি কলিকাতায় থাকিতেন তখন মাঝে মাঝে গৃহে যাইতেন। শত-স্মৃতি-বিজড়িত গৃহপ্রাঙ্গণটি তাঁহার নিকট তীর্থের স্থায় পবিত্র ছিল। তাহার উপর উহা তাঁহার জননী পদধূলিপুত। জননীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। ভগ্নীদেরও এত ভালবাসিতেন যে প্রব্রজ্যাকালে তাহাদের কণ্ঠে মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া শোকে অধীর হইয়াছিলেন। জননীও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। তিনি স্বামীজীর একজন শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, ‘আমার ছেলে চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিল।’ কিন্তু পরমহংসদেব আরও অধিক দূর যাইতেন। তিনি বলিতেন, ‘নরেন আত্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী,’ ‘নিত্যসিদ্ধের থাক’।



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

প্রথম দর্শন হইতে পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ছয় মাস পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তাহাকে না দেখিলে অধীর হইয়া উঠিতেন ও যাহাকে পাইতেন জিজ্ঞাসা করিতেন—কেন এমন হইতেছে? তিনি বলিতেন, ‘নরেন্দ্রের জন্ম বুকের ভিতর যেন মোচড় দিচ্ছে।’ নরেন্দ্র যে খুব উচ্চ আধার তাহা তিনি প্রথম দিন দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই অত্যাশ্চর্য্য যুবকদের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছিলেন, ‘কলকাতার মত স্থানে এমন সবুগ্নী আধারও থাকতে পারে।’ এবং তাঁহাকে পৃথক্ ডাকিয়া লইয়া গিয়া স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইয়াছিলেন। তাহাতে অশ্রু সকলে তাঁহাকে একদেশদর্শী বলিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে এত ভালবাসিতেন যে, সহজে তাঁহার কথা উড়াইয়া দিতেন না। নরেন্দ্র যখন বলিতেন ‘রূপ-টুপ আপনার মাথার খেয়াল’, তখন তিনি কাঁদিয়া মা কালীকে বলিয়াছিলেন, ‘মা, নরেন্দ্র বলে এসব আমার মাথার ভুল; সত্যি কি?’ মা তাঁহাকে বলিয়া দেন, ‘না, ওসব ঠিক—ভুল নয়; নরেন্দ্র ছেলেমানুষ তাই অমন বলে।’ তখন আবার তিনি নরেন্দ্রকে বলেন, ‘তুই যা খুশী বল না কেন, আমি গ্রাহ্য করি না।’ নরেন্দ্র প্রথম প্রথম বুদ্ধিতে পারিতেন না—তাঁহার জন্ম পরমহংসদেব অতটা করেন কেন? সেইজন্ম একদিন বলিয়াছিলেন, ‘আপনার শেষকালে না ভরত রাজার যো হয়! ভরত রাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন বলে পরজন্মে হরিণজন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।’ পরমহংসদেব



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

এ কথার কোন উত্তর দেন নাই। এক এক সময়ে তাঁহার নিজেরও মনে হইত—কেন এমন হয়? সামান্য একজন বালক, তাহার জ্ঞান তাঁহার এত চিত্তচাক্ষুণ্য হয় কেন? তিনি মার নিকট কাঁদিয়া ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, ‘তার ভেতর নারায়ণের সত্তা দেখতে পাস্ বলে এমন হয়।’ হাজরা নামে এক ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে থাকিতেন। তিনি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন, ‘তুমি দিনরাত এই সব ছোঁড়াদের ভাবনা ভাবো, ভগবানকে ভাববে কখন?’ তাহাতে পরমহংসদেব মার নিকট কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, ‘মা, হাজরা বলে নরেন্দ্রের আর এইসব ছেলেদের জ্ঞান এত ভাবি কেন?’ তাহাতে মা তাঁহাকে স্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন যে, তিনিই সব মানুষ হয়েছেন, তবে শুদ্ধ আধারে তাঁহার প্রকাশ বেশী। তিনি গল্প করিতেন, “সেই রূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙলো, হাজরার উপর রাগ করলুম। বল্লুম, ‘শালা আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল’, আবার ভাবলুম ও বেচারীরই বা কি দোষ? কেমন করে জানবে?” তিনি আরও বলিতেন, “আমি দেখি ছোকরারা যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। নরেন্দ্রকে যখন প্রথম দেখি তখন তার শরীরের হুঁশ ছিল না। যেই ছুঁলুম অমনি বাহুজ্ঞান হারালো। তারপর তাকে দেখবার জ্ঞান প্রাণের ভেতর আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হ’ত যে, মনে হ’ত বুকের ভেতরটা কে যেন গামছা-নিংড়োবার মত জোর করে নিংড়াচ্ছে। তখন আর সামলাতে পারতুম না, ছুটে বাগানের উত্তরাংশে চলে যেতুম, ঝাউতলায় যেখানে বড় একটা কেউ যায় না—সেইখানে গিয়ে চীৎকার করতাম, ‘ওরে তুই আয়রে—তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না রে!’ খানিকটা এই রকমে ডাক

## স্বামী বিবেকানন্দ

ছেড়ে কাঁদলে তবে মনটা ঠাণ্ডা হ'ত। ক্রমাগতই ছয় মাস ঐ রকম হয়েছিল। আর সব ছেলেরা যারা এখানে এসেছে তাদের কারও জ্ঞান কখন কখন মন কেমন করেছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জ্ঞান যেমন হয়েছিল তার তুলনায় সেসব কিছুই নয়। একদিন ভোলানাথকে<sup>১</sup> বললুম, 'হ্যাঁ গা, আমার এমন হচ্ছে কেন?' ভোলানাথ বললে, 'এর মানে ভারতে (মহাভারতে) আছে। সমাধিত লোকের মন যখন নীচে আসে, সম্বন্ধী লোকের সঙ্গে বিলাস করে, সম্বন্ধী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়।' এই কথা শুনে তবে আমার মনে শান্তি হয়। তবুও আবার মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখে বোলে বসে বসে কাঁদতুম।"

নরেন্দ্রের অদর্শনে তাঁহাকে এদিকে যেমন একরূপ অসহ যন্ত্রণা হইত, নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাতে আবার সেইরূপ অসীম আনন্দ উথলিয়া উঠিত। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহ মহাশয় স্বামীজীর বি, এ, পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বেকার একদিনের কথা ১৩১৭ সালের ফাল্গুনের 'উদ্বোধনে' এইরূপ লিখিয়াছেন—

"একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নরেন অনেকদিন তাঁহার নিকট না যাওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জ্ঞান রামলালের সঙ্গে কলিকাতায় নরেনের টঙে আগমন করেন। সেদিন সকালে নরেনের ঘরে ছই সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্যাল বসিয়া কখন পাঠ করিতেছেন, আবার কখন বা কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে বহির্দ্বারে 'নরেন, নরেন' শব্দ শুনা গেল। স্বর শুনিয়াই নরেন অতীব ব্যস্ত হইয়া দ্রুত নীচে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বন্ধুরাও বুকিলেন পরমহংসদেব আসিয়াছেন, তাই নরেন এত ব্যস্ত হইয়া

<sup>১</sup> দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খাজাঞ্চী।



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

তঁাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে গেলেন। বন্ধুরা দেখিলেন সিঁড়ির মধ্যস্থলেই পরম্পরের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দেখিয়াই অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, “তুই এতদিন যাস্ নি কেন? তুই এতদিন যাস্ নি কেন?” বারম্বার এই বলিতে বলিতে ঘরে আসিয়া বসিলেন। পরে আপনার গামছায় বাঁধা সন্দেশ ছিল, খুলিয়া নরেনকে ‘খা, খা’ বলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। নরেনকে দেখিতে যখন আসেন তখন কিছু না কিছু অতি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তঁাহার জন্ত বাঁধিয়া আনেন; মধ্যে মধ্যে লোকদ্বারা পাঠাইয়াও দেন। নরেন একলা খাইবার পাত্র নহেন, তাহা হইতে কতকগুলি সন্দেশ লইয়া অগ্রে তঁাহার বন্ধুদের দিয়া তবে খাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তৎপরে বলিলেন, “ওরে তোরা গান অনেকদিন শুনি নি, গান গা।” অমনি তানপুরা লইয়া তাহার কান মলিয়া সুর বাঁধিয়া নরেন্দ্র গান আরম্ভ করিলেন—

জাগ মা কুলকুণ্ডলিনি,

(তুমি) ব্রহ্মানন্দস্বরূপিনী।

(তুমি) নিত্যানন্দস্বরূপিনী,

প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার-পদ্ম-বাসিনী ॥ ইত্যাদি।

“গানও আরম্ভ হইল, শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। গানের স্তরে স্তরে মন উর্দ্ধে উঠিল, চক্ষে গলক নাই, অঙ্গে স্পন্দন নাই, মুখাবয়ব অমাব্যবী ভাব ধারণ করিল, ক্রমে মর্ম্মরমূর্ত্তির স্থায় নিস্পন্দ হইয়া নির্বিকল্পসমাধিস্থ হইলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্বে কোন মাতৃবে একরূপ ভাব দেখেন নাই। তঁাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন, বুঝি বা শরীরে সহসা কোন পীড়া হওয়ায় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তঁাহারা মহা ভীত হইলেন। দাশরথি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তঁাহার

## স্বামী বিবেকানন্দ

মুখে সেচন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ‘জল দেবার দরকার নেই, উনি অজ্ঞান হন নি—ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে এখন।’ নরেন্দ্র এইবার শ্রামাবিষয়ক গান ধরিলেন—‘একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ মা শ্রামা।’ শ্রামাবিষয়ক অনেক গান হইল, কৃষ্ণ-বিষয়ক গানও অনেক হইল। গান শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ কখনও ভাবাবিষ্ট হইতেছেন, আবার কখনও বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া গান গাহিলেন, অবশেষে গান শেষ হইলে রামকৃষ্ণ কহিলেন, ‘দক্ষিণেশ্বর যাবি? কদিন ত যাস্ নি, চন্ না—আবার এখনি ফিরে আসিস্।’ নরেন্দ্র তখনই সম্মত হইলেন। পুস্তকাদি যেমন অবস্থায় পড়িয়াছিল তেমনই পড়িয়া রহিল, কেবলমাত্র তানপুরাটি যত্নপূর্বক তুলিয়া রাখিয়া গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন, বন্ধুরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।”

নরেন্দ্রের উপর পরমহংসদেবের ভালবাসা কত গভীর ছিল ও কিরূপ স্নেহচক্ষে তিনি তাঁহাকে দেখিতেন সামান্য লেখনী দ্বারা তাহা বর্ণনা করা যায় না। যেসময় নরেন্দ্র পরিবারবর্গের অঙ্গ-সংস্থানের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তাযুক্ত, তখন তাঁহার মনে হইল যে, সাধারণ লোকের দ্বারা অর্থার্জন করিয়া পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্তই তাঁহার জন্ম হয় নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি গৃহত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। যাইবার সমস্তই ঠিক, এমন সময় পরমহংসদেব একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে জনৈক ভক্তের বাটীতে কলিকাতায় আগমন করিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, ভালই হইল, গুরু দর্শন করিয়া এইবার চিরদিনের মত গৃহত্যাগ



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

3/406

করিবেন। এই মানসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পরমহংসদেব তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে বাইবার জন্ত ধরিয়া বলিলেন। নরেন্দ্র নানা ওজস্ব-আপত্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। অগত্যা ঠাকুরের প্রত্যাগমনকালে তাঁহার সহিত গাড়ীতে উঠিলেন, তখন আর কোন কথাবার্তা হইল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া পরমহংসদেব সমাগত ভক্তবৃন্দের সহিত গৃহমধ্যে উপবেশন করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া নরেন্দ্রের নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া সাক্ষরেন্দ্রে গাহিতে লাগিলেন—

‘কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই, (আমার) মনে সন্দ হর বুঝি তোমায় হারাই হা—রাই।’ নরেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অন্তরের রুদ্ধ ভাবরাশি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, ঠাকুরের ত্রায় তাঁহারও বক্ষ নয়নজলে ভাসিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, ঠাকুর নিশ্চয়ই সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ আচরণে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইবার পর কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, ‘আমাদের ও একটা হয়ে গেল।’ সেই দিন রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে ঠাকুর তাঁহাকে ডাকিয়া ‘জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্ত এসেছ, সংসারে কখনও থাকতে পারবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্ত থাক’—এই বলিয়া হৃদয়ের আবেগে পুনরায় অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন।

প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি ও তাহার স্মৃতি কত মধুর তাহা উপরিলিখিত ঘটনা হইতে পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। যে ভালবাসায় ভেদাভেদ থাকে না, যাহা পরকে আপন করিয়া লয়, যে ভালবাসা বিশ্বশ্রেয়ের নামান্তর মাত্র, এই চিত্রে পাঠক তাহারই আভাস পাইবেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজী বলিতেন, 'ঠাকুরের এই ভালবাসাই আমাকে চিরকালের নত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে—একা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন—সংসারের অত্ন সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্ত ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে।'

পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, 'খুব উঁচু ঘর, পুরুষের সত্তা; এত ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই।' ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় তিনি নরেন্দ্রকে কত বড় আধার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সকলেরই ভিতরের অবস্থা উত্তমরূপে জানিতেন এবং সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'কেশবের যদি একটা বড় শক্তি থাকে, নরেন্দ্রের সেরকম আঠারোটা শক্তি আছে।' আর একবার বলিয়াছিলেন, 'দেখলুম যেন কেশবের ভিতর একটা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে, আর নরেন্দ্রের মধ্যে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাচ্ছে।' অত্যাশ্চর্য্য শিষ্যের নিকট হইতে তিনি সেবা গ্রহণ করিতেন—কেহ তাঁহাকে বাতাস করিত, কেহ পা টিপিয়া দিত, কিন্তু নরেন্দ্রকে তিনি কখনও সেবা করিতে দিতেন না। বোধ হয় তাঁহাকে নারায়ণ জ্ঞান করিতেন বলিয়াই ঐরূপ করিতেন। নরেন্দ্র তাঁহাকে সেবা করিবার জন্ত সময়ে সময়ে ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু তিনি বলিতেন, 'তোমার পথ আলাদা।'

পরমহংসদেব যে নরেন্দ্রকে অতিশয় উচ্চ আধার বলিয়া মনে করিতেন, একথা তিনি নরেন্দ্রের সম্মুখে এবং তাঁহার অসাক্ষাতে অত্যাশ্চর্য্য ভক্তদের নিকটও বহুবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় বলিতেন—'ও খাপ-খোলা তলোয়ার', 'পুরুষের ভাব ওর ভেতর', 'ও অখণ্ডের (নিরাকারের) ঘর', 'সপ্তর্ষির' একজন', 'নর-নারায়ণ ঋষির নর' ইত্যাদি ইত্যাদি।

১ এই সপ্তর্ষি পুরাণোক্ত মরীচি, অত্রি প্রভৃতি নহেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিপথে জ্যোতির্গয়রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিয়াছিলেন, অখণ্ডের রাজ্যে



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

এতদ্ব্যতীত সাধারণ গুণের অস্তিত্ব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তাঁহার নিকট যে-কেহ যাইতেন প্রায় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি নরেন্দ্রকে জানেন কিনা, পরক্ষণেই বলিতেন, ‘খুব ছেলে, গাইতে বাজাতে, লেখায় পড়ায়, সব দিকে আছে; বেদিকে যাবে একটা কাণ্ড করে তুলবে’ ইত্যাদি।

নরেন্দ্র কিন্তু তাঁহাকে প্রথম প্রথম অনেকটা অর্দোআদ বা বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া মনে করিতেন, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এরূপ মনে করা সত্ত্বেও তাঁহার অলোকসামান্য চরিত্র, অদ্ভুত ঈশ্বরপ্রেম ও তত্ত্বজ্ঞান দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাষিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি নিজে তখন কালী, রাধা প্রভৃতি দেবদেবী কিছু মানিতেন না, আবার অদ্বৈততত্ত্বও সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না। আমরা শুনিয়াছি একদিন তিনি “সবই ব্রহ্ম”—এই কথা শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, “ই্যা—তাও কি কখন হয়? তা হলে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম।” কিন্তু অত্র লোকের কথার সহিত পরমহংসদেবের কথার এই পার্থক্য ছিল যে, অস্ত্রে শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া ধর্মের কথা বলে, পরমহংসদেবের পুণ্ড্রিগত বিজ্ঞা মোটেই ছিল না, সমস্তই সাধনলব্ধ জ্ঞান। সুতরাং তিনি যে-কথা বলিতেন, তাহার মধ্যে খুব একটা জোর আছে বুঝিতে পারা যাইত। তা ছাড়া পরমহংসদেব গুরু বিচার অপেক্ষা বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত বিচার ও প্রেমভক্তিকে ঈশ্বরলাভের পক্ষে অধিকতর অনুকূল বলিয়া প্রকাশ করিতেন। নরেন্দ্রকেও তিনি ক্রমশঃ এই পথে পরিচালিত

‘দিব্য-জ্যোতিঃঘন-ভনু সাত জন প্রবীণ ঋষি সমাধিস্থ হইয়া আছেন’ এবং নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাঁহাদেরই একজন বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতীর্ণ বুঝিয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—৫ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়ে এই বিষয় সবিস্তার লিপিবদ্ধ আছে।)

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তিনি কামিনীকান্ধনত্যাগী মহা-  
 শুদ্ধ-সত্ত্ব আধার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাই বলিতেন, “এ নিত্যসিদ্ধের  
 থাক।” আরও বলিতেন, “এ বেদিন নিজেকে জানতে পারবে সেদিন  
 আর দেহ রাখবে না।” নরেন্দ্রের মায়াবাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ দৃঢ়  
 বিশ্বাস ছিল যে, কিঞ্চিৎ মায়ার প্রভাব না থাকিলে পাছে তিনি জগতের  
 কোন কার্যে প্রবৃত্ত না হইয়া একেবারে স্ব-স্বরূপে প্রমাণ করেন, এই  
 ভয়ে তিনি মহামায়ার নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতেন—“মা, গুরু  
 ভেতর একটু মায়া প্রবেশ করিয়ে দে, নতুবা কোন কাজ হবে না।”  
 এইরূপ উত্তম অধিকারী প্রাপ্ত হইয়া পরমহংসদেবের আনন্দের সীমা ছিল  
 না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ইহারই সাহায্যে আবার সনাতন ধর্মের  
 পুনরুদ্বোধ হইবে। তাই তিনি সমস্ত ধীরে ধীরে নরেন্দ্রের ভ্রান্ত সংস্কার-  
 গুলির উচ্ছেদসাধন করিতেছিলেন। যে নরেন্দ্র প্রথমে কিছুই মানিতেন  
 না, ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন, তিনি ক্রমে সবই মানিতে আরম্ভ করিলেন,  
 কিন্তু প্রতিপদে পরমহংসদেবকে বাজাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার কোন  
 কথা বা উপদেশ বিনা প্রমাণে সত্য বলিয়া মানিয়া লন নাই। প্রথমে  
 তাঁহার প্রত্যেক কথায় সন্দিহান হইয়া পরীক্ষা করিতেন, তারপর পুনঃ  
 পুনঃ তাহাদের সত্যতার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাইয়া শেষে ওরূপ অভ্যাগ  
 অনেকটা ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি একেবারে ত্যাগ করিতে  
 পারেন নাই। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলাম।  
 অনেকসময় পরমহংসদেব যাহার-তাহার হাতে জল খাইতেন না, বা  
 যাহার-তাহার স্পৃষ্ট খাদ্যাদি গ্রহণ করিতেন না। নরেন্দ্র মনে করিতেন উহা  
 কুসংস্কার মাত্র, কিন্তু পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,  
 ঐ লোকগুলি বিশুদ্ধচিত্ত নহে। প্রথমে একথা নরেন্দ্রের তত বিশ্বাস



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

হয় নাই; পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন, বাস্তবিকই লোকগুলো অতি হীনচরিত্রের !

ভদ্রবেশী সাধারণ লোকদিগের অতি গোপনতম পাপ বা নিন্দনীয় আচরণও যে পরমহংসদেবের স্বপ্ন দৃষ্টির অগোচর ছিল না, তাহা উপরোক্ত ব্যাপার হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু নরেন্দ্রের স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার উপর এই স্বপ্নদর্শী মহাপুরুষের একরূপ অটল বিশ্বাস ছিল যে, তিনি প্রায় বলিতেন, “ও হচ্ছে আশুন, ওর স্পর্শে পাপ-তাপ সব পুড়ে থাক্ হয়। ও যদি শোর-গরুও খায় কোন দোষ হবে না।” ইহা দ্বারা বোধ হয় তিনি নরেন্দ্রকে জীবন্ত মহাপুরুষের পর্যায়ে ফেলিতেন।’

এদিকে নরেন্দ্র সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা, কিন্তু তাঁহার ভুল-ভ্রান্তি দেখিলে তিনি কখনও তাহার সমর্থন করিতেন না।

১ ভগবদ্ভক্তির হানি হইবে বলিয়া পরমহংসদেব স্বয়ং নানা নিয়ম পালনপূর্বক ভক্তসকলকে তদ্রূপ করিতে সর্বদা উপদেশ দিতেন; তিনিই আবার বলিতেন—‘নরেন্দ্র এসকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহার কোন প্রত্যাবার্ত্ত হইবে না। নরেন্দ্রের ভিতর জ্ঞানায়ি সর্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া সর্বপ্রকার আহাৰ্য্যদোষকে ভক্ষীভূত করিয়া দিতেছে, সেজন্ত যেখানে-সেখানে যা-তা ভোজন করিলেও তাহার মন কখন কলুষিত হইবে না—জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা সে সর্বদা মায়ার সমস্ত বন্ধনকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছে, মহামায়া সেজন্ত তাহাকে কোনমতে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছেন না’—এইরূপ কত কথাই তিনি তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মাড়ওয়ারী ভক্তেরা পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিয়া সর্বদা নানাপ্রকার প্রাণদ্রব্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করিত। তিনি বলিতেন, ‘ওরা নিকামভাবে দান করিতে জানে না, এক খিলি পান দিবার সময়ও ঘোলটা কামনা করে দেয়, এইরূপ দ্রব্য ভোজনে ভক্তির হানি হয়’; কিন্তু তাহাদের প্রদত্ত এসকল দ্রব্য নরেন্দ্রকে খাইতে দিতেন ও বলিতেন, ‘ওতে ওর কোন হানি হবে না, ও সব হজম করে ফেলবে।’

## স্বামী বিবেকানন্দ

নরেন্দ্র একবার পরমহংসদেবের নিকট ভক্তের ভগবদ্-বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া নির্দেশ করায় তিনি তত্ত্বতরে বলেন—“বিশ্বাসের আবার অন্ধ কি করে? বিশ্বাসমাত্রেই ত অন্ধ! বিশ্বাসের কি আবার চোখ আছে নাকি? হয় বল শুধু ‘বিশ্বাস’, না হয় বল ‘জ্ঞান’। তা না হয়ে আবার ‘অন্ধবিশ্বাস’, ‘চোখওয়ালাবিশ্বাস’—এ কি রকম!”

নরেন্দ্র ক্রমশঃ বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, বই পড়িয়া বা পরের মুখে শুনিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা ধর্ম্য নহে। প্রকৃত ধর্ম্য অনুভূতিসাপেক্ষ। ঈশ্বরকে দর্শন করা চাই, তাই তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন কিনা। কারণ যদিও তিনি তৎপূর্বে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে একজন ধর্মোন্মাদ ব্যতীত আর বিশেষ কিছু মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এবং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবপ্রমুখ আচার্য্যগণ তখন বাঙ্গলার নব্য যুবকগণের নেতা। নরেন্দ্র নিজেও ব্রাহ্মধর্মের ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন, দেবদেবী কিছুই মানিতেন না। কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতে করিতে যখন তাঁহার ধারণা হইল যে, ঈশ্বর অনুভূতির গোচর, অথচ সেই ঈশ্বরানুভূতি সম্বন্ধে মহর্ষির নিকট হইতে কোনপ্রকার আভাস প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় ছাড়িয়া পরমহংসদেবের চরণাশ্রয় করিলেন এবং ধ্যানধারণা, তপস্বী, বিবেক-বৈরাগ্য, ও বিচারসহায়তায়, সর্বোপরি অবতারকল্প সঙ্গুপ্তর কৃপায় ধর্ম্য ও ঈশ্বর লাভ করিলেন। পরমহংসদেবের শিক্ষায় ও তাঁহার জীবনদৃষ্টে তিনি শেষে সাকার নিরাকার দুই-ই মানিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মও মানিতেন, আবার কালী, কৃষ্ণ, শিবও মানিতেন। এ বড় অদ্ভুত পরিবর্তন! কিন্তু ইহা বিষম সংগ্রামের ফলে



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

সাধিত হইয়াছিল। এ সংগ্রামে দাঁড়াইয়াছিলেন—একদিকে মুর্ত্তিমান সনাতন-ধর্ম, অপরদিকে প্রত্যক্ষবাদী পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমानी নব্যতন্ত্র; এ দুয়ের সংঘর্ষে পরিশেষে কিন্তু সনাতনধর্মেরই জয় হইল।

পরমহংসদেবের মহিমময় চরিত্রে যুবক নরেন্দ্র এতদূর মোহিত হইলেন যে, পিতার মৃত্যুর পর সংসারের অনন্ত দুর্দশা, জননী ও ভাইভগিনীগুলির বিবাদকরণ মুখচ্ছবি, অনশন অর্দ্ধাশন কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া দক্ষিণেঘরে ছুটিলেন। দারুণ দুঃখে হৃদয় অর্জর, তথাপি যেন হৃদয়ের মধ্যে কাহার ডাক শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব তাঁহাকে কালীঘরে গিয়া প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি ধনরত্নাদি প্রার্থনা না করিয়া তিন তিন বার শুধু জ্ঞান-ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

পূর্বে বলিয়াছি প্রথম প্রথম তিনি অদ্বৈতবাদ বুঝিতে পারিতেন না। ‘আমিই ব্রহ্মস্বরূপ’—এরূপ মনে করা কি বোর অপরাধ ও স্পর্দ্ধা নয়? কিন্তু পরমহংসদেব তাঁহাকে কেবল অদ্বৈত-প্রতিপাদক শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে উপদেশ দিতেন। অস্ত্রান্ত্র শিষ্যদিগকে তিনি সাধারণতঃ ভক্তিশাস্ত্রই পাঠ করিতে বলিতেন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষভাবে অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি অদ্বৈতমূলক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বলিয়াছিলেন, এবং তিনিও প্রথম প্রথম ঐসকল গ্রন্থ স্বয়ং পাঠে অনিচ্ছুক থাকিলেও পরমহংসদেবের কথায় তাঁহার সম্মুখে পাঠ করিয়াছিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে জ্ঞান পরিস্ফুট হইলে তিনি বুঝিলেন, অদ্বৈততত্ত্বই চরম ও পরম সত্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন বেদান্তাদি শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ। ১৮৮৫ সালে কাশীপুরের বাগানে পরমহংসদেবের পীড়ার সময় নরেন্দ্র এই সত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই অনেকটা দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। শেষে এমন

## স্বামী বিবেকানন্দ

হইয়াছিল যে, তিনি খোল-করতাল লইয়া সঙ্কীৰ্ত্তন করিতেন ও হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতেন। কাশীপুরের বাগানে থাকিতে নরেন্দ্র সত্য-লাভের জন্ত বিষম উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য, মনে দারুণ অশান্তি। তিনি দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী ও বিষ্ণুতরুমূলে সাধন করিবার জন্ত পরমহংসদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন; পরমহংসদেব সহর্ষে বলিলেন, “পড়াশুনো কি ছেড়ে দিবি নাকি?” নরেন্দ্র উত্তর করিলেন, “মশায়, যদি এমন একটা ওষুধ পাই যা খেলে এ পর্য্যন্ত যা কিছু শিখেছি সব ভুলে যেতে পারি, তাহলে প্রাণটা যেন বাঁচে।” এইসময়ে তিনি প্রায় প্রত্যহ রাত্রে কাশীপুরের বাগান হইতে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গিয়া পঞ্চবটীতে ও বিষ্ণুতরুতলে ধূনি জ্বালাইয়া সাধনা করিতেন। অনেকসময় ধ্যান করিতে করিতে ললাটের অভ্যন্তরে একটা ত্রিকোণাকার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেন। উহাকে পরমহংসদেব ব্রহ্মবোনি বলিয়া নির্দেশ করিতেন। অনেক সময় আবার দেখিতেন ধূনির ধারে নানা দেবদেবীর সমাগম হইয়াছে। ঐরূপ সাধনের ফলে ক্রমশঃ তাঁহার মানসিক অশান্তি ও সন্দেহ অন্তর্হিত হইয়াছিল এবং কিছু শক্তিও লাভ হইয়াছিল। কালী (অভেদানন্দ) নামক একজন গুরুদ্বাতাকে একদিন তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিতে বলেন, তিনি ঐরূপ করায় যেন একটা বৈজ্ঞাতিক তেজের জ্বাল কি অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুজ্ঞান হারাষ্টয়া অন্তঃস্থখে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের নিকট অনেক ভক্ত যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক কথার বখাষ মর্ম্ম গ্রহণে নরেন্দ্রের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। একদিন তিনি বৈষ্ণব-মতের সার মর্ম্ম বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, “তিনটি বিষয় পালন করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায়—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন। যেই নাম সেই



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

ঈশ্বর—নাম ও নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অমুরাগের সহিত নাম করিবে। সেইরূপ ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্ত-দিগকে শ্রদ্ধা ও পূজা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার—এ কথা ধারণা করিয়া সর্বজীবের দয়া—” এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিম্বৎক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহু অবস্থায় আসিয়া বলিতে লাগিলেন—“জীবের দয়া!—দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া কববার তুই কে? না, না, জীবের দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!”

‘লীলাপ্রমদ’কার বলেন, “ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া বাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্থ কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিত পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথার দেখিতে পাইলাম! শুদ্ধ, কঠোর ও নিশ্চয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এককাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎসংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপর ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে সে সকলই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই

## স্বামী বিবেকানন্দ

কথা সর্বোপায়ে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল যে, ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছে। জীবনের প্রতি যুহুর্ন্তে সে বাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, বাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, বাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—সবই তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, ঘৃণা, দম্ব অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে অল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিবে।

“এই বলিয়া দেখাইলেন, ঠাকুরের ঐ কথায় শুধু জ্ঞানমার্গ নহে, ভক্তি, কর্ম, রাজযোগাদি সকল মার্গের লোকই বিশেষ আলোক পাবেন।”

নরেন্দ্রের সহিত সাংসারের কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর পরে পরমহংস-দেবের গলাভ্যন্তরে ক্যানসার (কর্কট রোগ) নামক ক্ষত হয় ও তন্নিবন্ধন তিনি চিকিৎসার্থ প্রথমে কলিকাতা শ্রামপুকুর ষ্ট্রীটে ও তাহার কিছুদিন পর কাশীপুরের বাগানে আনীত হন। ইহার প্রায় আট মাসকাল পরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। শেষের এই কয় মাস গৃহস্থ ভক্তগণ সর্বদা তাঁহার চিকিৎসাদি ব্যাপারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন এবং শরী প্রভৃতি কয়েকজন যুবকভক্ত প্রাণপণে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্ত সতত তৎসান্নিধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। নরেন্দ্রই এই যুবক সেবকগণের অগ্রণী ছিলেন। এই সময়েই কলিকাতার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবার্গ পরমহংসদেবকে বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং কঠিন ও ক্লেশকর পীড়াসত্ত্বেও পরমহংসদেব সতত তাঁহাদিগকে ধর্মবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এমন কি এক্ষণে সময়ে সময়ে তাঁহার ব্যাধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

হইত ; চিকিৎসকগণের পুনঃ পুনঃ নিবেদন সত্ত্বেও তিনি স্বগৎ-কল্যাণ-সাধনে বিরত থাকিতে পারিতেন না ।

নরেন্দ্রাদি যুবক ভক্তগণের ভিতর বৈরাগ্য, নিরভিমানিত্ব প্রভৃতি জাগাইয়া তুলিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে সমীপস্থ গ্রামে ভিক্ষা করিয়া মাধুকরী করিতে আদেশ করিতেন এবং তাঁহারা ঐরূপ করিলে তিনি বিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিতেন । এইসময়ে একদিন পরমহংসদেব তাঁহাদের ডাকিয়া ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাঁহারাও তাঁহার বাক্যে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভিক্ষাপাত্র হস্তে পরস্পর মধ্যে বহির্গত হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন স্বহস্তে পাক করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন । এইকালে তিনি একদিন যুবক ভক্তদের বাহারা সেবার জন্য সর্বদা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেন তাঁহাদিগকে গেকুরা প্রদান করিয়া সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন ও তদবধি তাঁহাদের যেখানে-সেখানে আহাতি করিলেও কোন দোষ স্পর্শাবে না বলিয়া দেন ।

রামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের কয়েক দিবস পূর্বে, তাঁহার শিষ্যেরা একদিকে যেমন তাঁহাকে পাছে হারাইতে হয় মনে করিয়া ত্রুণের সাগরে ডাসিতেছিলেন, অতীতকালে তেমনি ধ্যান-ধারণা ও তপস্বাদিতে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আনন্দরসে মগ্ন হইতেছিলেন । নরেন্দ্র মাঝে মাঝে পরমহংসদেবের যন্ত্রণানিবারণের কোন উপায় করিতে না পারিয়া নিতান্ত হতাশভাবে ছুটাছুটি করিতেন । একদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে করিয়াই হউক পরমহংসদেবের যন্ত্রণানিবারণে সমর্থ একজনকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং সন্ধ্যার পর হইতেই 'রাম', 'রাম', শব্দ করিতে করিতে উন্নতের ত্রায় বাগানের চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন । তখন প্রবল মানসিক আবেগে তাঁহার বাহুজ্ঞান অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছিল;

## স্বামী বিবেকানন্দ

কিন্তু ভিতরে দারুণ অশান্তির আগুন জ্বলিতেছিল। তিনি সমস্ত রাত্রি ঐরূপ করিয়া বেড়াইলেন এবং যতই রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। রজনীর শেষ যামে রামকৃষ্ণদেব তাঁহার উক্তবিধ চীৎকারধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, কাহারও সাধ্য নাই আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখা, সেইজন্য একজনকে বলিলেন, “বা, নরেনকে শীঘ্র ডেকে নিয়ে আয়।” কিন্তু নরেন্দ্রকে কেহই থামাইতে পারিল না। তখন সকলে তাঁহাকে একপ্রকার জোর করিয়া ধরিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তিনি স্নেহাৰ্জস্বরে বলিলেন, “হ্যাঁরে, তুই ওরকম কচ্চিস্ কেন? ওতে কি হবে?” কিঞ্চিৎ পরে পুনরায় বলিলেন, “আচ্ছ, তুই এখন যেমন কচ্চিস্, এমনি বারটা বছর (আমার) মাথার উপর দিয়ে ঝড়ের মতন বয়ে গেছে। তুই আর এক রাত্তিরে কি করবি বাবা!”

কাশীপুরের বাগানটি ক্রমশঃ একাধারে তীর্থ ও শিক্ষাক্ষেত্র হইয়া উঠিল। নিত্য মহা মহা পণ্ডিত ও ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল এবং দর্শনাদি শাস্ত্রবিষয়ে তুফুল তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। সঙ্গীত, কীর্তন ও স্তোত্রাদিরও অভাব ছিল না। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে বলিতেন, “মশায়, এমন একটা ওষুধ দিন, যাতে আমার মনের ব্যারামগুলো যায়!” পরমহংসদেব তখন হয় তাঁহাকে গান গাহিতে বলিতেন, অথবা বলিতেন, “বা, ধ্যান করগে”; এবং ঐসকল ধ্যানকালে নরেন্দ্রের বহুবিধ বিচিত্র অমুভূতি হইত। ইহার কিছুদিন পূর্বে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিয়া ছিলেন, “আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে।” তাহাতে নরেন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন, “হাজার লোক ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্যি বলে না বোধ হয় ততক্ষণ কিছুই বলব না।” পরমহংসদেব তাঁহার বিশ্বাসের



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

দৃঢ়তা ও মুক্তকণ্ঠে নিঃসন্দেহে তাহা ব্যক্ত করিবার সাহস দেখিয়া প্রীতই হইয়াছিলেন। নরেন্দ্র এমন কি একথাও বলিয়াছিলেন, “আমি ঈশ্বরও চাই না। আমি চাই শান্তি,—সত্যম্ জ্ঞানমনস্তম্।”

এইকালে সাধনপ্রভাবে নরেন্দ্রের এক অদ্বুত রকমের দর্শন হইত। ধ্যানাবস্থার পরে দেখিতেন, যেন ঠিক তাঁহারই মত আর একজন কে আসিয়াছে। আকার-প্রকার ও অবয়বাদির গঠন অবিকল তাঁহারই মত। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন, “এ আবার কে?” সে মুষ্টিটি অনেক সময়ে এক ঘণ্টারও উপর তাঁহার নিকট থাকিত। তিনি তাহার সহিত কথাবার্তা করিতেন, সেও ঠিক সেই সময়ে কথা বলিত। তিনি বেরূপ করিতেন, সেও ঠিক সেইরূপ করিত, তিনি কখনও তাহাকে ভেঙেচাইতেন, সেও ঠিক সেইরূপ করিত। প্রথম প্রথম এইরূপ হইলে তিনি পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন। পরমহংসদেব বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, “ইহা ধ্যানের উচ্চাবস্থার লক্ষণ।”

১৮৮৬ সালে এপ্রিল মাসের প্রারম্ভে কালীপুরের বাগানে অবস্থান-কালে নরেন্দ্র একদিন তারক ও কালীকে (শিবানন্দ ও অভেদানন্দ) সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়াদর্শনে গমন করেন। ‘ললিতবিস্তর’ ও ‘ত্রিপিটক’-পাঠে ভগবান বুদ্ধদেবের অসাধারণ ত্যাগ ও বৈরাগ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সাধনস্থল দেখিবার জন্ত নরেন্দ্রের মনে প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল; বুদ্ধগয়াবাত্রা তাহারই ফল। গয়ায় পৌছিয়া ফল্লভূতে স্নান ও ভিক্ষাদি করিয়া তাঁহারা পদব্রজে বোধগয়ায় গেলেন ও সেখানকার মোহন্ত মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোহন্তজী তাঁহাদের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা বুদ্ধগয়ায় প্রত্যেক স্থল বিশেষ অভিনিবেশসহকারে দর্শন করিলেন। সেই

## স্বামী বিবেকানন্দ

শত শত বৎসরের অতীত কীর্ত্তিধামের প্রতিরেণু একদিন ভগবান তথাগতের চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল—স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রের হৃদয় ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি গুরুভাইদের সঙ্গে বোধিবৃক্ষতলস্থ প্রস্তর-বেদিতে বসিয়া ধ্যান আরম্ভ করিলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চতুর্দিকে গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধতার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। ধ্যান করিতে করিতে নরেন্দ্র সহসা দরবিগলিতাশ্রু হইয়া সমীপবর্তী গুরুভ্রাতার কণ্ঠে হস্তার্পণপূর্বক অতি প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। গুরুভ্রাতা তাঁহার অবস্থি ভাবদর্শনে চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিলেন, নরেন্দ্র আবার গভীর ধ্যানমগ্ন হইলেন। তিনি কেন যে ঐরূপ করিয়াছিলেন, সে রহস্য ভেদ করিবার আর উপায় নাই। খুব সম্ভবতঃ ধ্যানযোগে তথাগতের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া যেন তাঁহারই চরণালিঙ্গন করিতেছেন, এই ভাবিয়া সম্মুখে তিনি বাহা পাইয়াছিলেন তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

বাত্রাকালে তাঁহারা পরমহংসদেব বা আর কাহাকেও কিছু বলিয়া যান নাই, স্মৃতরাং তাঁহাদের অকস্মাৎ অদর্শনে সকলেই বিচলিত হইয়া ছিলেন। গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে তখন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। একে অপরকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। তাহার উপর নরেন্দ্র সকলেরই নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। সেই নরেন্দ্রের এইরূপ অদর্শনে তাঁহারা কি হইল কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং সকলে মিলিয়া পরমহংসদেবের কানে একথা তুলিলেন। তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু মৃদুহাস্য করিলেন। তারপর বলিলেন, “সে কোথায়ও যাবে না, তাকে এখানে আসতেই হবে।” এই বলিয়া নিম্ন লিখিত গল্পটি বলিলেন,—“দেখ, একটা ময়ূর একজনের বাগানে রোজ



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

আসত, সে লোকটা খাবারের সঙ্গে একটু আফিণ্ড মিশিয়ে ময়ূরটাকে রোজ খেতে দিত। দিনকতক পরে ময়ূরটার এমনি অভ্যাস হয়ে গেল যে, বাগানে না এসে আর থাকতে পারত না। নরেনেরও জানবি সেই অবস্থা। এদিক-ওদিক যাচ্ছে বটে কিন্তু এখানে যে রস পেয়েছে সে রস ছেড়ে যাবে কোথায়?”

কিন্তু তিন দিন অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন নরেন্দ্রাদি ফিরিলেন না, তখন তাঁহারা উদ্বিগ্নচিত্তে নরেন্দ্র বাহাতে ফিরিয়া আইসে তাহার উপায় করিবার জ্ঞাত পরমহংসদেবকে ধরিয়া বসিলেন। পরমহংসদেব তাহাতে মাটিতে একটি দাগ কাটিয়া বলিয়াছিলেন, “এর বেশী আর তাদের যাবার ক্ষমতা নেই।” এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই নরেন্দ্রাদি প্রত্যাগমন করিলেন। বুদ্ধগয়ায় তাঁহারা তিন দিবস রহিলেন। নরেন্দ্রের আরও অধিক দূর ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁহার সঙ্গিদের পরমহংসদেবের সংবাদ না পাইয়া কাতর হইয়া পড়ায় তিনি অগত্যা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। গুরুভ্রাতারা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হইলেন ও নৃত্যগীতবান্ধ করিয়া আনন্দের হাট বসাইলেন।

কাশীপুরের বাগানে থাকিতে নরেন্দ্র পরমহংসদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ নির্বিকল্পসমাধি-অবস্থা-প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব উত্তর দিয়াছিলেন, “আমি ভাল হলে তুমি যা চাইবি, দেব।” তাহাতে নরেন্দ্র একদিন বলেন, “কিন্তু আপনি যদি আর ভাল না হন, তা হলে আমার কি হবে?” পরমহংসদেব অশ্রমসঙ্ক ও কতকটা স্বগতভাবে বলিয়াছিলেন, “শালা বলে কি?” বোধ হয় তিনি প্রাণতুল্য প্রিয় শিষ্যের অমূলক আশঙ্কা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন নরেন্দ্রের জ্ঞান উপযুক্ত শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি কোনও গুরুর বিত্তমানতা

## স্বামী বিবেকানন্দ

বা অবিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে না। যাহা হউক, তারপর তিনি ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা, তুই কি চান্ বল্।” নরেন্দ্র বলিলেন, “আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ-ছয় দিন ক্রমাগত সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু শরীররক্ষার জন্ত খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে বাই।” শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, “ছি-ছি! তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চান্? এ তো তুচ্ছ, অতি হীন কথা। নারে, অত ছোট নজর করিস্ নি। আমি বাপু সব ভালবাসি। মাছ খাব তো ভাজাও খাব, সিদ্ধও খাব, বোলেও খাব, অম্বলেও খাব। তাঁকে সমাধি-অবস্থায় নিঃশুণভাবেও উপলব্ধি করি, আবার নানা মূর্তির ভিতর ঐহিক সম্বন্ধবোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর। একাধারে জানী আর ভক্ত হুই হ।”

উপরোক্ত তিরস্কারসূচক বাক্যে নরেন্দ্রের চক্ষু হইতে অঙ্গশ্র বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি পরমহংসদেবের মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিলেন যে পরমহংসদেব তাঁহাকে সমাধিলাভ করিতে নিষেধ বা নিরুৎসাহ করিতেছেন না, কিন্তু সেই অবস্থানলাভই তাঁহার জ্ঞান ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে, ইহাই বলিতেছেন। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যে কোটি কোটি জীব ঘোর অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে তাহাদেরও উপায় করা তাঁহার অন্ততম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাধারণ লোকেরাই আপন মুক্তির প্রয়াসী হয়, কিন্তু নরেন্দ্রের জ্ঞান অসাধারণ পুরুষের পক্ষে (যাহাকে তিনি নিত্যসিদ্ধ বা আচার্য্যকোটর থাক বলিয়া উল্লেখ করিতেন) ঐরূপ মুক্তির



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

প্রয়াসী হওয়া বিশেষ শ্লাঘনীয় নহে। রামপুত্র কি মুটে মজুরের ছাত্র দুই-চারি টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে শোভা পায় ?

ঘটনাক্রমে কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পর নরেন্দ্র নির্বিকল্পভূমিতে আরোহণ করিলেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, শিথেরা অনেকেই ধ্যানে বসিয়াছেন, কেহ কেহ রামকৃষ্ণদেবের পরিচর্যায় নিযুক্ত, কেহ বা দূরে বাগানের এক কোণে নিম্নস্বরে ভগবৎ-সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। নরেন্দ্র ও গোপালদা নামে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক একজন এক গৃহে ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়াছেন। সহসা একটা কাতর চীৎকারশব্দে গোপালদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ণে গেল যেন নরেন্দ্র বলিতেছেন—“গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল ?” গোপালদা ভ্রম্ভে দৌড়াইয়া গিয়া নরেন্দ্রের শরীরের স্থানে স্থানে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, “কেন নরেন, এই যে !” কিন্তু নরেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, তাঁহার মস্তকটি মাত্র আছে আর কিছুই নাই। গোপালদা তো কিছু বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আর সকলকে সাহায্যার্থ ডাকিতে লাগিলেন। সকলে দৌড়াইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে তিনি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারাও কেহ কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন উপরের ঘরে পরমহংস-দেবকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি শয়ন করিয়াছিলেন। ঘটনাটি শুনিয়া ঈষৎ ভ্রম্ভঙ্গীমহকারে বলিলেন, “বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ ঐরকম হয়ে। ওরই জন্ত যে আমার জ্বালাতন করে তুলেছিল !”

রাত্রি এক প্রহর এইভাবে কাটিয়া গেলে নরেন্দ্র ক্রমশঃ সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপরে গেলেন, তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হন নাই। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিবার সময় চরণদ্বয় চলিতেছে কিনা বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

## স্বামী বিবেকানন্দ

পরমহংসদেব তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলিলেন, “কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলবো।” তারপর তিনি তাঁহাকে শরীরের প্রতি অবহেলা করার জন্ত ভৎসনা করিয়া আহার ও সঙ্গি-নির্দ্বন্দ্বিতাবিষয়ে সাবধান হইতে উপদেশ দিলেন।

সমাধি হইতে ব্যুত্থানকালে কিরূপ অবস্থা হয় তাহার পরিচয় আমরা কতকটা পাইলাম। কিন্তু সমাধিকালে অন্তরে কিরূপ অনুভূতি হয় সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই হয় না। স্বামীজী স্বয়ং “নাহি সূর্য্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শব্দ স্বন্দর” এই গানটিতে ঐবিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। সেদিনকার ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল। তিনি শয়নাবস্থায় ধ্যান করিতেছিলেন, হঠাৎ অনুভব করিলেন যেন মস্তকের পশ্চাদ্দেশে উজ্জ্বল আলোকরাশি প্রজ্বলিত হইয়াছে। ক্রমে সেই আলোক আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হইতে লাগিল যেন চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, নয়ন-সমুদ্র হইতে মুছিয়া যাইতেছে, বিশ্বসংসার টলিতেছে, ক্রমে মন একেবারে বাহ্যজগৎ তুলিয়া গিয়া এক অখণ্ড জ্যোতিঃসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া গেল। দেশ-কাল-পাত্রের আর কোনও বোধ রহিল না; শুধু ব্রহ্মসত্তা ভাসিতে লাগিল। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “সেদিন দেহাদি বুদ্ধির এক-কালে অভাব হইয়াছিল। প্রায় লীন হইয়া গিয়াছিলুম আর কি! একটু ‘অহং’ ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই ‘আমি’ আর ‘ব্রহ্মের’ ভেদ চলে যায়—সব এক হইয়া যায়,—যেন অহংসমুদ্রে জল—জল—আর কিছুই নাই—ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।” সমাধি-অবস্থা হইতে নীচে নামিয়া আসার পর তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন মস্তক ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি সেই অবস্থায় গোপালদাকে ডাকিয়াছিলেন।



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের ধ্যানাবস্থা কিরূপ পরিপক্বতা লাভ করিয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে অবগত হইতে পারা যায়। একদিন স্বনাম-ধন্য বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়ে এক বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিয়া-ছিলেন; সেস্থলে এত মশকের উৎপাত ছিল যে গিরিশ বাবু কিছুতেই চিন্ত স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে মশক-দংশনে অস্থির হইয়া চক্ষুঃস্নান করিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার বিশ্বাসের অবধি রহিল না। দেখিলেন তাঁহার শরীরের উপর এত অধিকসংখ্যক মশক বসিয়া আছে যে, বোধ হইতেছে যেন তিনি একখানি কৃষ্ণবর্ণের কবল দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া আছেন। তদর্শনে গিরিশ বাবু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। তারপর পা ধরিয়া ঘন ঘন ঠেলিতে লাগিলেন, তাহাতেও নরেন্দ্রের চৈতন্য হইল না। অবশেষে যখন গিরিশ বাবু নরেন্দ্রের আসন ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্যহীন দেহ ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহা মৃতদেহবৎ কঠিন এবং সম্পূর্ণ বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য। ইহার অনেকক্ষণ পরে তিনি বাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করেন। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তিনি নরেন্দ্রকে আপন সকাশে ডাকিতেন ও অজ্ঞাত শিষ্যগণকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দুই-তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ নরেন্দ্রকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি শীঘ্রই পাপপূর্ণ মর্ত্যালোক ত্যাগ করিয়া যাইবেন ভাবিয়া নরেন্দ্র সময়ে সময়ে মুহূর্ত্তান হইয়া পড়িতেন। দেহত্যাগের তিন-চারি দিবস পূর্বে একদিন পরমহংস-দেব তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন ও সম্মুখে বসাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে

## স্বামী বিবেকানন্দ

চাহিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী বলিতেন, তখন তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল যেন পরমহংসদেবের শরীর হইতে তড়িৎ-কম্পনের মত একটা ক্ষুদ্র তেজঃরশ্মি তাঁহার শরীরमध्ये প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে তিনিও বাহু-জ্ঞান হারাইলেন। কতকক্ষণ এইভাবে ছিলেন তাহা তাঁহার মনে ছিল না। বাহু-চেতনা হইলে দেখিলেন, পরমহংসদেব অশ্রুত্যাগ করিতেছেন! তিনি অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পরমহংসদেব স্নেহে বলিলেন, “আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলাম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হলে পর ফিরে যাবি।” নরেন্দ্রনাথও কাঁদিতে লাগিলেন। অন্তর ভাবপূর্ণ হওয়ায় তাঁহার বাঙ-নিষ্পত্তি হইতেছিল না। তিনি বালকের গ্রাম অবীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

লীলাবসানের দুই দিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে আপন সকাশে আহ্বান করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন, “দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।” নরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটিও বাক্য নির্গত হইল না। শুধু ভাবিতে লাগিলেন—সত্যই কি প্রভুর শেষ দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? হায় হায়, এতদিনে সব শেষ হইতে চলিল! ঐরূপ একদিন পরমহংসদেব এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিয়াছিলেন, “নরেন লোকশিক্ষা দিবে।” কিন্তু নরেন্দ্রনাথ, এই আদেশ পালন করিতে সমর্থ হইবেন কিনা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি পারবো না।” তাহাতে পরমহংসদেব জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, “করতেই হবে, তোর বাড়ি করবে।”

অতিলৌকিক বিষয়ে নরেন্দ্রের এত অধিক সন্দেহ এবং ঐসকল পরীক্ষা



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

করিবার আগ্রহ তাঁহার এক্রপ প্রবল ছিল যে, পরমহংসদেবের শেষ মুহূর্তে যখন প্রাণবায়ু বহির্গমনোন্মুখ হইয়াছে তখনও তিনি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, “আচ্ছা, উনি তো অনেক-সময়ে নিজেকে ভগবানের অবতার বলে পরিচয় দিচ্ছেন। এখন এইসময়ে যদি বলতে পারেন, ‘আমি ভগবান’ তবেই বিশ্বাস করি।” কি আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্তে নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে পরমহংসদেব তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, “এখনও তোর জ্ঞান হল না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম, যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।” এই অপ্রত্যাশিত পূর্ব্ববাক্য শ্রবণে নরেন্দ্র এত বিস্মিত হইলেন যে, যদি সেসময়ে কক্ষমধ্যে বজ্রপাতও হইত তথাপি বোধ হয় তিনি এত বিস্মিত হইতেন না। এক্রপ দেবতুল্য মহাপুরুষকে এতদূর ক্ষুদ্র সন্দেহের পাত্র মনে করার তখন তাঁহার অন্তরে বিষম অনুতাপের উদয় হইল এবং তিনি অবিরল অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

\*

\*

\*

ইহার দুই দিবস পরে পরমহংসদেব লীলাসংসরণ করেন। অধ্যাত্ম-রাজ্যের একটি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে অন্তর্মিত হইল।

\*

\*

\*

আমরা এখানে পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। কারণ তিনি যে কি ছিলেন তাহা কোনও কালে কেহ বুঝিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। স্বয়ং স্বামীজী পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন, “লোকে ঠাকুরের সম্বন্ধে যাহা বলে—সে সব partial truth (আংশিক সত্য) মাত্র। যে যেমন আধার সে ঠাকুরের ততটুকু নিয়ে আলোচনা কচ্ছে। এক্রপ করাটি মন্দ নয়।

## স্বামী বিবেকানন্দ

তবে তাঁর ভক্তের মধ্যে এরূপ যদি কেউ বুঝে থাকেন যে, তিনি যা বুঝেছেন বা বলেছেন, তাই একমাত্র সত্য, তবে তিনি দয়ার পাত্র। ঠাকুরকে কেহ বলেছেন—তান্ত্রিক কোল, কেহ বলেছেন—চৈতন্যদেব নারদীয় ভক্তি প্রচার করতে জন্মেছিলেন, কেহ বলেছেন—সাধন-ভজন করাটা ঠাকুরের অবতারদেব বিশ্বাসের বিরুদ্ধ, কেহ বলেছেন—সন্ন্যাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মুখে শুনিবি,—ওসব কথাই কান দিবি নি। তিনি যে কি, কত কত পূর্বগ অবতারের জমাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনব্যাপী তপস্বী করেও একচুল বুঝতে পারলুম না। তাই তাঁর কথা সংযত হয়ে বলতে হয়। যে যেমন আধার তাকে তিনি ততটুকু দিয়ে ভরপুর করে গেছেন, তাঁর ভাবসমুদ্রের একবিন্দু উচ্ছ্বাসের ধারণা করতে পেলো মানুষ তখনই দেবতা হয়ে যায়। সর্বভাবে এমন সময় জগতের ইতিহাসে আর কোথাও কি খুঁজে পাওয়া যায়?—এই থেকেই বোঝা তিনি কি দেহ ধরে এসেছিলেন। অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়।”

\*

\*

\*

পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ আরও কয়েক দিন কানীপুরের বাগানে অবস্থান করিলেন, কারণ যে সময়ের জন্ত বাগান ভাড়া লওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ হইতে আরও এক সপ্তাহ বাকী ছিল। সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের সকলেই দিনে একবার করিয়া সেখানে যাইতেন, কেহ কেহ বা দিবারাত্র সেখানে থাকিতেন। তবে সন্ধ্যার পর অনেকেই সেখানে উপস্থিত হইয়া ধ্যান-ধারণা, পরমহংসদেব সম্বন্ধে কথোপকথন, তাঁহার পুণ্য ও ধর্মসঙ্গীতাদিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেন। শ্রীগুরুর অদর্শনে তাঁহাদের প্রাণে যে বিষম বেদনা জাগিতেছিল তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্ত তাঁহারা উন্নতের স্থান তাঁহার উপদেশ কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে



## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে

লাগিলেন। যখনই দুইজন একত্র হইয়াছেন, অমনি তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা, কখনও বা যে-গৃহে তিনি ছিলেন তাহার মেজ্জেতে গড়াগড়ি—এইরূপে কয়েকদিন কাটিল। গৃহী শিষ্যরাও আসিতেন, তাঁহাদেরও ঐরূপ ভাব। সে-স্থানের প্রতি ধূলিকণাতে যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতি ও প্রভাব বিরাজ করিতেছিল।

তাঁহার তিরোধানের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। একদিন রাত্রে নরেন্দ্র ও তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা চিন্তাময়ভাবে একত্রে উঠানমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি উভয়েরই নেত্রপথে পতিত হইল।—এ কি?—এ যে শ্রীশ্রীগুরুদেবের প্রতিচ্ছবি! দুইজনেই ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র উহা তাঁহার নিভের ভাস্করিদর্শন হইতে পারে এই আশঙ্কায় বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না। কিন্তু যখন তাঁহার গুরুভ্রাতা বলিয়া উঠিলেন, “নরেন, দেখ দেখ!” তখন তাঁহার সংশয় দূর হইল। বুঝিলেন সত্যিই তিনি জ্যোতির্ময়রূপে দর্শন দিয়াছেন। তখন তাঁহারা আর সকলকে চীৎকার করিয়া আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা আসিতে আসিতেই সহসা সেই জ্যোতির্মূর্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার ভগ্নাবশেষ ও অস্থি একটি তাম্রকলসে রক্ষা করিয়া কাশীপুরের বাগানে যে ঘরে তিনি থাকিতেন সেই ঘরে রাখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা লইয়া এই সময়ে তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীদের ইচ্ছা ঐগুলি গঙ্গাতীরেই সমাহিত করা হয়, কারণ তিনি গঙ্গাতীর ভালবাসিতেন; কিন্তু গৃহীরা বলিলেন—প্রথমতঃ, গৃহী ব্যতীত আর কাহারও ঐগুলিতে অধিকার নাই, দ্বিতীয়তঃ, অধিকার থাকিলেও সন্ন্যাসীরা নিঃসম্বল, তাঁহাদের নিভেদেরই মাথা গুজ্জিবার স্থান নাই, উহার উপর আবার ঐসব অস্থি ও ভগ্নাবশেষ রাখিবেন কোথায়?

## স্বামী বিবেকানন্দ

সুতরাং তাঁহারা ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্ররোচনায় ঐগুলি কাঁকড়াগাছির উঠানে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সন্ন্যাসীরা—বিশেষতঃ শশী ও নিরঞ্জন মহারাজ কিছুতেই ঐ প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না। সুতরাং উভয়পক্ষে ক্রমশঃ বিষম কলহের সূত্রপাত হইল। এই গোলযোগের সময়ে নরেন্দ্র মধ্যস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি গৃহীদিগকে ‘অস্থি দিব’ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া আসিলেন এবং সকল সন্ন্যাসী ভ্রাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, “তোরা কি মনে করিস্ ঠাকুরের দেহাবশেষ অধিকারে থাকিলেই তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হওয়া যায়, না উহাই তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ? যদি আমরা তাঁহার প্রকৃত শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া বিবাদ করা অপেক্ষা বরং আমাদের উচিত তাঁহার উপদেশানুযায়ী জীবন গঠন করা। আয়, আমরা সেই চেষ্টা করি।” এই কথায় সকলে সন্মত হইলে স্বামীজী অপর সকলের সহিত একত্রে দেহাবশেষ-পাত্রটি নিজশিরে বহন করিয়া কাঁকড়াগাছির উঠানে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে উহার অভ্যন্তরস্থ পুত দেহাবশেষের অর্দ্ধাংশের অধিক বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অল্পদিন পরে উহা মঠে লইয়া গিয়া নিত্য সেবা-পূজার ব্যবস্থা করা হয়। অনন্তর চতুর্দশবর্ষ পরে উহা স্বামীজী কর্তৃক মহা-মহোৎসবে বেলেড় মঠে আনীত ও তথায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।



## বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠা

কাশীপুর বাগানবাটীর মিয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সময় অচিরে আগত হইল। এখন আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সশরীরে নাই—স্মরণ্য ঝাঁহারা বাগানের ভাড়া দিতেছিলেন তাঁহারা বাগান ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় কি করা যায়, সকলেরই মনে এই চিন্তার উদয় হইল। অনেক তর্কবিতর্ক হইল, কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত হইল না; গৃহীদের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসী শিষ্যদিগকে ভালবাসিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, “উহারা যে সাধারণ সাধুদের ত্রায় ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহা হইতে পারে না। উহারা এখনও বালক, সারাজীবন পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদিগের নিকট কত আশা-ভরসা আছে। অতএব এদিক-ওদিক ভাসিয়া বেড়ান অপেক্ষা উহারা বরং গৃহে ফিরিয়া যাউক।” কিন্তু সন্ন্যাসীরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। গৃহে ফিরিয়া যাওয়া?—অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবদ্দশায় তাঁহাদের করেকজন বি, এ, পরীক্ষা দিবার অল্প প্রস্তুত হইতে ছিলেন। তাঁহাদের পিতা, অভিভাবক ও আত্মীয়গণ এক্ষণে বুঝাইতে লাগিলেন যে বি, এ, পাশ করিয়া বাহা হয় করা উচিত। যদি তাঁহারা সংসার না করিতে চাহেন তাহা হইলেও অন্ততঃ পাশটা করা উচিত, কারণ তাহাতে তাঁহাদের মর্যাদা আরও বাড়িবে বই কমিবে না। এই ভাবের খুব পীড়াপীড়ি, প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন চলিতে লাগিল। বালকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পরীক্ষা দিতে বা পারিবারিক ব্যাপার শেষ করিয়া আসিবার অল্প পুনরায় গৃহে গমন করিলেন। ইচ্ছা—ঐগুলি শেষ হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

কিন্তু কয়েকজন সন্ন্যাসী ইতোমধ্যেই একপ্রকার গৃহ ত্যাগ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা কোথায় যান—এই লইয়া গৃহীদের মধ্যে নানা বাদামুবাধ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে বলরাম বসু, “সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—এই চারিজননের একান্ত ইচ্ছা যে ঐসকল যুবক সন্ন্যাসীরা একত্র মিলিত হইয়া একটি সজ্জ স্থাপন করেন। কিন্তু অপর গৃহী ভক্তেরা বলিলেন যে, ঐরূপ করিলে পরিণাম ভাল হইবে না, কারণ টাকা কোথায়? যুবক সন্ন্যাসীরা তহুত্তরে বলিলেন, “অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের উপদেশ পাইয়া ও তাঁহার জীবনে জলন্ত বৈরাগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া এখন কি আবার সংসারকূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে যাইব? তিনি কি বলেন নি—‘সন্ন্যাসী সঙ্কয়ের কথা ভাবিবে না,’ ‘কাল কি খাইব—এ চিন্তা করিবে না?’ কে টাকা চায়? আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইব—তারপর তিনি আছেন।” যাহারা গৃহে যাইতে উত্তত হইয়াছিলেন তাঁহারাও বলিলেন, “আমাদেরও য়েই পরীক্ষা শেষ হইবে অমনি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিব।” এইসকল ত্যাগী যুবকের এবংবিধ দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ মিত্র সজ্জনয়নে কহিলেন, “ভাই রে! তোরা কোথায় যাবি? তোদের কোথাও যেতে হবে না, বা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে না। আমরা যে-কয়জন গৃহী ভক্ত আছি, যা পারি সামান্য কিছু দিয়ে একটা বাড়ী ভাড়া করবো, তোরা সব সেখানে থাকবি। আমরাও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে সংসারের জালা জুড়াব। আমি ত কাশীপুরের বাগানের দরুণ আগে কিছু কিছু দিতাম, সেটা আর বন্ধ করবো না। তাতেই একটা ছোট বাড়ী নিয়ে তোরা থাকবি, আর যা জুটবে তাই খেয়ে সাধন-ভজন করবি,—ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়াতে পাবি না।”



## বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠা

সুরেন্দ্র বাবু একজন অদ্ভুত হৃদয়বান ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি ছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহাকে আদর করিয়া দানা (অর্থাৎ শিবাম্বুচর) বলিয়া ডাকিতেন। ইহার উপরি উক্ত কথা অনুসারে বরাহনগরে একটি বাটা ভাড়া লওয়া হইল। বাড়ীটি অনেকদিনের পুরাতন ও বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। বহুদিন হইতে লোকজন না থাকাতে উহা পড়ো বাড়ীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, এমন কি তাহা অপেক্ষাও গুরুতর অপবাদ ইহার রটিয়াছিল। লোকে বলিত ঐ বাড়ীতে ভূত আছে। সে বাহা হউক বাড়ীটি যে অতি জীর্ণ অবস্থায় বহু বৎসর পড়িয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন লোক ভাড়া দিয়া সেখানে থাকিতে সক্ষম হইত না—ভয়, পাছে ছাদ খসিয়া পড়ে পড়ে! রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের ভূত বা মৃত্যুর ভয় বিশেষ ছিল না। তাঁহারা দেখিলেন বাড়ীটির ভাড়া কম, আর গঙ্গার নিকটে, অথচ শহরের গৌলমাল হইতে অনেক দূরে, ধ্যান-ধারণার কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই আশ্রম ১৮৮৬ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত এইখানেই ছিল এবং ইহারই নাম বরাহনগর মঠ।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধীরে ধীরে মঠটি গঠিত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীদের কেহ-না-কেহ স্থানিভাবে এখানে থাকিতেন, কেহ বা দিন কতকের জন্ত তীর্থভ্রমণে যাইতেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া এইখানেই থাকিতেন। যাহারা গৃহের বন্দোবস্ত করিবার জন্ত গিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রায় প্রত্যহ এখানে সমাগত হইতেন। নরেন্দ্রনাথ এই দলের প্রধান ছিলেন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলার জন্ত তিনি একেবারে সংসার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; মধ্যে মধ্যে গৃহে গিয়া সাংসারিক অভাব-অভিযোগ শ্রবণ ও নিবারণের চেষ্টা করিতে হইত। তবে দিবসের

## স্বামী বিবেকানন্দ

অধিকাংশ সময় এবং রাত্রিটা মঠেই কাটাইতেন। এই যে এতগুলি যুবক সন্ন্যাসী একত্র মিলিত হইয়া একটা নবসঙ্ঘে পরিণত হইল, ইহার প্রধান উদ্বোধক নরেন্দ্রনাথ। তিনিই ইহার পরিচালক, উৎসাহদাতা ও কেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন। সংসারের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও তিনি এক মুহূর্ত্ত মঠের চিন্তা হইতে বিরত ছিলেন না। ক্রমে তাঁহার সাংসারিক গোলযোগ মিটিয়া আসিল। যখন দেখিলেন ঝগড়াট চুকিয়াছে, তখন তিনি, যাহারা জালুয়ারীতে পরীক্ষা দিবেন বলিয়া গৃহে বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে মঠে আকৃষ্ট করিবার জন্য বন্ধপত্রিকর হইলেন। দিবসের মধ্যে কখন কাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইতেন তাহার কিছু স্থিরতা ছিল না। সকলেই তাঁহার আগমন-ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরীক্ষার জন্য পাঠাভ্যাস করিতেন, কিন্তু তিনি একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মত হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদের গৃহদ্বারে উপযু্যপরি করাঘাত করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিতে বাধ্য করিতেন। সেখান হইতে তাঁহাদিগকে রাত্রপথে টানিয়া লইয়া গিয়া অভিভাবকদিগের অসাক্ষাতে ওজস্বিনী ভাষা বলিতেন—“তোরা কি সব জীবনটা একজামিন্ দিয়েই কাটা বি ঠিক করেছিস্? এই কি তাঁর উপদেশ পালন করা! এই কি তাঁর মনোমত কার্য! এইজন্তই কি তিনি এত কষ্ট সহ্য করে গেলেন! সন্ন্যাসী হয়েছিস্, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিস্, তবু একজামিন্ পাশ করে সংসারের উন্নতিকামনা করিস্? ত্যাগ ও ভোগবাসনা কি এক সঙ্গে থাকতে পারে? ধিক্ তোদের! শীগগির ওসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মঠে চল।” এবং প্রকার ভৎসনা-বাক্যে, কখনও বা ধীরভাবে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে মঠে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় গুরু-ভাইদের পূর্বকথা স্মৃতিপথে দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিত ও সংসারকামনার



## বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠা

ক্ষীণ বীজ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যাইত। তাঁহারা নরেন্দ্রের বাক্যে অনুতপ্ত হইয়া পাঠাদি ত্যাগ করিয়া মঠে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু দুই-একদিন থাকিয়াই আবার গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। পুনরায় নরেন্দ্রনাথ পূর্ববৎ প্রত্যেকের বাটীতে গিয়া অগ্নিময়ী ভাষায় সকলের প্রাণে বৈরাগ্য-বহ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমশঃ গুরু-ভ্রাতাদিগের মন টলিল। সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প সূদৃঢ় হইল। তাঁহারা বুঝিলেন, বাঁহারা পারমাথিক পথের পথিক, বাঁহারা ইন্দ্রিয়রাজ্য ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের জ্ঞাত অগ্রসর, তাঁহাদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-মূল্য অতি সামান্য, সাংসারিক বিদ্যাশিক্ষা অতি হেয়। সুতরাং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা পরীক্ষার বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন ও একে একে মঠে আসিয়া যোগদান করিতে লাগিলেন।<sup>১</sup> ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে তাঁহারা সকলেই একেবারে গৃহ ছাড়িয়া মঠে বাস করিতে লাগিলেন। গৃহ-সংসার

১ এইরূপ মনপরিবর্তনের আর একটি প্রধান কারণ ঝাঁটপুরের ঘটনা। ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রেমানন্দ স্বামীর মাতা স্বীয় ঝাঁটপুরের বাড়ীতে সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। এখানে তাঁহারা কয়েক দিবস একত্র সঙ্কীৰ্ত্তন, ধ্যান-ধারণা ও ধর্মপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া এরূপ মাতোয়ারা হইয়া পড়িলেন যে, অভ্যুপগম আর বাটীতে ফিরিয়া না গিয়া মঠেই অবস্থান করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। ঝাঁটপুরে একদিন স্বামীজী এরূপ প্রাণলিপ্সী ভাষায় খ্রীষ্টনামাহাঙ্ক্য বর্ণনা করেন যে, সকলে একেবারে সেই মহাপুরুষের ভাবে তন্ময় হইয়া যান। দৈবক্রমে সেদিন খীশুখ্রীষ্টের জন্মদিবসের অধিবাস-রজনী (Christmas Eve)। কিন্তু প্রথমে তাহা কেহই জানিতেন না। পরে যখন জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, ঐদিন অজ্ঞাতনামে এরূপ আলোচনা নিশ্চয়ই বিধাতা-নির্দিষ্ট ঘটনা। সেইদিন হইতে তাঁহাদের সকলের মনে সজ্জগর্তনের বাসনা দৃঢ়বদ্ধ হইল।

## স্বামী বিবেকানন্দ

সব ভাসিল,—আধ্যাত্মিকতার প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগকে নূতন পথে টানিয়া লইয়া চলিল।

দৃষ্ট সিংহের ত্রায় তেজস্বী নরেন্দ্রনাথ এইসময়ে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে জ্ঞাত তাঁহাদের হৃদয়কে আপনার বিপুল শক্তির সাহায্যে বজ্রবৎ দৃঢ় করিয়া গঠিত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর জীবন বড় কঠোর! সুখের ক্রোড়ে লালিত এইসকল ভদ্রসন্তানেরা বাহাতে ত্যাগমার্গের দাবদাহ-সহনে অসমর্থ হইয়া দুর্বলচিত্তে পলায়ন না করেন, তাহার জ্ঞাত তিনি অশ্রান্ত পরিশ্রমে তাঁহাদের মনকে বলীয়ান করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও সানন্দে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন; তাঁহারা জানিতেন যে, প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহারই হস্তে তাঁহাদিগের ভার্য্যাপণ করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহার উপর ঠাকুরের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তা ছাড়া নরেন্দ্রের নিজেরও এমন একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল যে, কেহই তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিত না। তাঁহার গমনভঙ্গী, চক্ষুর মোহিনীশক্তি, ওজস্বিনী ভাষা ও প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল দর্শকমাত্রেরই প্রাণে স্বতঃই তাঁহার উপর একটা নির্ভরতার ভাব আনিয়া দিত। গুরুভ্রাতারা কেহ কেহ মনে করিতেন, “নরেন্দ্রের অনুবর্তী হইয়া কার্য্য করিলেই ঠাকুর সন্তুষ্ট হইবেন,” কেহ ভাবিতেন, “ইনি তাঁহারই প্রতিনিধি।” কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে সহোদরতুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সতত স্নেহ-ভালবাসার বন্ধনে বেষ্টিত করিয়া রাখিতেন। তবে প্রয়োজন হইলে কঠোর অঙ্গু ও প্রয়োগ করিতে জানিতেন। নরেন্দ্রনাথ হইলেন তাহার অধিনায়ক।

মঠস্থাপনার পরেও মাঝে মাঝে ঐসকল সন্ন্যাসীদিগের অভিভাবকেরা মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া বাইবার জ্ঞাত বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা কখনও কাকুতি-মিনতি ও



## বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠা

ক্রন্দনাদি করিতেন, কখনও বা ভয় দেখাইতেন ও শাসাইতেন এবং সকল দোষ নরেন্দ্রের স্বন্ধে চাপাইয়া বলিতেন—“এই ছোড়া হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। এরা সবাই বাড়ী গিয়ে দিবিয় পড়াশুনো করছিল, এ-ই ওদের টেনে-হিঁচড়ে এখানে নিয়ে এলো, আর যত কু-পরামর্শ দিতে লাগলো!”

একরূপ অভিযোগ শুনিয়া নরেন্দ্র ও অপরাপর সন্ন্যাসীরা হাত্তসম্বরণ করিতে পারিতেন না এবং নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাদের মনঃকোভ-প্রশমনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে শেষে বলিতেন, “আমরা গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, এখন ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব।” শশীর পিতা যখন শশীকে গৃহে ফিরিবার জ্ঞাত বিশেষ ক্ষেদ্র করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “বে একবার সংসার ছেড়ে এসেছে, তার কাছে সংসার বাঘের বাসা।”

অগত্যা অভিভাবকেরা তাঁহাদের চিন্তের দৃঢ়তা ও অটল অধ্যবসায়-দর্শনে তাঁহাদের গৃহপ্রত্যাগমন-বিষয়ে একরূপ নিরাশ হইয়া একরূপ চেষ্টা ত্যাগ করিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঠ বরাহনগরে ও ১৮৯২ হইতে ১৮৯৭ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের সন্নিকটস্থ আলমবাজারে ছিল। সেখান হইতে কিছুদিনের জ্ঞাত বরাহনগরের অপর পারে গঙ্গাতীরবর্তী নীলাশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানবাটাতে উঠিয়া যান, পরিশেষে স্থানান্তরে বেলুড়ে প্রতিষ্ঠিত হন।

মঠ-স্থাপনার পর হইতে এইসকল যুবকগণের মধ্যে প্রীতিবন্ধন ও ভ্রাতৃত্ব ভাব ক্রমশঃ দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং কঠোর অনল-পরীক্ষার মধ্যে দিন দিন তাহাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল।

সে কি ভীষণ পরীক্ষা! আহারের কোন সংস্থান নাই, পরিধানের বস্ত্র

## স্বামী বিবেকানন্দ

নাই, দাসদাসী কিছুই নাই, হস্তে অর্থও নাই ; ভিক্ষায় অনভ্যস্ত, দানগ্রহণে পরাঙ্মুখ, কাহারও নিকট বিশেষ সাহায্যেরও কোন প্রত্যাশা নাই—এইরূপ অবস্থার মধ্যে এইসকল তেজস্বী যুবক হৃদয়ের বল মাত্র সম্বল লইয়া, প্রভুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইলেন। এ সাধনা শুধু স্ব স্ব মুক্তিকামনায় নহে। পাঠক দেখিবেন, এ সাধনায় ভারতের—শুধু ভারতের কেন—সমগ্র জগতের কল্যাণসাধন নিহিত রহিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (ডাক-নাম ‘সুরেশ বাবু’) এই মঠের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি তাঁহার ত্রায় মহদন্তঃকরণ লোক এজগতে দুর্লভ। মঠের এইসকল যুবকদিগকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। যাহাতে ইহাদিগের কোন অভাব-অসুবিধা না হয় তদ্বিষয়ে তিনি সতত লক্ষ্য রাখিতেন এবং কায়মনোবাক্যে ও অর্থদ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। বরাহনগরের মঠের ভাড়া তিনিই বহন করিতে স্বীকৃত হন, পূর্বে একথা বলিয়াছি। মঠ স্থাপিত হইলে তিনি গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে মঠে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, “আমি তোমার সংসারের সব খরচ নিজের ঘাড়ে লইলাম, তুমি মঠে থাকিয়া মঠের গৃহকর্মাদি করিবে এবং প্রত্যহ বা একদিন অন্তর আমার নিকট আসিয়া মঠের ভাইদের খবর দিবে। বিশেষ করিয়া এইটি মনে রাখিও যে, যখনই তাহাদিগের খাওয়াদির অভাব দেখিবে তখনই যেন তাহা আমার কর্ণগোচর হয়।” গোপাল পরমহংসদেবকে জানিত ও নরেন্দ্রকে বড় ভালবাসিত। তাহার দুইটি অল্পবয়স্ক ভ্রাতা ও বিধবা মাতার জন্ত সে পূর্বে মঠে যোগ দিতে পারে নাই। সুরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দসহকারে মঠে আসিয়া বাস ও তাঁহার উপদেশ মত কার্য করিতে লাগিল। সে যখনই দেখিত যে ব্যাপার সুবিধা নয়, তখনই সুরেন্দ্র বাবুকে সংবাদ দিত। “আজ সমস্ত দিন মঠে উপবাস



## বরাহনগর মঠ-প্রতিষ্ঠা

গিয়াছে,” কি “কাল রাত্রি হইতে সকলে অনাহারে আছেন,” এইরূপ এক-একটা খবর লইয়া যখন সে সুরেশ বাবুর নিকট উপস্থিত হইত, তখন তিনি অবিলম্বে তাহাকে টাকা দিয়া বাজারে পাঠাইতেন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মঠে লইয়া যাইতে বলিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করিয়া দিতেন যেন একথা প্রকাশ না হয়, কারণ তিনি জানিতেন কথাটা প্রকাশ পাইলে মঠের ভাইরা আর কখনও তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। গোপাল এই-সকল জিনিসপত্র লইয়া মঠে উপস্থিত হইলে সকলে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন কোথা হইতে সেসব আসিল। গোপাল চতুরতার সহিত উত্তর দিত, “ওঃ, এসব একজন ভদ্রলোক পাঠিয়ে দিলেন। আমি ত কিছুতেই নেবো না, কিন্তু তিনি ভারি গীড়াগীড়ি করতে লাগলেন,—কি করি, কাছে-কাছেই নিয়ে আসতে হলো।” মঠের ভাইরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন, ‘প্রভুর মহিমা কে বুঝিতে পারে! তিনি কাহাকে দিয়া কি কার্য্য করাইতেছেন তাহা আমরা কি বুঝিব?’

ধৃত্য সুরেন্দ্রনাথ—ধৃত্য তোমার প্রেম! সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বামীজী স্বয়ং শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “সুরেশ বাবুর নাম শুনেছি। ত? তিনি এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরাহনগর মঠের সব খরচপত্র বহন করতেন। ঐ সুরেশ মিত্তিরই আমাদের জন্ত তখন বেশী ভাবতো। তাঁর ভক্তি-বিশ্বাসের তুলনা হয় না।”

## বরাহনগর মঠে তপস্তা

বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে এই সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রকৃত একনিষ্ঠ তপশ্চর্য্যার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে প্রত্যহ যে কি সুখের ছিলেন প্রবাহিত ও আনন্দের কলতান উথিত হইত তাহা লেখনী কি ব্যক্ত করিবে ! সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অবিরাম সংকীৰ্ত্তন হইতেছে, কাহারও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তিবোধ বা বিশ্রামের আকাজক্ষা নাই। ব্যাকুল ঈশ্বর-দর্শন-লালসা দাবায়ির ছায় প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রজ্জলিত, নরেন্দ্রাদি কেহ কেহ প্রায়োপবেশনে তনুত্যাগ করিতেও কৃতসংকল্প। যেদিন যেমন জুটিত সেইদিন তেমন আহার হইত। স্বামীজী স্বয়ং একসময়ে বলিয়াছিলেন, “বরাহনগরে এমন কতদিন গিয়াছে যে, খাবার কিছুই নাই, ভাত জুটে ত নুন জুটে না। দিন কতক হয়ত শুধু নুন-ভাত চললো, কিন্তু কাহারও গ্রাহ নাই। অপখ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুন-ভাত,—এই মাসাবধি চলছে। আহা, সে-সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি !”

খাওয়া-দাওয়ার ত এই অবস্থা। তার উপর লোকজন নাই, স্ততরাং ঘর বাঁচি দেওয়া, বাসন মাজা, জল তোলা—এমন কি মাঝে মাঝে রন্ধনাদি পর্য্যন্ত সকল কার্য্য নিজেদেরই করিতে হইত। প্রত্যেকেই অপরের পরিবর্তে স্বয়ং কার্য্য করিবার জন্ত ব্যস্ত। কার্য্যের মধ্যেই আবার দিবারাত্র ধর্ম্ম-দর্শনাদির আলোচনা চলিতেছে, এমন অনেক দিন গিয়াছে যে, আদৌ আহার জুটে নাই অথচ ধর্ম্ম-প্রসঙ্গেরও বিরাম নাই।



## বরাহনগর মঠে তপস্শ্রা

তাহার মধ্যে ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! পরিধানের অল্প প্রত্যেকের একখানি কোপীন ও এক টুকরা গেরুয়া বস্ত্র। আর সর্বসাধারণের অল্প একখানি মাত্র সাদা কাপড় ও একখানি চাদর দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান থাকিত, যাহার যখন বাহিরে যাইবার আবশ্যক হইত তিনি তখন উহা ব্যবহার করিতেন। গৃহসম্ভ্রাম অত্যাশ্র উপকরণের মধ্যে একখানি চাদরটাকা মাহুর—তাহার উপর রাত্রিতে শয়নকার্য্য নির্বাহ হইত, শুটিকতক জপের মালা ও দেওয়ালের গায়ে দুই-চারিখানা ঠাকুরদে বতার ছবি ও একটা তানপুরা, আর প্রায় শতখানেক সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী কেতাব—এগুলি ভক্ত-বন্ধুদিগের প্রদত্ত উপহার।

তখন স্বামীজী একদমে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিতেন; কাজ করিতে করিতে যেন উন্মত্তের ছায় হইয়া গিয়াছিলেন। স্বয়ং ব্রাহ্মমুহুর্তে শয্যাভ্যাগ করিয়া অপর সকলকে জাগ্রত করিবার জন্য “জাগো জাগো সবে অমৃতের অধিকারী” গানটি গাহিতেন। তারপর সকলেধ্যান করিতে বসিতেন এবং বেলা দ্বিপ্রহর বা ততোধিককাল পর্যন্ত ভজন ও সংপ্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকিতেন। স্তবপাঠ ও ভজন হইতে হইতে ইতিহাসের প্রসঙ্গ উঠিত। জোয়ান অব আর্ক ও রাসীর রাণী প্রভৃতির গল্প হইত। কখন কখন স্বামীজী কার্লাইলের ‘ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব’ নামক গ্রন্থ হইতে সুদীর্ঘ অংশসমূহ আবৃত্তি করিতেন এবং সকলে সম্মুখে হুলিতে হুলিতে ‘সাধারণতন্ত্রের জয় হোক’, ‘সাধারণতন্ত্রের জয় হোক’—এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরে শশী মহারাজ তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইয়া নানাহার করিবার জন্য উঠাইয়া দিতেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহারা আবার একত্র হইতেন, আবার ভজন ও সংপ্রসঙ্গ চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত এবং তৎসঙ্গে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের দুইঘণ্টাব্যাপী আরাত্রিক সম্পন্ন হইত। তাহার পর মধ্যরাত্র বা

## স্বামী বিবেকানন্দ

তাহারও পর পর্য্যন্ত সকলে একত্রে ছাদে বসিয়া ‘সীতারাম’ নাম গান করিতেন। গভীর রাত্রে এবশ্প্রকার উচ্চ ধ্বনিতে সময় সময় প্রতিবেশিগণের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য নাই—তঁাহারা তখন আপন ভাবেই তন্ময়।

প্রথম প্রথম মঠের সন্ন্যাসীরা প্রচারকার্যের বিরোধী ছিলেন। ঈশ্বরলাভই তখন তঁাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার পর যদি আবশ্যক হয়, তবে পরমহংস-দেবের শ্রায় নীরবে পরোক্ষভাবে আপনাদের জীবন্ত দৃষ্টান্তদ্বারা প্রচারকার্য করিবেন—এইরূপ সংকল্প ছিল। এই ভাবটি নরেন্দ্রনাথই তঁাহাদের মধ্যে গভীরভাবে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতেন যে, অপরকে শিক্ষা দিবার পূর্বে নিজে উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক, প্রথমে নিজেদের লাভ করিতে হইবে, তারপর অপরকে দান, কিন্তু সময়ে সময়ে প্রচারকের ভাব তঁাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। তখন তিনি বলিতেন, “সকলেই প্রচারকার্যে ব্যস্ত কিন্তু তারা না জেনে প্রচার করে, আমি সেটা জেনে করব। এমন কি তোরা যে আমার গুরুভাই, তোরাও যদি তার প্রতিবন্ধক হ’স তবুও আমি ছাড়ব না, দীনহীন চণ্ডালের কুটিরে পর্য্যন্ত গিয়ে প্রচার করে আসব।” তিনি বলিতেন, “প্রচারের অর্থ প্রকাশ (expression) — এই দেখ ত্রৈলোক্যস্বামী : দিনরাত বিশ্বেশ্বরের চরণে পড়ে রয়েছেন, মুখে একটি কথা নেই, জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর দেন না। তবু কি ভাবিস, তিনি কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন না? মৌনই তাঁর প্রচার। এই মৌনভাষায় তিনি জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন। তার সাক্ষী দেখ, গাছপালাগুলো পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে।” এই প্রসঙ্গে তিনি নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি বর্ণনা করিতেন—এক রাজা একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ ও লক্ষণ কি? সাধুটি কোন উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। রাজা অনেক-



## বরাহনগর মঠে তপস্যা

ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন উত্তর পাইলেন না, তখন অসহিষ্ণুভাবে পুনরায় ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সাধু উত্তর দিলেন, “মহারাজ, আমি ত অনেকক্ষণ হইতে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, কারণ নীরবতাই তাঁহার লক্ষণ।”

উপরোক্ত উপদেশমতে সন্ন্যাসীরা নির্জ্ঞানতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইতেন।

বস্তুতঃ সেসময়ে বরাহনগর মঠে নরেন্দ্রপ্রমুখ রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা যে উৎকর্ষ সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহার তুলনা জগতে অতি বিরল। ষাঁহার মঠে সেসময়ে তাঁহাদিগকে দেখিতে বাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও বলেন, “সে যে কি কঠোর তপস্যা, তাহা যুখে কি বলিব? সে কঠোরতা সহ করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।” অথচ সন্ন্যাসীরা নিজে তাহাকে বড় বিশেষ কঠোর বা কষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, বা তাহা পর্যাাপ্ত বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, “ওঃ! ঠাকুরের কি অদ্ভুত বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা ছিল! তিনি বা দেখাইয়াছেন আমরা তার এক আনাও করিতে পারিতেছি না। হায় হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা কি অপদার্থ!” কিন্তু বাস্তবিক নরেন্দ্রের কার্য দেখিলে তখন মনে হইত, তিনি তপস্তানলে আপনাকে ভস্মীভূত করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, মনে হইত যেন তাঁহার অন্তরের প্রবল ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর-সন্দর্শন-তৃষ্ণা দেহ-পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া ফেলিবে। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধ্যানে বসিতেন এবং সমস্ত রাত্রি নিষ্পন্দভাবে আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সেসময়ে অপর কেহ তাঁহার

১ উপনিষদে আছে—বাস্তবিক ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—“মৌনমেব ব্রহ্ম”।

## স্বামী বিবেকানন্দ

নিকট যাইতে সাহস পাইত না। যতক্ষণ অন্ধকার থাকিত তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন না। অবশেষে যখন পূর্বদিক উবার অন্ধরণাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত তখন তিনি ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন। সমস্ত রাত্রি একাগ্রতা-সাধনের অদম্য চেষ্টায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করিত, মুখমণ্ডল দিব্যভাবে পরিব্যাপ্ত ও প্রাণ অব্যক্ত পুলকে পরিপূর্ণ হইত।

অত্যন্ত সাধুরাও এই দৃষ্টান্তের অনুকরণে কঠোর সাধনে নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পিপাসা মিটিত না, প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, ‘হায় হায়! আমরা ঈশ্বরলাভের জন্ত কিছুই করিতে পারিতেছি না।’

বাস্তবিক সে-সময়ে মঠ-ভ্রাতারা দিবারাত্র ঠাকুরের ভাবে তন্ময় থাকিতেন। এমন দিন বা সময় ছিল না যে সময়ে তাঁহার স্মৃতি একেবারে মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহারা এ সময়ে মঠে বাতায়ত করিতেন, তাঁহারা এই সাধুগণের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে ভাবিতেন, ‘ইহারা কে?—চক্ষু হইতে যেন অগ্নিবর্ণ হইতেছে, দেখিতে উন্মাদের মত!’ বাস্তবিকই ইহারা ঈশ্বরের জন্ত উন্মাদ হইয়াছিলেন এবং সর্ববিধ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ কয়েক প্রহর নিম্পন্দ-ভাবে বসিয়া ভগবৎ-ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা অধ্যাত্মসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অন্তরে চিদানন্দসুখ অনুভব করিতেছেন। স্বামীজী নিজে যেমন এসকল বিষয়ে উত্তোগী ছিলেন আর সকলকেও তেমনি উৎসাহ দিতেন। তাঁহার নিজের জীবনটা এমন একটা আদর্শস্বরূপ ছিল যে, তাঁহার সম্মুখে থাকিলে কেহই জড়বৎ বসিয়া থাকিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইত যেন তাঁহারা সকল বন্ধন ছিন্ন



## বরাহনগর মঠে তপস্তা

করিয়া ফেলিবেন ও জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের ছায় দেহটাকে পরিত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণ-লোকে চলিয়া যাইবেন। সে-সময়ে তাঁহাদের নিকট জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মৃত্যুই বড়ি হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? কেহ কেহ শ্মশানে রাত্রিযাপন করিতেন ও চিতানলের শত শত লেলিহান জিহ্বাস্পর্শে কেমন করিয়া এ নখর মানবদেহের শেষ চিহ্ন চিরদিনের মত ধরাবক্ষ হইতে লুপ্ত হয়, তাহা দেখিতে দেখিতে মৃত্যুচিন্তা হইতে ক্রমে মৃত্যুঞ্জয়ের চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাইতেন। কেহ কেহ জগন্মাতার রূপ দর্শন না করিয়া ছাড়িব না, একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতেন। কেহ সারাদিন সারারাত মালাই জপিতেছেন, আবার কেহ বা সত্যলাভের দৃঢ় সংকল্প লইয়া প্রতি রজনী একটা প্রকাণ্ড ধূনি জ্বলাইয়া তাহার নিকট বসিয়া থাকিতেন।

এইভাবে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ যখন দেখিতেন যে, গুরুভ্রাতারা অত্যন্ত কঠোর অমৃতাধানে ব্রতী হইয়াছেন, এমন কি তাহাতে শরীরের অনিষ্ট-সম্ভাবনা, তখন বলিতেন, “তোরা কি মনে করেছিস্ সকলেই রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি?—তা হয় নারে! রামকৃষ্ণ পরমহংস পৃথিবীতে একটাই জন্মায়—একবারই আসে।” কখনও বলিতেন, “তাঁর মুখে পিপড়ে আর চিনির পাহাড়ের কথা শুনেছিস্ ত? তোরা হচ্ছিস্ সেই পিপড়ে. আর ভগবান চিনির পাহাড়। তোদের এক-একটা দানা পেলেই পেট ভরে যায়, কিন্তু মনে কচ্ছিস্ পাহাড়টা শুদ্ধ টেনে নিয়ে যাবি।”

উপরোক্ত সাধন ব্যতীত মঠে প্রত্যহ মন্ত্রপাঠের সহিত ধূপ-দীপ জ্বলাইয়া, শঙ্খঘণ্টা বাজাইয়া ঠাকুরের পূজা হইত। সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের আরাট্রিক ও ভজনগান হইত, এবং শত অভাব-অনটনের মধ্যেও ঠাকুরের নিত্য-ভোগের ব্যবস্থা ছিল। স্বামীজী কর্তৃকই এই পূজা প্রথমে মঠে প্রবর্তিত হয়।

## স্বামী বিবেকানন্দ

সকলেই একযোগে মঠের কার্য নির্বাহ করিতেন এবং স্বামীজী সকল কার্যেরই মূল উৎস ছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজায় কেহ শশী মহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সমকক্ষ ছিলেন না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “শশী ছিল মঠের প্রধান স্তম্ভ, সে না থাকিলে মঠ চলা অসম্ভব হইত।”

বাস্তবিক আর সকলে তীর্থপর্যটন বা তপস্বাদিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু শশী মহারাজ ঠাকুরপূজা ছাড়া আর কিছু জানিতেন না। তাঁহার ত্রায় একনিষ্ঠ ভক্ত জগতে দুর্লভ। তিনি ছিলেন একাধারে মঠের পাচক, পূজারী ও গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক। সকলে যখন ধ্যানধারণায় ব্যস্ত তখন তিনি মঠের অত্যাবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ কাজগুলি সম্পন্ন করিতেন, সকলকে জোর করিয়া স্নানাহারাদি করাইতেন। তিনি নিজেও অপধ্যান বঞ্চিত করিতেন, কিন্তু মঠের গৃহ-কার্যগুলির উপর তিনি যতটা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন অপরে ততটা পারিতেন না। স্বামীজী বলিতেন, “ওঃ, শশীর কি অদ্ভুত নিষ্ঠা ছিল! শশীই ছিল মঠের কেন্দ্রস্বরূপ। ভিক্ষে-শিক্ষে করে ঠাকুরের ভোগরাগান্তে সকলের খাওয়া-দাওয়া জোগাড় করা থেকে রাঁধা-বাড়া ও সকলকে খাওয়ান পর্যন্ত সব কাজ তাকে দেখতে হতো। আমরা ভোর ৩টার সময় উঠতুম, তারপর কেউ স্নান করতো, কেউ বা অমনিই ঠাকুরঘরে গিয়ে অপধ্যানে বসে যেতো। এমন অনেক দিন গেছে যে ভোর ৪।৫টার সময় থেকে সন্ধ্যা ৪।৫টা পর্যন্ত অপধ্যান চলেছে। শশী আমাদের খাবার নিয়ে বসে থাকতো, সময়ে সময়ে জোর-জবরদস্তি করে খাওয়াতো। তখন আমাদের অপধ্যানে এত মন গিয়েছে যে, বিশ্ব থাক বা যাক কিছুই গ্রাহ নেই।”



## বরাহনগর মঠে তপস্বী

এ তো গেল তপস্বী ও সাধন-ভজনের কথা। এ ছাড়া গুরুভাইদিগকে কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত করিবার জন্য স্বামীজী বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বরাহনগরের মঠে একটা বড় হলঘর ছিল, সকলে তাহাকে 'দানাদের ঘর' বলিত। সেখানে ধর্ম, সঙ্গীত, দর্শন, ইতিহাস, জড়-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাদানুবাদ চলিত, গীতা-উপনিষদাদি শাস্ত্র-পাঠ হইত, আবার ক্যাণ্ট, মিল, হেগেল, স্পেন্সার—এমন কি নাস্তিক ও জড়বাদীদিগের মতামতও পঠিত এবং সমালোচিত হইত। সে সভার সভাপতি ও প্রধান বক্তা ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। অত্যাশ্চর্য্য সন্ন্যাসীরা প্রায়ই একযোগে তাঁহার প্রতিপক্ষ অবলম্বন করিতেন। তিনিও প্রতিকূল যুক্তির অবতারণা করিয়া সকলের যুক্তি খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাঁহার তর্কে অসমর্থ হইলে আবার তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিতেন। যদি প্রশ্ন উঠিত ঈশ্বর আছেন কিনা, সভাপতি তর্কবলে প্রমাণ করিতেন, ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, ওটা মনের কল্পনা মাত্র। আবার তিনিই কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমাণ করিতেন ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু। হয়ত শাক্ত দর্শন সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে, নরেন্দ্রনাথ শঙ্করকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আগাগোড়া দেখাইলেন শঙ্করের যুক্তিতে বহুবিধ দোষ বিদ্যমান। আবার তিনিই কিঞ্চিৎ পরে বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রমাণ করিতেন যে শাক্ত দর্শনই একমাত্র সত্য দর্শন এবং তাঁহার যুক্তিসমূহ অকাট্য। এইরূপে সাংখ্য-বেদান্ত-তন্ত্র-যোগাদি বড় দর্শনই সভামধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইত। ইহা ছাড়া বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব দর্শন, তন্ত্র-পুরাণ, দেব-দেবীর পূজা প্রভৃতি বিষয়ে বহুল তর্ক-বিতর্ক, তুলনা ও সমালোচনা চলিত। সকল প্রশঙ্গ, সকল আলোচনা পরিশেষে শ্রীরাঘবকৃষ্ণদেবে পরিসমাপ্ত হইত। নরেন্দ্রনাথ কথায় কথায় সম্পূর্ণ নূতন পথে গিয়া পড়িতেন ও সেখান হইতে

## স্বামী বিবেকানন্দ

দেখাইতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত বর্তমান হিন্দুজাতির উপর শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রভাব কতটা এবং সে প্রভাবের মূল্য কত। দেখাইতেন, যে ছিন্নমূল হিন্দুধর্ম বাত্যাভিত সমুদ্রবক্ষে কাণ্ডারীবিহীন জীর্ণতরীর স্থায় ক্রমাগত ভাসিয়া চলিতেছিল, পরমহংসদেবের চরণস্পর্শে সেই তরী এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে ও গন্তব্যাদিকনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছে। তিনি বলিতেন, “এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যেদিন তোরা বুঝতে পারবি যে, লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্মকে বাঁচাইবার জন্ত পরমহংসদেব কি করিয়াছেন!” এই সকল গুরুতর আলোচনার অবসরে মধ্যে মধ্যে গুরুগীতা, মোহমুগর বা ঐ জাতীয় অথবা কোন সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি বা প্রসাদ-সঙ্গীত, কি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত গান করা হইত।

স্বদেশ বা সমাজ সম্বন্ধে কথা উঠিলে হয়ত কয়েকদিন তাহাতেই কাটিয়া যাইত। হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসভ্যতার মূল কোথায়—সে-সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ একটি বেশ উদার ধারণা জন্মাইয়া দিতেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত প্রত্যেক শক্তিশালী ভারতসম্ভান কেমন করিয়া এদেশে জাতিগঠনের চেষ্টা করিয়াছেন ও তাহাতে কিরূপে ধীরে ধীরে জাতীয় জীবন গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহা তিনি আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া অতি বিশদভাবে বুঝাইতেন। ভারতীয় সভ্যতার ঐক্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এরূপ দৃঢ় ছিল যে, অনেকসময় মুসলমানজাতীয় কোন লোককে সম্মুখে দেখিবামাত্র শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিতেন। তাঁহার মনে হইত, সে ব্যক্তিও ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার একটি অঙ্গবিশেষ। অনেক সময় আবার স্বদেশের ইতিহাস ব্যতীত অন্যান্য জাতির ইতিহাসও আলোচিত হইত। তাহার মধ্যে গিবনের ‘রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতন’ এবং কালাইলের ‘ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস’ প্রধান।



## বরাহনগর মঠে তপস্শ্রা

উপরি উক্ত দানাদের ঘর ব্যতীত মঠে আর একটি ঘর ছিল, সকলে তাহার নাম রাখিয়াছিলেন কালী তপস্বীর ঘর। এই গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া কালী (স্বামী অভেদানন্দ) দিনরাত সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন। তিনি এক্রূপ নিবিষ্টচিত্তে অব্যয়ন করিতেন যে, সময়ে সময়ে দিব্যরস্তু হইতে নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত মুহূর্তের জ্ঞাত তাঁহার অধ্যয়নের বিরাম থাকিত না। অনেকদিন মঠের ভাতারা প্রাতঃকালীন ধ্যান-ধারণা-সমাপনান্তে এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন এবং স্বামীজীর সহিত বহু বিষয়ের আলোচনায় রত থাকিতেন, কখন বা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ঐক্লপ করিতেন। এক একদিন এক একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত ও ঐ প্রসঙ্গ উপর্যুপরি কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত চলিত। উদাহরণস্বরূপ এখানে দুই-একটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিব। মনে করুন, একদিন বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ উঠিল। মঠের সকলেই প্রথমে 'ললিত-বিস্তর' নামক পুস্তকখানি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিলেন, পরিশেষে তাঁহাদের মন পুস্তকোক্ত বিষয়ের চিন্তায় এক্রূপ মগ্ন হইয়া গেল যে, তাঁহারা বর্তমান ছাড়িয়া একেবারে অতীতে ডুবিয়া গেলেন, যেন অনুভব করিতে লাগিলেন যে ভগবান বুদ্ধদেবের সহিত বুদ্ধগয়া হইতে রাজগৃহে বা সারনাথে চলিয়াছেন, বা বোধিবৃক্ষের তলে তাঁহার সত্যলাভ বা নির্বাণদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ভগবান তথাগতের ত্যাগ-বৈরাগ্য তখন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাঁহারা কখনও তাঁহার চিত্তারোহণদৃশ্য অনুভব করিয়া যেন আনন্দাদি বুদ্ধশিষ্যের সহিত অবিরল অশ্রুবর্জিত করিতেছেন, কখনও বা বোধ করিতেছেন যেন কুশীনগরের মল্লরাজ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছেন, আবার কখনও বা মনে হইতেছে যেন নাগসেন অথবা মিলিন্দরাজের সহিত বৌদ্ধদর্শনের

## স্বামী বিবেকানন্দ

গভীর তত্ত্বালোচনার নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইরূপে তাঁহারা সম্রাট অশোকের শিলালিপি-ক্ষোদন, কারলী, এলিফাণ্টা ও অজন্তার গিরিগুহার বিচিত্র কারুকার্যবিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন, সারনাথের বিহার, নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রাধান্যকালের সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা ও কীর্তির সহিত আপনাদিগকে একীভূত করিয়া ফেলিতেন। বৌদ্ধকাহিনীর আলোচনায় তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী স্পন্দিত হইত। মহাবান, হীনবান প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহ ও নবপ্রকাশিত ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’ পুস্তক প্রভৃতি পাঠে তাঁহারা যেন আপনাদিগকে কতকগুলি বৌদ্ধ শ্রমণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এইভাবে কিয়দ্দিন চলিবার পর স্বামীজী তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ প্রভাব হইতে ধীরে ধীরে বিমুক্ত করিয়া দিন কয়েকের জন্ত হিন্দু অবতার, ভক্ত ও আচার্য্যগণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব-আলোচনায় নিয়োজিত করিতেন। রাম, কৃষ্ণ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, তুলসীদাস, রামদাস, চৈতন্য, রামপ্রসাদ, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনসমূহ একে একে ছায়াচিত্রের ছায়া তাঁহাদের নয়নসম্মুখে প্রতিভাসিত হইত, এবং কি করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের শক্তি ও প্রভাব পরম্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবাসীকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত ও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিত।

এইরূপে দেশকালপাত্রের গণ্ডী অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে তাঁহাদের কল্পনা সুদূর বেংলহাম নগর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইত এবং তাঁহারা সাধুশিরোমণি ঈশার জীবনলীলা আশ্রিত মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতেন। রাখালগণের নিকট দেবদূত কর্তৃক সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব-বার্তা-জ্ঞাপন হইতে ক্রুশবিন্দু অবস্থায় তাঁহার তনুত্যাগ পর্য্যন্ত তদীয় জীবনের সমগ্র ঘটনাবলী একে একে তাঁহাদের মানসপটে সমুদিত হইত।



## বরাহনগর মঠে তপস্কা

মনে করিতেন—তঁাহারা যেন বরাহনগরের উত্তানে উপবিষ্ট নহেন, খ্রীষ্ট-লীলাভূমি জেরুশালেমে উপস্থিত। মহর্ষি ঈশ্বর প্রতি স্বামীজী এরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন যে, কথিত আছে কোন সময়ে খ্রীষ্টজননী ম্যাডোনার (Sistine Madonna) একখানি চিত্র তঁাহার নিকট আনীত হইলে তিনি শিশু খ্রীষ্টের পাদম্পর্শ করিয়াছিলেন। আর এক সময়ে কোন খেতাব শিখা অবতারবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় বলিয়াছিলেন, “যদি আমি খ্রীষ্টের সময়ে প্যাালেষ্টাইনে জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে শুধু আমার নয়ন-ধারায় নহে, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত দ্বারা তঁাহার পাদপ্রক্ষালন করিতাম।”

এইরূপে উপযুগপরি করেক দিবস খ্রীষ্ট-আদর্শের আলোচনার অতিবাহিত হইলে সকলে পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিতেন। জ্ঞান ও প্রেমের সেই নিরবচ্ছিন্ন প্রস্রবণ—আদর্শের সেই অতুল্যত ধাম—সে কি বিস্মৃত হইবার?—কখনই নহে। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিত ও অবিরল নেত্রবারি নির্গত হইত, কখনও বা তঁাহার অপূর্ণ প্রেমকাহিনী হৃদয় প্রাণিত করিয়া সকলকে অতল প্রেমসিঙ্কুণীয়ে নিমজ্জিত করিত।

এইসময়ে মঠে সকল ধর্মের বড় বড় পর্বগুণি বখাবিহিত অনুষ্ঠান-সহকারে সম্পন্ন হইত। যেমন, বড়দিনের সময় একটি ধূনি জালিয়া সকলে ধূনির চতুর্পার্শ্বে অর্ধশায়িত অবস্থায় বীণুখ্রীষ্টের জন্মকথা, তঁাহার আবির্ভাববর্ত্তা-প্রচার ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেন। একবার তঁাহারা ‘গুডফ্রাইডে’র উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত বড় কৌতুকাবহ। সমস্ত দিবস উপাসনায় কাটিয়া গিয়াছে। আহার নামমাত্র—একপ্রকার উপবাস বলিলেই হয়, কারণ শুধু গোটাকতক আঙ্গুরের রস অলমিশ্রিত করিয়া সকলে এক এক চুমুক পান করিয়াছিলেন। সকলেরই

## স্বামী বিবেকানন্দ

হৃদয় ভাবাতিশয্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে দ্বারে একজন ইউরোপীয় অতিথির কণ্ঠ শুনা গেল, “কে আছ, খ্রীষ্টের দোহাই, দ্বার খোল।” আনন্দে আত্মহারা হইয়া দশ-পনের জন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন, সকলেই ব্যাকুল, একজন খ্রীষ্টানের মুখ হইতে ঐদিনের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন। কিন্তু লোকটি বলিল, “আমি Salvation Army (মুক্তিফৌজ)-এর লোক। Crucifixion (ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা)র কথা জানি, কিন্তু গুডফ্রাইডের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমরা ছুটি পূর্ব পালন করিয়া থাকি—একটি খ্রীষ্টের জন্মদিন, আর একটি জেনারেল বুথ-এর জন্মদিন।” সম্মাসীরা এই কথা শুনিয়া বিবগ্ন ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “সেকি, বেদিন তোমাদের প্রভু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন সেদিনের বিষয় তুমি কিছু জান না।” তাঁহারা আশাভঙ্গে এতদূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, পাদ্রী বেচারার হাত হইতে তাঁহার বাইবেলখানি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যায়, একটু পরে তাঁহাদেরই মধ্যে আর একজন সে লোকটির উপর দয়াপরবশ হইয়া অস্ত্র দ্বার দিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন এবং কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে দিয়া গোপনে তাঁহার পুস্তকখানি প্রত্যর্পণ করেন। তিনি তাঁহাদিগের ব্যবহারদর্শনে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া দ্রুতগতি মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “ইহারা কারা? দেখিয়া বোধ হয় যেন খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলী।”

কখনও কখনও নরেন্দ্রনাথ মঠের ভ্রাতাগণের নিকট সেন্ট ফ্রান্সিস ও সেন্ট ইয়েসিয়াস লয়োলার কাহিনী এবং যে ভাবে ফ্রান্সিসকান ও জেম্মাইট ধর্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তদবৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণনা করিতেন। আবার অনেক সময় ‘ঈশানুসরণ’ (Imitation of Christ) নামক পুস্তকের



## বরাহনগর মঠে তপস্যা

ভাব তাঁহাদের প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেন। এই পুস্তকখানি এসময়ে মঠের সকলেরই প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল, পরে উহার স্থান শ্রীমদভগবদ্গীতা অধিকার করে। ক্রমে ভগবদ্গীতার প্রতি তাঁহাদের এতদূর অনুরক্তি জন্মিয়াছিল যে তাহার মধুরত্ব অপরকে আন্বাদন করাইবার জন্য তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া ঐ গ্রন্থের কয়েকশত খণ্ড ক্রয় করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

ঐ বৎসর (১৮৮৭ খ্রীঃ অঃ) মঠে প্রথম শিবরাত্রিব্রত অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতে গঙ্গানানাস্তে সকলে নরেন্দ্রের নবরচিত ‘তাঁথৈয়া তাঁথৈয়া নাচে ভোলা’ গান ধরিলেন; তারপর সারাদিন উপবাসে ও রাত্রিটা পূজা-উপাসনায় কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে পূজাবকাশে নরেন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও উপদেশ এবং নৈশ-নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া সকলের সম্মুখে ‘শিব গুরু,’ ‘শিব গুরু’ বা ‘হর হর বম্ বম্’ ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে বিষম নৃত্য। সকলেরই গাত্রে ভ্রম্মবিলেপন ও নয়নে বৈরাগ্যের অনলাভ।—সে এক অপূর্ব দৃশ্য!

এইভাবে বরাহনগরের মঠে দিন কাটিতেছিল। অনেক সময়ে আবার মঠে একটি শব্দও শ্রুতিগোচর হইত না। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, শুধু মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকণ্ঠের মধুর ‘মা, মা ব্রহ্মময়ী’ শব্দ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিত। কখন কখন সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে একাকী বিষতলে গান গাহিতে গাহিতে তিনি অন্তরের নিভৃততম রাজ্যে চলিয়া বাইতেন—বাহুজগতের কোন ভাবই আর সেখানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না।

এতক্ষণ আমরা মঠের ভিতরের কথা বলিলাম, কিন্তু ক্রমে মঠের সন্ন্যাসীদিগকে আবার অনেক বাহিরের লোকের সংস্পর্শে আসিতে

## স্বামী বিবেকানন্দ

হইয়াছিল। স্বামী সদানন্দ বলিতেন, “সে সব কি গুলজারের দিনই গিয়াছে। এক মিনিট হাঁফ ছাড়িবার ঘো ছিল না। দিনরাত বাহিরের লোক আসা-যাওয়া করিতেছে। পণ্ডিতেরা আসিয়াছেন—ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে, কিন্তু স্বামীজী একমুহূর্তও তাহাতে কাতরতা, বিরক্তি বা ঔদাসীন্ম প্রকাশ করিতেন না। কি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞা, কি সাধারণ বিজ্ঞা—তিনি সর্বদা সকলবিষয় আলোচনার জন্ত প্রস্তুত থাকিতেন।

“বড় বড় পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। তাঁহারা সন্ন্যাসিগণের সহিত ধর্ম বা দর্শনাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত বচন ও শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া গৌড়ামির ভিত্তি বেশ পাকা করিবার জোগাড় করিতেছেন, এমন সময়ে স্বামীজী প্রবল যুক্তির অবতারণা করিয়া তাঁহাদের মতসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেন। তিনি দেখাইতেন যে, সংস্কৃত বিজ্ঞা বা শাস্ত্রের মূলসকল এদেশীয় লোকের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনের উন্নতি-অবনতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। দেশকে উপেক্ষা করিয়া, দেশবাসীর প্রাণের নিকট হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া শাস্ত্রকে দেখিলে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মবোধ হওয়া দুঃসাধ্য। শাস্ত্র কতকগুলি মনগড়া কাল্পনিক নিয়মমাত্র নহে, কিন্তু জাতির গঠন ও পরিপুষ্টিই তাহার মুখ্যতম উদ্দেশ্য।

“আবার যখন খ্রীষ্টিয়ান পাদরীরা আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের অসারত্ব-প্রতিপাদন-মানসে তর্ক জুড়িতেন তখন তাঁহাদের উৎপাত-নিবারণের জন্তও তাঁহাকে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত। কিন্তু সে ক্ষুরধার বুদ্ধির নিকট পাদরীরা অগ্রসর হইতে পারিবে কিরূপে? তাহাদের সকল বিতণ্ডা খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় ভাসিয়া যাইত। অবশেষে যখন তাঁহারা তর্কে বিধ্বস্ত হইয়া পরাজয়-স্বীকারের উপক্রম করিতেন, তখন আবার স্বামীজী



## বরাহনগর মঠে তপস্য়া

তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঙ্গন ভাষায় খ্রীষ্টদয়্যের অদ্ভুত প্রেমের অপূৰ্ণ ব্যাখ্যা করিতেন।”

কিন্তু সন্ন্যাসীদের কৰ্ম্মশীলতা শুধু পঠন-পাঠন, তর্ক-আলোচনাতেই নিবদ্ধ ছিল না। আরও একটি জিনিষের অঙ্গুর এখন হইতে দেখা দিয়াছিল। সেটি হইতেছে সেবাস্বৰ্ণ। বর্তমানে এই সেবাকার্য্য রাম-কৃষ্ণদেবের শিষ্যমণ্ডলী কর্তৃক বেশ ব্যাপকভাবে অগুষ্ঠিত হইতেছে। তখন ইহা এতটা দেশব্যাপী হয় নাই বটে, কিন্তু তখনও স্বামীজীর উপদেশে এইসকল সন্ন্যাসীরা নিজেরা না খাইয়াও ক্ষুৎকাতর দরিদ্র ও অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে আহার করাইতেন এবং গৃহী গুরুভ্রাতাদিগের পীড়া বা বিপদের সময়ে প্রাণপণে সেবা-শুশ্রূষা ও সাহায্য করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন কি কুষ্ঠরোগীর পর্য্যস্ত শুশ্রূষা করিতে কুষ্ঠাবোধ করিতেন না।

## পরিব্রাজকবেশে

মঠ স্থাপিত হইল বটে কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীরা অধিক দিন একত্রে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে নির্জ্ঞন বাসের ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। বাস্তবিক হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের চিরন্তন অভ্যাস ও প্রথা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হওয়া এবং তীর্থভ্রমণ সমাপ্ত হইলে নির্জ্ঞনে বসিয়া একাকী ঈশ্বরচিন্তায় আপনাকে নিমুক্ত করা। জাতীয় জীবনের এই যে একটা ধারা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাকে উপেক্ষা বা উল্লঙ্ঘন করা বড় সহজ নহে। ইহা যেন এদেশের লোকের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মঠ স্থাপিত হইলেও মঠবাসী সন্ন্যাসীদের পর্যটনম্পৃহা দূর হইল না। গৃহীদের মত এক স্থানে জীবন কাটাইবার সংকল্প লইয়া বেশ গোছাইয়া সংসারবাঁড়া-নির্বাহ ইহাদিগের দ্বারা হইয়া উঠিল না। তাই দেখিতে পাই যে পরমহংসদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক জন অন্নবয়স্ক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত প্রায় বৎসরাবধি বৃন্দাবনধামে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। যোগানন্দ, লাটু প্রভৃতি এই দলের। মঠস্থাপনের কয়েক মাস পরে সারদা (স্বামী ত্রিগুণাভীত) প্রথম মঠ হইতে নিরুদ্দেশ হন। সে সময়ে মঠাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ছিলেন। তিনি আসিয়া যখন সারদার নিরুদ্দেশবার্তা শ্রবণ করিলেন তখন তাঁহার চিন্তা অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ তিনি জানিতেন সারদা সংসারানভিষ্ট বালকবিশেষ, এই হঠকারিতার জ্ঞাত্য তাহাকে অনেক ভুগিতে হইবে। তিনি রাখালকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, “রাজা, তুই তাকে যেতে



## পরিব্রাজকবেশে

দিলি কেন? দেখে দিকি কি মুন্সিলেই পড়া গেল। ছোড়াটা যে ভারি ভাবিয়ে তুললে! এ আবার বেশ এক মায়ার সংসারে বাঁধা পড়েছি দেখছি।' কথাগুলি বাস্তবিক বড় সত্য। নরেন্দ্র গুরুভ্রাতাদিগের স্নেহজালে এতটা জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র ক্রেশভোগ হইবে এ চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিতেন, তাঁহার মনে হইত তাহাদিগের ক্রেশভোগের জন্য প্রকৃত দায়ী তিনি, কারণ ঠাকুর যে তাঁহারই উপর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক খানিক অনুসন্ধানের পর সারদার হস্তলিখিত একখণ্ড পত্র পাওয়া গেল, তাহাতে লেখা ছিল :—

“আমি হাঁটিয়া বৃন্দাবনে চলিলাম, এখানে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নহে, কারণ মনের গতি বদলাইয়া বাইতে পারে। আগে বাপ মা ও বাড়ীর সকলের স্বপন দেখতাম, তারপর মায়ার মূর্তি দেখলাম। ছবার খুব কষ্ট পেয়েছি, বাড়ী ফিরে যেতে হয়েছিল, তাই এবার দূরে যাচ্ছি। পরমহংসদেব আমার বলেছিলেন, ‘তোমার বাড়ীর ওরা সব করতে পারে; ওদের বিশ্বাস করিসনে।’ ”

রাখাল মহারাজ বলিলেন, “দেখচো, এই সবেমাত্র সে চলে গেছে।” কিঞ্চিৎ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, “আমি নিজেও মনে করছি একবার তীর্থভ্রমণে বেরুবো।” নরেন্দ্র তাহাকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, “হাঁ, তা যাবে বৈকি! ঐ রকম ভবঘুরের মত বেড়ালেই ভগবান শরীরে দেখা দেবেন আর কি!” মুখে এইরূপ বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের প্রাণটাও এখন হইতে পর্যটনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তবে পাছে সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে মঠটি ভাঙ্গিয়া যায়, তাই অন্তরের ইচ্ছা অন্তরেই নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু ক্রমে যত দিন

## স্বামী বিবেকানন্দ

যাইতে লাগিল ততই ঐ সংকল্পটা দৃঢ় হইয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। তিনি আর তাহা অপরের নিকট হইতে চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কথায় বার্তায় ভিতরের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। মহৎ ব্যক্তির হৃদয়ের বেগ অতিশয় প্রবল। একবার মনে উচ্চ সংকল্পের উদয় হইলে ক্রমে তাহার গতি একরূপ অপ্রতিহত হইয়া উঠে যে তাহার সম্মুখে জগৎ সংসার সব ভাসিয়া যায়। নরেন্দ্রেরও ঠিক তাহাই হইল। অন্তর্নিরুদ্ধ মনোভাব সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় ত্রায় সবলে বহির্গত হইয়া পড়িত। সে হৃদয়বেগ সন্দর্শনে গুরুভ্রাতার শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। ক্রমে ক্রমে মঠের সকল সন্ন্যাসীর মধ্যে তাঁহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা একে একে মঠ ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে মঠবাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়িল। স্বামীজীও মাঝে মাঝে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারি মাস ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার মঠে আসিতেন। কিয়দ্দিন থাকিয়া আবার পর্যটনে বাহির হইতেন। কিন্তু সকলে চলিয়া গেলেও শশী মহারাজকে কেহ মঠ ত্যাগ করাইতে পারিল না। তিনি একনিষ্ঠ সাধকের ত্রায় দুই চারি জনকে লইয়া ঠাকুরের দেহাবশেষ সাবধানে রক্ষা এবং নিয়মমত নিত্য সেবা ও পূজাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে স্বামীজী নিজের বলিয়াছেন, “আমি সকলের প্রাণে আগুন জ্বালিয়েছিলুম—সকলকে মঠ ছাড়িয়ে ভিক্ষাবলী সন্ন্যাসী করেছিলুম—পারিনি শুধু শশীকে। শশীকে জান্‌বি—মঠের মেরুদণ্ডস্বরূপ।”

বাস্তবিক ক্রমে মঠের সহিত একমাত্র শশী মহারাজেরই অতি নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিল। আর সকলের নিকট উহা একটা সাময়িক



## পরিব্রাজকবেশে

ডেরার মত হইয়া দাঁড়াইল। এদিক ওদিক ঘুরিয়া যখন শ্রান্তি বোধ হইত তখন দিনকতকের জন্ত তাঁহার মঠের আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেন।

প্রথম প্রথম স্বামীজী দিনকতকের জন্ত অদৃশ্য হইতেন। আজ বৈজ্ঞানাথ, কাল সিমুলতলা এই ভাবে এক একটা স্থানে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া আসিতেন; অবশ্য প্রত্যেকবারেই বলিয়া যাইতেন, 'এই শেখ, আর ফিরছি না,' কিন্তু প্রত্যেকবারেই কোন না কোন কারণে তাঁহাকে অনিচ্ছাসম্বন্ধেও মঠে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার একাকী ভ্রমণের সাধ পূর্ণ হইয়াছিল—এ সময়ে তিনি কোথায় থাকিতেন কেহ তাহার সন্ধান জানিত না বা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না। পরমহংসদেবের তিরোভাবের পর চারি বৎসরকাল (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত) তিনি গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই অর্থাৎ হয় বরাহনগর মঠে ছিলেন, না হয় গুরুভ্রাতাদের কাহাকেও না কাহাকেও সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৯১ সালের প্রথম হইতে তিনি গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিলেন। মহানগরী দিল্লীতে সেই যে বিচ্ছেদ হইল, সেদিন হইতে আর কেহ তাঁহার ভ্রমণের সাথী হয় নাই। অবশ্য কোন কোন গুরুভ্রাতা ভ্রমণকালে তাঁহার সন্ধান করিতে ক্রটি করেন নাই—কিন্তু তিনি প্রায়ই স্বীয় নাম ও পরিচয়াদি পরিবর্তন করিতেন, সুতরাং হঠাৎ তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ ছিল না।

এইরূপ অবস্থায় দুই তিন বার মাত্র তাঁহার গুরুভ্রাতৃবর্গের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়, এবং ঐ কয়েকবারই তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ তিরস্কার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামীজীর

## স্বামী বিবেকানন্দ

প্রব্রজ্যাকালের ইতিহাস অতি কোতূহলজনক। তিনি যতদূর সম্ভব, আপনার অতুল বিদ্যাবুদ্ধি গোপন করিয়া সাধারণ সাধুর ত্রায় ভ্রমণ করিতেন। এমন কি তিনি প্রকাশ না করিলে কেহ তাঁহাকে দেখিয়া বা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিতে পারিত না যে তিনি এক অক্ষর ইংরেজী জানেন। অনেক সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করিতেন, 'কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিব না; যখন আপনি জুটবে তখন থাইব।' ইহার ফলে সময় সময় তাঁহাকে একাদিক্রমে পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে হইয়াছে, ইহা তাঁহার নিজস্ব মুখে ব্যক্ত। কতদিন পথিপার্শ্বস্থ ভগ্ন দেবালয়ে বা ধর্মশালার অথবা ঝোপ-জঙ্গল ও পর্বতগুহার কাটিয়াছে। আবার এমন দিনও গিয়াছে যেদিন মাথা গুঁজিবার স্থান হয় নাই, উন্মুক্ত আকাশতলে বর্ষা ও শিশিরসম্পাতের মধ্যে অথবা প্রচণ্ড রৌদ্রে অগ্নিতপ্ত বালুকাভূমির উপর কাটিয়াছে। পরিধানে গৈরিকবাস ও গৈরিক আলখেল্লা, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু, সম্বলের মধ্যে একখানি গীতা। এইভাবে রাজেন্দ্রগমনে সেই দীপ্ত-বিশালনয়ন, অনুপমকান্তিবীরবপু সন্ন্যাসী ভিক্ষার সংগ্রহ ও তীর্থপর্যটনের জন্ত 'নারায়ণ হরি' বলিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন।

কয়েকটি কাছাকাছি স্থানে অল্পদিনের জন্ত ছুই চারি বার গমনাগমনের পর ১৮৮৮ সালে স্বামীজী পর্যটন-সংকল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্বপ্রথম ৮কাশীধাম যাত্রা করিলেন; জীবন ধারণের জন্ত তিনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অল্প কিছু সঙ্গে লইলেন না। কাশীধামে তিনি বিবেক, বীরেশ্বর ও অন্যান্য দেবমূর্তি সন্দর্শন করিয়া একদিন সারনাথেও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে সারনাথের স্তূপ ও মঠের ভগ্নাবশেষ অধিকাংশ বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদিন প্রাতঃকালে তিনি দুর্গাবাড়ীর মন্দিরাভি



## পরিত্রাজকবেশে

মুখে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে একদল বানর তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিল। এই সকল বানর সময়ে সময়ে নিরীহ লোকের উপর নিতান্ত অত্যাচার করিয়া থাকে। স্বামীজী তাহা জানিতেন, সেইজন্য তাহাদিগের ঐরূপ ভাব দর্শনে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন; তাহারাও পূর্বাপেক্ষা দ্রুতগতি তাঁহার অনুসরণ করিল। তখন তিনি কিষ্কিণ্ড উদ্বিগ্নভাবে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। উন্নত বানরদলও তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিল। তাহারা প্রায় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে এমন সময় এক ব্যক্তি পশ্চাৎ হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ‘খামো খামো, বানরদের সামনে দাঁড়াও!’ সহসা এই বাক্যশ্রবণে স্বামীজীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ফিরিয়া আসিল। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া বানরদিগের সম্মুখীন হইলেন। অমনি ভীষণবেগে ধাবমান পশুসমূহ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল ও পরমুহূর্ত্তে ভীতভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের এবংবিধ ভাবপরিবর্ত্তন-দর্শনে তিনি মনে মনে খুব হাসিতে লাগিলেন, কিষ্কিণ্ড পরে এক বুদ্ধ সন্ন্যাসী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাदन করিলেন, তিনিও প্রত্যভিবাदन করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বামীজী বুঝিলেন ইহারই উপদেশমত কার্য্য করাতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তিনি আমেরিকায় একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, ‘So face Nature. Face ignorance. Face illusion Never fly!’ অর্থাৎ এইরূপে প্রকৃতি, অবিজ্ঞা ও মায়ী, সর্ব্বদা ইহাদিগের সম্মুখীন হইবে—কদাচ ইহাদের ভয়ে ভীত হইয়া কাপুরুষের ত্রায় পলায়ন করিবে না।

দ্বারকাদাসের আশ্রমে অবস্থানকালে ৬কাশীধামের অনেক পণ্ডিত ও

## স্বামী বিবেকানন্দ

সাধুব্যক্তির সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এইখানেই প্রসিদ্ধ মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত হিন্দুদিগের বিভিন্ন আদর্শের গুণাগুণ সম্বন্ধে তাঁহার বহুক্ষণ আলাপ হয়। আলাপান্তে ভূদেব বাবু বলিয়াছিলেন, “অদ্ভুত! এই বয়সে এতদূর জ্ঞান ও বহুদর্শিতা! ইনি কালে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইবেন সন্দেহ নাই।”

এই সময়েই তাঁহার ভাগ্যে ভারতবিশ্রুত ত্রৈলোক্য স্বামীর দর্শনলাভ ঘটে। সকলেই জানেন, ত্রৈলোক্য স্বামী শেষ অবস্থায় কাহারও সহিত বাক্যানাপ করিতেন না। বিশেষ আবশ্যক হইলে কখন কখন ইঙ্গিতে মাটিতে লিখিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বহু বর্ষ পূর্বে পরমহংসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ আছে কিনা?’ তাহাতে তিনি সঙ্কেতে বুঝাইয়াছিলেন যে, বতদিন ভেদবোধ আছে ততদিন পৃথক, ভেদবোধ রহিত হইলে ছই-ই এক। স্বামীজী ত্রৈলোক্য স্বামীকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার পদমূলি গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখান হইতে তিনি ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট গমন করিলেন। এই মহাপুরুষ পরম যোগী ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় আশ্রমে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান করিতেন। স্বামীজী অতিশয় শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কথায় কথায় কামকাঞ্চন-ত্যাগের বিষয় উঠিল। ভাস্করানন্দ বলিলেন, “কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারে কি না সন্দেহ।” স্বামীজী বলিলেন, “কি বলেন মহাশয়! সন্ন্যাসধর্মের মূল ভিত্তিই যে ওই!” তাহাতে ভাস্করানন্দ ঈষৎ হাস্ত করিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, “তোম্ লেড়কা হো কা জান্তা?” স্বামীজী তৎক্ষণে বলিয়াছিলেন, “আমি নিজে এক্ষণ



## পরিত্রাজকবেশে

লোক প্রত্যক্ষ করিয়াছি।” ভাস্করানন্দ তাহা অবিস্মৃত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উভয়ের মধ্যে তুল তর্কবিতর্ক হইয়াছিল।<sup>১</sup>

কাশী হইতে অযোধ্যা হইয়া তিনি আগ্রার গমন করিলেন। পথে বরাবর ভিক্ষাই অবলম্বন ছিল। আগ্রার তাজ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিতেন, ‘ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ পর্য্যন্ত এক এক দিন ধরিয়া দেখিবার যোগ্য এবং সমগ্র সৌখ্যটি স্বার্থভাবে দেখিতে হইলে অন্ততঃ ছয় মাস সময়ের প্রয়োজন।’ আগ্রার দুর্গদর্শনেও তাঁহার ইতিহাস-রহস্যজ্ঞ হৃদয়ে নানাবিধ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। আগ্রা হইতে তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে এক কপর্দক নাই। পথপর্য্যটনে ক্লান্ত ধূলিধূসরিত দেহে তিনি বৃন্দাবনের সন্নিকটে পৌছিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি মহা আরামে ধূমপান করিতেছে। ক্ষুৎপিপাসাকাতর স্বামীজী তাহার নিকট হইতে কলিকাটি চাহিবামাত্র লোকটি নিতান্ত ত্রস্তভাবে বলিল, “মহারাজ, হাম্ ভঙ্গী (অর্থাৎ মেথর) ছায়া।” স্বামীজী একথা শ্রবণে নিরাশচিত্তে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কিম্বদন্তু বাইবামাত্র তাঁহার মনে হইল,

---

১ ইহার কয়েক বর্ষ পরে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও তাহারও কিঞ্চিৎ পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সহিত ভাস্করানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্য ও গুরুতাই জানিতে পারিয়া বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর দর্শনলাভের জন্ত অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও কিন্তু তিনি জানিতেন না যে এই বিবেকানন্দই সেই বালক, যাহার সহিত পূর্বে একদিন তাঁহার ঐক্লপ মতভেদ ও বচসা হইয়াছিল। শারীরিক অসুস্থতা ও অস্বাস্থ্য কারণ-বশতঃ স্বামীজী আর তাঁহার সহিত দেখা করিবার সুযোগ পান নাই, তবে তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

“কি! সারাজীবন আত্মার অভেদ বিচার করিয়া শেষে জাতিভেদের পাকে পড়িলাম! ছি ছি, এখনও সংস্কার!” এই ভাবিয়া তিনি প্রায় এক পোয়া পথ হাঁটিয়া পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন লোকটা তখনও বসিয়া আছে। নিকটে গিয়া বলিলেন, “বেটা, হামকো জলদী একঠো ছিলাম ভোরকে দো।” সে পূর্ববৎ বলিল, “মহারাজ, আপ সাধু ছায়, ময়্য ভঙ্গী হু।” কিন্তু স্বামীজী তাহার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। লোকটি অগত্যা সেই কলিকায় তামাকু সাজিয়া তাঁহাকে দিল। তিনি আনন্দের সহিত উহা সেবন করিতে লাগিলেন। গিরিশ বাবু স্বামীজীর মুখে এই গল্প শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, “তুই গাঁজাখোর, তাই নেশার ঝোঁকে মেথরের কল্কে টেনেছিলি।” তদন্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “না, জি. সি., সত্যই আমার নিজেই পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল। সন্ন্যাস নিয়ে পূর্ব সংস্কার দূর হয়েছে কি না, জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কি না, পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করা মহা কঠিন, কথায় ও কাজে এক চুল এদিক ওদিক হবার ষো নেই।”

বুন্দাবনে কয়েক দিন (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই হইতে ২০শে আগষ্ট) কাটিবার পর স্বামীজীর মনে নিকটবর্তী গ্রামসমূহ দেখিবার ইচ্ছা হইল, কারণ ব্রজভূমির সব স্থানই পবিত্র। গোবর্দ্ধনগিরি পরিক্রমকালে তিনি সংকল্প করিলেন, কাহারও নিকট হইতে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন না। প্রথম দিবস মধ্যাহ্নে অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইল, তারপর সুখলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কিন্তু ক্ষুধায় ও পথপর্যটনে অবসন্নপ্রায় হইলেও তিনি কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিলেন না, রাধারমণের মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলেন। বাইতে বাইতে সহসা



## পরিব্রাজকবেশে

শুনিলেন কে যেন পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ক্রমাগত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই স্বর ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইল। তখন তিনি ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। সে লোকটিও ছুটিল এবং প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দৌড়াইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার সঙ্গে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী, সে স্বামীজীকে উহা গ্রহণ করিবার জন্ত মিনতি প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বামীজী এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়ে পরিপ্লুত হইলেন এবং নারায়ণের অপার করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় আদ্র হইয়া উঠিল।

গোবর্দ্ধন হইতে তিনি রাধাকুণ্ডে গমন করিলেন। এখানেও এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। একখানি মাত্র কোপীন থাকাতে তিনি কোপীন-খানি প্রথমে কুণ্ডের জলে বুইয়া উহার ধারে রাখিলেন ও পরে উল্লঙ্গ অবস্থায় স্নানের জন্ত কুণ্ডমধ্যে অবতরণ করিলেন; স্নানান্তে দেখিলেন কোপীনখানি আর সেস্থানে নাই, কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন এক বানর কোপীনখানি লইয়া একটি বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আছে। তিনি বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া বানরটির দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে শুধু তাহার দম্ভশ্রী প্রদর্শন করিল—কোপীনটি ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাক, উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। স্বামীজী অনেক হাস্যামা করিয়া বানরের নিকট হইতে উহা ফিরাইয়া পাইলেন বটে, কিন্তু উহা তখন বানরের অত্যাচারে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় পরিণত। বাহা হউক, স্বামীজী তখন কুণ্ডাদিষ্টাঙ্গী দেবতা শ্রীমতী রাধারাগীর প্রতি ঘোর অভিমানভরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে এখন হইতে তিনি লোকালয়ে যাইবেন না, জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন দেবী বাস্তবিক ভক্তের যোগ-ক্ষেম বহন করেন কি না। এই স্থির করিয়া তিনি পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের

## স্বামী বিবেকানন্দ

অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। স্বামীজী প্রথমে তাহার কথার কর্ণপাত না করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলেন, সে ব্যক্তি স্বামীজীর নাগাল পাইবার জন্য দৌড়াইতে লাগিল, স্বামীজীও দৌড়াইতে লাগিলেন। শেষে সে ব্যক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিজগৃহে লইয়া গিয়া সমস্ত খাওয়াইল ও নূতন বস্ত্র প্রদান করিল এবং তাহার গৃহে থাকিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল।

এইসকল ঘটনা হইতে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে তিনি প্রভুর অনুগ্রহ হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত হন নাই।

বৃন্দাবন হইতে বাহির হইয়া স্বামীজী উত্তরাখণ্ডে হাতরাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতরাস ষ্টেশনের এক কোণে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, অনাহারে ও পরিশ্রমে দেহ মন অত্যন্ত ক্লান্ত—এমন সময় এসিষ্ট্যান্ট ষ্টেশন মাস্টার শরৎ গুপ্ত কার্য্যোপলক্ষে সেই দিকে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। শরৎ গুপ্ত লোকটি বড় সুন্দর। ছেলেবেলা হইতে জোনপুরের মুসলমানদের মধ্যে বাস করিয়া বাঙ্গালা অপেক্ষা উর্দু ও হিন্দুস্থানী শীঘ্র বলিতে পারিতেন এবং চরিত্রটিও বেশ অকপট ও পুরুষোচিতগুণভূষিত ছিল। প্লাটফর্মের উপর দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল, একজন সন্ন্যাসী আসনপিড়ি হইয়া ষ্টেশনের এক পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, ‘বাঃ, এমন চমৎকারমুষ্টি সাধু ত কখনও দেখি নি!’ তিনি স্বামীজীর দর্শনলাভে প্রকৃতই আনন্দলাভ করিলেন এবং ভরিতপদে তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন, “আপনাকে ক্ষুধিত বলিয়া বোধ হইতেছে।” স্বামীজী নাতি-উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিলেন, “হাঁ, আমি ক্ষুধিতই বটে।”



## পরিব্রাজকবেশে

“আচ্ছা, আপনার জ্ঞান কি আনিব ?”

“যা হোক কিছু নিয়ে এস ।”

অল্পক্ষণের মধ্যে শরৎ বাবু বাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহাতেই স্বামীজীর আহ্বারের আয়োজন করিলেন । স্বামীজী বহুদিন যাবৎ যৎসামান্য ভোজনেই তৃপ্ত ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাহারও অভাব হওয়াতে ক্ষুধার মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন । এক্ষণে ভক্তপ্রদত্ত নানাবিধ আহাৰ্য্য-সামগ্রী পাইয়া পরিতোষসহকারে ভোজন করিলেন ।

দৈনিক কার্য্য সমাপ্ত হইলে শরৎ বাবু সাবুটিকে ভাল করিয়া দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন । তিনি বলিতেন, স্বামীজীর চক্ষুই তাঁহাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং প্রথম দর্শনেই স্বামীজীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল । তিনি স্বামীজীকে দিন কতক হাতরাসে থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং তারপর বলিলেন, “আমায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিন ।”

স্বামীজী উত্তরচ্ছলে একটি গান গাহিয়াছিলেন, সেটি মালিনী সুন্দরকে বলিয়াছিল—

“বিজ্ঞা যদি লভিতে চাও,

চাঁদযুখে ছাই মাখ,

নইলে এই বেলা পথ দেখ ।”

শ্রবণমাত্র শরৎ বাবু বলিলেন—“স্বামীজী, আপনি বাহাই বলিবেন তাহাই করিতে স্বীকৃত আছি । আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আপনার সহিত বাইতে প্রস্তুত ।”

স্বামীজী তাঁহার নিম্‌স্বহভাবদর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু তখন কিছু বলিলেন না ।

## স্বামী বিবেকানন্দ

কথায় কথায় ব্রজেন বাবু বলিয়া একজনের নাম শুনিয়া তাঁহার মনে হইল—ইনি কলিকাতায় ছিলেন ও তাঁহার পরিচিত। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রজেন বাবুর বাসায় গমন করিলেন ও দেখিলামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। ব্রজেন বাবু তাঁহার আগমনে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কয়েক দিবস নিজের বাসায় থাকিবার জ্ঞাত্ত্ব অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী তাহাতে সম্মত হইলেন ও কয়েক দিন পরে পুনরায় শরৎ বাবুর বাসায় ফিরিয়া যাইবার অঙ্গীকার করিলেন। ব্রজেন বাবুর বাসায় অবস্থানকালে ওখানকার বাঙ্গালীটোলার সমুদয় লোক তাঁহাকে দেখিবার জ্ঞাত্ত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঠিক এই সময়টা বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশ একটা দলাদলি ও মনোমালিগ্ন চলিতেছিল, কিন্তু তাঁহার সংস্পর্শে সে-সকল অন্তহিত হইল। তাঁহার মুখে ধর্ম, দেশ ও জাতি সৃষ্টি প্রাণস্পর্শী কথাবার্তা শুনিয়া ব্রজেন বাবুর বাসায় উত্তরোত্তর অধিকতর লোকসমাগম হইতে লাগিল। স্বামীজী শরৎ শুগু ও নটুকু বলিয়া শরৎ বাবুর এক বন্ধুর বাটীতে প্রায়ই যাইতেন। ইঁহারা দুইজনে ক্রমশঃ তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিলেন ও নিজ নিজ বাসায় তাঁহাকে রাখিবার জ্ঞাত্ত্ব অতিশয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আগ্রহ-দর্শনে স্বামীজী অগত্যা কিছুদিন তাঁহাদের নিকট রহিলেন। সেখানেও অনেক গণ্য ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার কথাবার্তা ও সঙ্গীতশ্রবণের জ্ঞাত্ত্ব যাইতেন।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া স্বামীজী বলিলেন, “আর আমি এখানে থাকিতে পারিতেছি না। সন্ন্যাসীর একস্থানে অধিকদিন থাকা উচিত নয়, আর এখানে থাকতে থাকতে ক্রমে তোমাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছি, এটা ভাল নয়।” সকলেই তাঁহাকে এ সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বলিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, “তোমরা আমার পীড়াপীড়ি



## পরিব্রাজকবেশে

করিও না।” তাঁহার হ্রিসংকল্প দেখিয়া শরৎ বাবু অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্বামীজীকে অতি নিকট আত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে জোনপুরের মুসলমান বন্ধুগণের নিকট সুফীদিগের ধর্ম-সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন। স্বামীজীকে দেখা অবধি তাঁহার মনে হইতেছিল ইনি বেন সুফীদিগের বর্ণিত প্রেমের জীবন্ত আদর্শ। এক্ষণে তাঁহাকে গমনোচ্ছত দেখিয়া তিনি বলিলেন, “স্বামীজী, আপনি আমার আপনার শিষ্য করিয়া লউন।” স্বামীজী এ সময়ে শিষ্যগ্রহণের কল্পনাও করেন নাই এবং সহসা কোন শিষ্য গ্রহণ করা উচিত কি না সে সম্বন্ধেও তাঁহার কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল। সুতরাং শরৎ বাবুর প্রস্তাবে তিনি স্পষ্ট কোন জবাব না দিয়া বলিলেন, “কি দরকার? আমার শিষ্য হইলেই যে অধ্যাত্ম জগতের সব জিনিস তোমার করতলগত হইবে তাহা নহে। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, এইট মনে রাখিও। তাহা হইলেই তোমার উন্নতি হইবে। মধ্যে মধ্যে তোমার সহিত দেখা হইবে।” কিন্তু শরৎ বাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-উপরোধ করিতে লাগিলেন ও অবশেষে বলিলেন, “স্বামীজী, আপনি যাহা হয় অনুমতি করুন, আমি করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি আপনার সঙ্গে বেথান ইচ্ছা যাইতে বলুন, আমি আপনার অনুগমন করিতে সম্মত আছি।” স্বামীজী তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া ঈষৎ কৌতূহলপূর্ণ স্বরে বলিলেন, “তুমি সত্যই আমার সহিত যাইতে প্রস্তুত আছ?” শরৎ বাবু সম্মতিসূচক উত্তর প্রদান করিলে তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, তাহা হইলে আমার ওই ভিক্ষাপাত্রটি গ্রহণ করিয়া ষ্টেশনের কুলিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আন দেখি।” আদেশপ্রাপ্তিমাত্র শরৎ বাবু নিজ অধীনস্থ কুলিদিগের

## স্বামী বিবেকানন্দ

নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। স্বামীজী তদর্শনে প্রচুর আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই শরৎ বাবু কেশের ভার অপর একজনের উপর আপাততঃ দিয়া স্বামীজীর সহিত হবীকেশ যাত্রা করিলেন।

গৃহস্থে অভ্যস্ত সদানন্দ (স্বামীজী শরৎ বাবুকে পরে এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন) শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, সন্ন্যাসীর জীবন বড় কঠোর। সন্দানন্দ স্বামী এই সময়কার বৃত্তান্ত এইরূপ বলিতেন, “এক দিন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া আমার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে দিন নিশ্চিত আমি মরিताম। কিন্তু স্বামীজীকে কি মেহ! তিনি আমার ধরিয়া ধরিয়া কতকদূর লইয়া গিয়া সেদিন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। আর একদিন একটি পার্কত্যা নদী পার হইয়া যাইতে হইবে। আমরা একজনের নিকট হইতে একটি ঘোড়া ষোগাড় করিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নদীটি অতিশয় বেগবতী ও তলদেশ ময়ূণ-উপলাচ্ছাদিত। পদস্থলন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আর, একবার পদস্থলন হইলে মৃত্যু অবধারিত। আমি ঘোটকের উপর যাইতে লাগিলাম, স্বামীজী সহস্রের তার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে দুই-চারি বার এমন হইল যে ভাবিলাম বুঝি আর ঘোড়া রাখা যায় না। কিন্তু অসমসাহসী ও স্নেহার্জহদয় স্বামীজী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও সেইভাবে ঘোড়া গুরু আমাকে পার করিলেন। কেমন করিয়া তাঁহার প্রেম ও ভালবাসার বর্ণনা করিব? তিনি যেন প্রেমের অবতার ছিলেন। আর একবার আমার অত্যন্ত অস্থখ হইয়াছিল। তিনি আমার সমুদয় জিনিসপত্র, এমন কি জুতাঘোড়াটা পর্য্যন্ত বহিয়া



## পরিব্রাজকবেশে

লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে মনে এতটা বল ও সাহস থাকিত যে মৃত্যুও ভুচ্ছ বোধ হইত। একদিন পথে বাইতে বাইতে দেখা গেল একস্থানে কতকগুলি মনুষ্যের অস্থি ও তাহার আশে পাশে গেরুয়া কাপড়ের টুকরা পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামীজী ঐগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'সদানন্দ, দেখ এখানে একজন সন্ন্যাসীকে বাঘে মারিয়াছে। ভয় হচ্ছে?' আমি উত্তর করিলাম, 'আপনি সঙ্গে থাকিলে কিসের ভয়?' "

হৃদ্যকেশে স্বামীজী ও তাঁহার শিষ্য সাধারণ সাধুদিগের দ্বারা থাকিতেন—ভজন, ভ্রমণ ও ধ্যান-ধারণাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহাদের আরও উত্তরে কেদার-বদরীর দিকে বাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সদানন্দ স্বামী হঠাৎ কঠিনপীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ায় পুনরায় হাতরাসে ফিরিতে হইল। তাঁহাদের হাতরাস প্রত্যাগমনে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কিন্তু এখানে আসিয়া স্বামীজীও পীড়ার কবলে পতিত হইলেন। আহাৰবিহারের অনিয়মে উভয়েরই শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর হৃদ্যকেশের জলবায়ু তত ভাল নহে, কারণ ওখানে ম্যালেরিয়া আছে। সুতরাং উভয়েই ভুগিতে লাগিলেন। এই সময়ে কোন স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্ভবতঃ বরাহনগর মঠে স্বামীজীর অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ কয়েকদিন পরেই তিনি গুরুভ্রাতাদিগের নিকট হইতে বরাহনগরে ফিরিয়া যাইবার জন্ত সান্ননয় অনুরোধসহ একখানা পত্র পাইলেন। সেই পত্রে আরও লিখিত ছিল যে, কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্যের জন্ত তাঁহার একবার কলিকাতায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। এই পত্র পাইয়া তিনি দুর্বলতা সত্ত্বেও কলিকাতা যাত্রা করিলেন এবং সদানন্দ স্বামীকেও

## স্বামী বিবেকানন্দ

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহার অনুগমন করিতে আজ্ঞা দিয়া গেলেন। স্বামীজী মঠে প্রত্যাগমন করিলে সকলেই অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। কয়েক মাস পরে সদানন্দ স্বামীও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামীজীর পুনরাগমনের সহিত মঠে আবার পূর্বভাব ফিরিয়া আসিল। ভ্রমণকালে তিনি যেসকল নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তৎসাহায্যে ভারতীয় সভ্যতার একত্ব তাঁহার সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, “রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে আপাত-বিচ্ছিন্ন ভারতখণ্ড আবার এক হইবে।” পূর্ববৎ মঠের ভ্রাতৃগণকে শিক্ষাদান আরম্ভ হইল। এইভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে যখন তিনি বুঝিলেন যে উপস্থিত তাঁহার আর মঠে থাকিবার প্রয়োজন নাই, তখন তিনি পুনরায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন।



## গাজীপুরের পওহারী বাবা

এবার স্বামীজী সর্বপ্রথমে গাজীপুরে উপস্থিত হইলেন। গাজীপুরের পওহারী বাবা একজন অসাধারণ বোণী ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাপুরুষসন্মানে ভারতের চতুর্দিকে পর্যটন করিতে করিতে সর্বপ্রথম তাঁহার সন্ধান পান। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে সেই কথা শ্রবণাবধি স্বামীজী পওহারী বাবার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর অনেকবার তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদিন পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। গাজীপুরে তিনি রায় গগনচন্দ্র রায় বাহাদুরের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এখানে অনেক লোক প্রত্যহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে আসিতেন। তিনিও সকলকে যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করিতেন। সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “পুরাতনের নিন্দা বা কঠোর সমালোচনা দ্বারা তাহার দোষসংশোধন হইতে পারে না। সংশোধনের প্রণালী স্বতন্ত্র। অসীম প্রেম ও সহিষ্ণুতা দ্বারা সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা সর্বোপযোগী। শিক্ষা দ্বারা ক্রমে সকলে আপনাপন অন্তরের মধ্যে বৃষ্টিতে পারিবে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। তারপর আপনা হইতেই মন্দটা ছাড়িয়া ভালটা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই শিক্ষা সর্বতোভাবে হিন্দুভাবে ভাবিত হওয়া আবশ্যিক। সকল বস্তু হিন্দুর চক্ষে, হিন্দুর দৃষ্টি লইয়া দেখা ও বুঝা উচিত। প্রকৃত শিক্ষা বাস্তবিক তাহাই, যদ্বারা হিন্দুর আদর্শ আমাদের চক্ষে আরও মহান ও গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। কারণ এইটা স্থির

## স্বামী বিবেকানন্দ

জানিও যে, হিন্দুধর্ম একটা প্রকাণ্ড ভুল নয়। ডুবিয়া দেখ, গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে অনুসন্ধান কর, তারপর বুঝিতে পারিবে কি অতলম্পর্শ সমুদ্রে এই হিন্দুধর্ম! বৈদেশিক শিক্ষার মোহে ভুলিও না। দেশটাকে বোঝ, জাতটাকে বোঝ; জাতীয় জীবনের গতি, বুদ্ধি ও প্রসার কোন্ দিকে, তার উদ্দেশ্য কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখী তাই দেখ। যখন নিজেদের ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিবে তখনই সব গোল মিটিবে।”

গগন বাবু তাঁহাকে মিঃ রস্ (Mr. Ross.) নামে একজন রাজপুরুষের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। রস্ সাহেব স্বামীজীকে হিন্দুপর্ব্বসমূহ, বিশেষতঃ হোলি ও রামলীলার ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গুটিকতক প্রশ্ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহাকে হিন্দুদিগের সামাজিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রশ্ন করেন। স্বামীজী এইসকল প্রশ্নের অতি সুন্দর সুন্দর উত্তর দিয়া সাহেবকে সমুদ্র ও হিন্দুধর্মের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; শুনা যায় হোলির তত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত সাহেবের জ্ঞান একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন। রস্ সাহেব তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ পেনিংটনের নিকট তাঁহাকে লইয়া যান। পেনিংটন সাহেব তাঁহার নিকট অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। স্বামীজী জলশ্রোতের তীর অনর্গল বাক্যশ্রোতে তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুধর্ম ও বোগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, হিন্দুধর্মের পুনরুদয়, ভারতের আধুনিক পরিবর্তনধারা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলি সবিশেষ যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীজীর কথাবার্তার একরূপ মুগ্ধ হন যে, তাঁহাকে বিলাতে যাইবার জ্ঞান অনুরোধ করেন ও সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। কর্ণেল রিভেট কার্ণাক (Rivett Carnac) নামক আর একজন স্বৈতাঙ্গ ভদ্রলোকের সহিতও এইসময়ে বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার



## গাজীপুরের পওহারী বাবা

দীর্ঘ আলোচনা চলিয়াছিল। কর্ণেল সাহেব তাঁহার অদ্বুত বিজ্ঞা ও বিচার-প্রণালী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বিশেষ আগ্রহসত্ত্বেও স্বামীজী এবার পওহারী বাবার দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন না। কারণ এই মহাপুরুষ এক উচ্চ-প্রাচীর-বেষ্টিত নির্জন উদ্যানমধ্যস্থ গুহার অভ্যন্তরে বাস করিতেন। উহার মধ্যে সাধারণের প্রবেশের কোন উপায় ছিল না। তিনিও বহুদিন হইতে বাহিরে আসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে একদিনও লোকের সম্মুখে আসেন নাই—ভিতরেই থাকিতেন, কি করিতেন কেহ জানিত না। ইচ্ছা হইলে কখন কখন দ্বারের আড়াল হইতে কথা বলিতেন। স্বামীজী তাঁহার মাস মাস সমাধিস্থ থাকার কথা ও অশ্রান্ত আরও অনেক বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার দর্শন না পাইয়া ক্ষুদ্রমনে বরাহনগরে ফিরিয়া গেলেন।

বরাহনগরে প্রত্যাগত হইয়া তিনি গুরুভ্রাতাগণের সহিত পওহারী বাবার পবিত্র জীবনকাহিনী আলোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত পওহারী বাবার ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতুলনীয় মহত্ত্ব ও স্মৃতিপথ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ এই সময়েই 'একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক একটি উক্তি গ্রহণ করিয়া তাহার উপর মোটা মোটা বই লিখিতে পারা যায়।" তাহাতে একজন গৃহী ভক্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কেমন করিয়া, বুঝাইয়া দাও দেখি।" স্বামীজী তত্ত্বরে বলেন, "তুমি তার যে-কোন উপদেশ বল, আমি বুঝাইয়া দিব।" তখন সেই ব্যক্তি ঠাকুরের মাহত-নারায়ণ ও হাতী-নারায়ণের গল্পটির উল্লেখ করিলে স্বামীজী তিন দিন ধরিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

১ স্বামী সারদানন্দ বলেন, এই ঘটনাটি বহু পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল।

## স্বামী বিবেকানন্দ

ইহার কিছুদিন পরে ( ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ) স্বামীজী বৈষ্ণনাথ-  
ধামে গিয়া কয়েক দিন অবস্থান করিয়া কাশীধামে বাইবেন মনে করিতেছেন,  
এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, স্বামী যোগানন্দ এলাহাবাদে সাংঘাতিক  
পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। শুনিবামাত্র স্বামীজী এলাহাবাদ যাত্রা  
করিলেন; এই স্থানে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ এবং পূর্বোক্ত  
সদানন্দ প্রভৃতি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সকলের অহোরাত্র যত্ন ও  
সেবায় যোগানন্দ স্বামী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে উপনীত হইলেন। তখন  
তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া স্বামীজী সকলকে ধর্মোপদেশ দিতে  
লাগিলেন। এই সময়েই একদিন তিনি একজন মুসলমান ফকিরবেশী মহা-  
পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। সে ব্যক্তির মুখের প্রত্যেক রেখাটি যেন বলিয়া  
দিতেছিল 'ইনি পরমহংস'। তাঁহাকে দেখিয়া স্বামীজী শঙ্করাচার্যের  
'বিবেকচূড়ামণি' হইতে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

“দিগম্বরো বাপি সান্বরো বা

স্বগম্বরো বাপি চিদম্বরঃ ।

উন্নত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা

পিশাচবদ্বাপি চরত্যবত্তাম্ ॥”

যোগানন্দ স্বামী আরোগ্যলাভ করিলে স্বামীজী কিছুদিন ৮কাশীধামে  
থাকিয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারীর শেষভাগে গাজীপুরে গমন করেন।  
এবার তিনি প্রথমে কিছুদিন তাঁহার বাণ্যসখা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়  
মহাশয়ের বাসায় ও পরে গগন বাবুর বাটীতে অবস্থান করিলেন। পূর্বের  
তায় এবারও পণ্ডহারী বাবার দর্শনলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য। তদনুসারে তিনি  
বাবাজীর আশ্রমের অনতিদূরে এক নির্জন লেবুবাগানে থাকিয়া ভিক্ষা ও

১ কেহ কেহ বলেন, স্বামীজী একবারমাত্র গাজীপুরে গিয়াছিলেন।



## গাজীপুরের পওহারী বাবা

লেবুর রস দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন ও প্রত্যহ বাবাজীর দরজার নিকট গিয়া বসিয়া থাকিতেন। কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে একদিন বাবাজীর দর্শন মিলিল। দর্শন অর্থে চাক্ষুষ দেখা নহে, দরজার পার্শ্ব হইতে আলাপ। পওহারী বাবা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।” স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তিতিকা কায়সে বনে?” পওহারী বাবা বলেন, “গুরুকা ঘরমে নৌকা মাকিক পড়া রহো।” পওহারী বাবার সহিত আলাপ করিয়া স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পূর্বে শুনিয়া ছিলেন ইনি একজন হঠবোগী, কিন্তু এখন দেখিলেন শুধু হঠবোগী নহেন, একজন অদ্ভুত রাজবোগীও বটে। তারপর আর একটি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিলেন—পওহারী বাবা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। তাঁহার গুহাতে পরমহংসদেবের একখানি ফটো ছিল; তাহা দেখাইয়া তিনি স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন, “ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার।” স্মরণ্য পওহারী বাবার উপর স্বামীজীর অনুরাগ উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তে এক নূতন অভিলাষের উদয় হইল। তিনি স্থির করিলেন, পওহারী বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এরূপ ইচ্ছার দুটি কারণ অনুমিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে সত্যান্বেষণস্পৃহা চিরদিন বলবতী ছিল, কোন নূতন পথ বা আলোক দেখিতে পাইলে তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন কিছুতেই নিরস্ত থাকিতে পারিত না। পওহারী বাবাকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল ইনি যোগমার্গে বিচরণ করিয়া সত্যলাভে সিদ্ধকাম হইয়াছেন, স্মরণ্য ঐ মার্গের রহস্য অবগত হইবার জন্য এবং তাঁহার মত দীর্ঘকাল একাসনে সমাধিস্থ হইয়া বাহাতে থাকিতে পারেন এই বিষয় শিক্ষার জন্য তাঁহার বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল। দ্বিতীয়তঃ এসময়ে তিনি কোমরের বাত ও অজীর্ণরোগে বিলক্ষণ ভুগিতেছিলেন। তাঁহার

## স্বামী বিবেকানন্দ

ধারণা হইল হঠাযোগের ক্রিয়া অভ্যাস করিলে ঐ দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবেন। তারপর পণ্ডহারী বাবার নিকট হইতে কোন বিষয়ের উপদেশ গ্রহণ করিলে যে গুরুত্যাগ করা হয়, ইহা তিনি মানিতেন না। সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বাবাজীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ নিশ্চয় করিলেন। বাবাজীও তাঁহাকে যথেষ্ট আশা-ভরসা দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যেই সংকল্প স্থির হইল এবং তিনি বাবাজীর গুহাভিমুখে বাইবার জন্ত উঠিলেন, অমনি কে যেন পিছন হইতে তাঁহাকে টানিয়া ধরিল। চরণদ্বয় আর চলিতে চাহিল না, সমস্ত শরীর ভার ও অবশ বোধ হইতে লাগিল এবং অন্তর কি যেন একটা সঙ্কোচ ও অভিমানের বেদনায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ‘একি? এরূপ হইল কেন? বোধ হয় এবার ভীষণ পরীক্ষার সন্ধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম।’ কিন্তু তথাপি দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তাহা পূর্ব্বেও অটল রহিল এবং তাহার জন্ত দিন স্থিরও হইয়া গেল। কিন্তু যেদিন দীক্ষা হইবে বলিয়া সব ঠিকঠাক তাহার পূর্বদিন রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তিনি লেবুবাগানে একাকী এক খাটিয়ার শয়ন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া পরমহংসদেবের মুর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। সে মুর্ত্তি কি অদ্ভুত পবিত্র! নয়ন দুটি তাঁহার নয়নোপরি সংলগ্ন অথচ সে নয়নে কতই মেহ, কতই করুণা! স্বামীজী সেই বেদনাব্যঞ্জক ছল ছল চক্ষু দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে অতিশয় নির্বেদ উপস্থিত হইল। ‘আমি কি অবিশ্বাসী! আমি কি কৃতঘ্ন!’ এইরূপ আত্মগোচরিত তাঁহার মনে উদ্ভিত হইতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজীর মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ও ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল এবং



## গাজীপুরের পওহারী বাবা

অন্তরে কে যেন পাষাণের ভার চাপিয়া বসিল। অবশেষে তিনি কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “না, না, তা কখনই হবে না। রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাবে না। প্রভু, দাস চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত, আর কাহারও নিকট নয়! জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।”

এই ঘটনার পর দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প দুই-এক দিন স্থগিত রহিল। কিন্তু ঐ মূর্তির সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্ত তিনি দুই-এক দিন পরে আবার পূর্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তিকে তাড়াইয়া দিয়া পওহারী বাবার ধ্যান করিবেন এই স্থির করিয়া বসিলেন। কিন্তু আবার দীক্ষাদিবসের পূর্বরাত্রে মত ঘটনা হইল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পাঁচ-ছয় দিন এই মূর্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকট হইয়াছিলেন। স্বামীজী দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন তাঁহার সম্মুখে কাঁদ কাঁদ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পাঁচ-ছয় দিন এইভাবে ঠাকুরের দর্শনলাভের পর দীক্ষা লইবার সঙ্কল্প তাঁহার মন হইতে এককালে তিরোহিত হইল।

পওহারী বাবা এই ঘটনার পরেও তাঁহাকে দীক্ষা দিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার মন হইতে ঐ সঙ্কল্প একেবারে দূরীভূত হইয়াছে, শুধু যে উপরোক্ত দর্শনলাভের জন্ত তাহা নহে, অত্র কারণও ছিল। তিনি দেখিলেন পওহারী বাবা কোন কোন বিষয় আবার তাঁহার নিকটই শিথিতে চাহেন। ইহাতে তিনি বুঝিলেন বাবাজী এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, আর বুঝিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তুলনা নাই।

## পুনর্যাত্রা

গাজীপুরে অবস্থানকালে স্বামীজী সংবাদ পান যে অভেদানন্দ স্বামী হৃদীকেশে পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহাকে হৃদীকেশ হইতে বারাণসীতে আনা হইয়া স্বামীজী গাজীপুর পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত পূর্বপরিচিত প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং অভেদানন্দ স্বামীর সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিয়া প্রেমানন্দ স্বামীর হস্তে তাঁহার ভার্য্যাপণ করিলেন এবং স্বয়ং প্রমদা বাবুর উদ্ভানবাটিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই উদ্ভানে তিনি অধিকাংশকাল তপস্তা ও সাধন-ভজনে যাপন করিতেন, কেবল মধ্যে মধ্যে এক-আধ বার মন্দিরাদি দর্শনে বহির্গত হইতেন। ক্রমে অভেদানন্দ স্বামীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা ঘটিল। কিন্তু এইসময়ে আর একটি দুঃসংবাদ আসিয়া স্বামীজীকে অতিশয় কাতর করিয়া ফেলিল। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অগ্রতম প্রধান গৃহী শিষ্য বলরাম বাবুর মৃত্যুসংবাদ। এই সংবাদশ্রবণে স্বামীজী রোদন করিয়াছিলেন। তদর্শনে প্রমদা বাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এত শোকাকুল কেন? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত।” স্বামীজী এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, “বলেন কি, সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া হৃদয়টা বিসর্জন দিব? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। হাজার হোক, আমরা মানুষ ত বটে! আর তা ছাড়া, তিনি যে আমার গুরুতাই ছিলেন। আমরা এক গুরুর চরণতলে



## পুনর্বািত্রা

বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি। যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষণ করতে উপদেশ দেয় আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।” ইহার অব্যবহিত পরেই বলরাম বাবুর পরিবারবর্গকে দর্শন করিবার জন্ত তিনি বারাণসী হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর সার্ব্ধ চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। স্বামীজীর মন ভূয়োদর্শন দ্বারা উত্তরোত্তর বিকশিত হইতেছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর ভারতের জীবন গঠিত এবং আধ্যাত্মিক ভেজের তারতম্যের উপরই ইহার উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

দুই মাস কাল মঠে অবস্থান করার পর ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামীজী আবার ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পূর্বের ত্রায় এবারও সঙ্কল্প রহিল আর ফিরিবেন না এবং এবার তাঁহার এই সঙ্কল্প প্রায় সফলও হইয়াছিল; কারণ এখন হইতে সাত বৎসরের মধ্যে তিনি আর মঠে ফিরিয়া আসেন নাই। ইতোমধ্যে মঠ বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া যায় এবং আরও অনেক পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এবার স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল হিমালয়প্রদেশ পরিভ্রমণ করিবেন, কারণ, ঠিক এইসময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বত হইতে ফিরিয়া লামাদিগের আবাস, কেদার-বদরীর মহান্ গন্তীর সৌন্দর্য্য ও কাশ্মীরের মনোরম দৃশ্যাবলীর একটি স্মরজিত চিত্র মঠের সন্ন্যাসীদিগের সম্মুখে ধরিলেন। তাঁহার বর্ণনা শুনিয়া স্বামীজী উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ, তোর মতন লোকই আমি চাচ্ছি, চল, দুজনে আবার বাহির হই।”

এবার স্বামীজী স্থির করিলেন যে আর পণ্ডারী বাবা বা অন্য কোন সাধুর নিকট যাইবেন না, কারণ, তাহাতে নিজের লক্ষ্য হইতে

## স্বামী বিবেকানন্দ

বড় বিচলিত হইতে হয়, এবার সোজা হিমালয়ে গিয়া উঠিবেন। মঠ-ত্যাগকালে তিনি গুরুভাইদের বলিলেন, “এবার আর স্পর্শমাত্র লোককে বদলে ফেলতে পারার ক্ষমতালাভ না করে ফিরছি না।” যাইবার পূর্বে একদিন ঘুমুড়ীতে গিয়া ভ্রীভ্রীমাতাঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিয়া আসিলেন, তারপর তাঁহার আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া অথগুনন্দ স্বামীর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন।

সর্বপ্রথম তাঁহারা ভাগলপুরে আসিয়া কিয়দিনের জ্ঞান বিশ্রাম করিলেন। এখানে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহার সহিত পূর্বে স্বামীজীর আলাপ ছিল। প্রথম দিন মধ্যাহ্নে ভাগলপুরে পৌছিয়া তাঁহারা রাজা শিবসিংহের বাটীর সন্নিকটে গঙ্গা-তীরে অবস্থান করিলেন। তখন তাঁহারা সাধারণ সাধুদিগের স্থান ছিন্ন-মলিন-বস্ত্র-পরিহিত ও দণ্ডকমণ্ডলুধারী। কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া সেখানকার লোক সহজেই বুঝিল যে তাঁহারা নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর সাধু নহেন। মন্থননাথ চৌধুরী নামে একজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক এইসময়ে স্বামীজীর বাগবৈভব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম মানিতে আরম্ভ করেন এবং এমন কি রাধাকৃষ্ণলীলা পর্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। স্বামীজী ইহার ভবনে এক সপ্তাহকাল ছিলেন। এখান হইতে এক দিন তিনি বরারীর পবিত্রচেতা মহাত্মা পার্বেতীচরণ মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে যান। আর এক দিন নাথনগরের জৈনদিগের মন্দির দেখিতে যান। মন্থন বাবু প্রথমে স্বামীজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু শেষে তাঁহার প্রভাবে এতদূর মুগ্ধ হন যে, কিছুতেই আর তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবেন না সঙ্কল্প করেন; পরে একদিন তাঁহার



## পুনর্বাচন

স্থানান্তর-গমনের সুযোগ পাইরা স্বামীজী ভাগলপুর হইতে অদৃশ্য হইলে তিনি তাঁহার অব্যবহাৰে আনমোড়া পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

ভাগলপুর পরিত্যাগের প্রাক্কালে জৈন আচার্য্যদিগের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর অনেক আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মতত্ত্বে স্বামীজীর অধিকার দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। স্বামীজীও তাঁহাদের সহিত আলোচনার ফলে জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে বেশ একটা সুযুক্তিপূর্ণ ধারণা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন—বুঝিলেন যে, উহা হিন্দুধর্ম্মেরই একটা শাখামাত্র এবং বৌদ্ধদর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

অতঃপর অখণ্ডানন্দ স্বামীর ইচ্ছানুসারে তাঁহারা বৈষ্ণবনাথধামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক শ্রদ্ধের রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বাটীতে গিয়া তাঁহারা উপস্থিত হন। স্বামীজী ঐসময়ে এমনভাবে থাকিবার চেষ্টা করিতেন যে, বাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে সাধারণ অশিক্ষিত সাধু মাত্র মনে করে, এই কারণে অখণ্ডানন্দকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে ইংরেজী জানেন একথা রাজনারায়ণ বাবুকে জানিতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং কথাবার্তা বাঙ্গালাতেই হইল। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বচনবিজ্ঞান, বাগ্মিতা ও ভাবচ্ছটার রাজনারায়ণ বাবু চমৎকৃত হইলেন। স্বামীজী ও তাঁহার সহচর ভ্রমক্রমেও একটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করায় রাজনারায়ণ বাবু বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহারা ইংরেজী জানেন। ইহাতে একটি কোতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজনারায়ণ বাবু একবার হঠাৎ ‘plus’ কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর বেই মনে হইল ইহারা ইংরেজী জানেন না, অমনি তাড়াতাড়ি দুইটি অঙ্গুলি উপর্যুপরি চিহ্নের মত রাখিয়া মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

রাজনারায়ণ বাবুর সহিত সাক্ষাতের পরদিন তাঁহারা ৬কাশীধাম অভিমুখে গমন করিলেন। কাশীতে থাকিতে থাকিতে স্বামীজীর প্রাণ পূর্ণ-জ্ঞানলাভের জ্ঞাত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে বলিয়াছিলেন, “ইহার পর পুনরায় যখন এখানে আসিব তৎপূর্বেই দেখিবেন একটা বোমার মত লোকসমাজের উপর পড়িয়াছি।” কথাটা খুব খাটিয়া গিয়াছিল।

ইহার পর অখণ্ডানন্দ স্বামী স্বামীজীকে অযোধ্যানগরীতে পুণ্যলোক মোহন্ত জ্ঞানকীবর শরণের সহিত সাক্ষাতের জ্ঞাত লইয়া যান। স্বামীজী প্রথমে কিছুতেই রাজী হন নাই, বলিয়াছিলেন, “এখন আর নয়, এখন বরাবর হিমালয়ের দিকে চল।” কিন্তু অখণ্ডানন্দ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি উক্ত মোহন্তের আশ্রমে গমন করিলেন। মোহন্ত মহাশয় সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ও একজন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ সাধক ছিলেন। তিনি নবাগত অতিথিদ্বয়কে বিশেষ সমাদরপূর্বক অভ্যর্থনা করিলেন, এবং অতি সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষতঃ ভক্তি বিষয়ে নিজে যতদূর জানিতেন তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং বলিতে বলিতে আত্মহারাপ্রায় হইয়া ভাবস্থ ও তন্ময় হইয়া গেলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাতিশয় পুলকিত হইলেন এবং সেদিন তাঁহার আশ্রমে আহারাদি করিয়া পুনরায় হিমালয় অভিমুখে চলিলেন। আশ্রম হইতে প্রস্থানকালে স্বামীজী অখণ্ডানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “তুই যে এখানে আমায় এনেছিলি এতে বড় খুশী হয়েছি; আজ প্রকৃতই একজন সার্ব পুণ্যাত্মার দর্শনলাভ ঘটিল।”



## হিমালয়-জোড়ে

ইহার পর আমরা ইহাদের দর্শন পাই নৈনিতালে বাবু রমাশ্রম ভট্টাচার্য্যের বাটীতে। পদব্রজে হিমালয়ের পাদদেশ অতিক্রম করিয়া ইহারা নৈনিতালে উপস্থিত হন ও রমাশ্রম বাবুর বাটীতে ছয় দিবস যাপন করেন। তারপর এখান হইতে বদরিকাশ্রম দর্শন করিবার জন্য উভয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া বহির্গত হন। সঙ্গে একটি পয়সা নাই, কোথায় আহার বা শয়ন হইবে তাহারও স্থিরতা নাই, অথচ দুজনে চলিয়াছেন। তৃতীয় দিবস ভ্রমণের পর বহুক্ষণ অনাহারে অবস্থিতিহেতু পরিশ্রান্ত দেহভার লইয়া তাঁহারা এক বেগবতী-তটিনী-তটস্থিত প্রাচীন, সুবিশাল অশ্বখবৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী তাঁহার সহচরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “কি সুরম্য স্থান! ধ্যানের পক্ষে কি সুন্দর!” অনন্তর সেই বিমলতোয়া পার্বত্য নদীতে অবগাহন মান করিয়া তিনি অশ্বখবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন ও অনতিবিলম্বে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ মর্ম্মরমূর্ত্তির ত্রায় অচল, স্থির—বেন তাহা হইতে প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইয়া গিয়াছে। বদনশ্রী ধ্যানদর্শন-আনন্দহিল্লোলে প্রফুল্লকমলের ত্রায় প্রস্ফুটিত। তিনি বহুক্ষণ এইভাবে রহিলেন, অনন্তর বাহুজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অখণ্ডানন্দ স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “গঙ্গাধর, আজি এই অশ্বখবৃক্ষতলে আমার জীবনের একটা অমূল্য ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে আমার একটা প্রধান সমস্যার সমাধান হইয়াছে।” গঙ্গাধর মহারাজ চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার মুখমণ্ডল অনির্বচনীয়-সুখরাগে রঞ্জিত। তখন তিনি স্বামীজীর কি অল্পভূতি হইয়াছে জানিতে পারেন নাই, পরে স্বামীজীর ডায়েরী খুলিয়া

## স্বামী বিবেকানন্দ

দেখিয়াছিলেন, তাহাতে এই ভাবের কথা লেখা আছে—“আমি আজ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের একাত্মতা অনুভব করিয়াছি, বিশ্বের বা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে, দেখিলাম প্রতি পরমাণু মধ্যে বিশ্বসংসার বিद्यমান।”

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে তাঁহারা আলমোড়ার অনতিদূরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন উভয়েই বহুক্ষণ হইতে অভুক্ত অবস্থায় আছেন। স্বামীজী ক্ষুধায় অবসন্ন ও মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। অথগুনানন্দ স্বামী জলের সন্ধানে গেলেন। সম্মুখেই মুসলমান-দিগের একটি গোরস্থান ছিল। ঐ স্থানের রক্ষক একজন ফকির। তিনি নিকটেই পর্ণকুটারে বাস করিতেন। ঘটনাক্রমে তিনি সেইসময়ে ঐ স্থান দিয়া বাইতেছিলেন। স্বামীজীর অবস্থা দর্শনে তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি একখানি শশা আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন। শশা খাইয়া তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইল। পরবর্তীকালে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, “লোকটি বাস্তবিক সেদিন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, কারণ আমি আর কখনও ক্ষুধায় অতটা কাতর হই নাই।” ইহার কয়েক বর্ষ পরে তিনি আমেরিকা হইতে এদেশে ফিরিয়া আসিলে যখন আলমোড়াবাসিগণ জগদ্বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত মহাসমারোহে আয়োজন করিয়াছিল, তখন সেই বিরাট সভামধ্যে তিনি পুনরায় এই মুসলমান ফকিরের দর্শন পান। ফকির অবশ্য তাঁহাকে চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি জনতার মধ্যে হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারেন ও সাহসে তাঁহাকে নিজ-সকাশে আনয়নপূর্বক সমাগত জনমণ্ডলীর নিকট তাঁহার পরিচয় দেন ও তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করেন। সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থও দান করেন।



## হিমালয়-কোড়ে

উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের প্রথম অংশটি স্বামীজীর নিরুট অতীব মধুর বোধ হইয়াছিল। অনাহারে অনিদ্রার দীর্ঘ পথভ্রমণে শ্রান্তি ও অবসাদ যথেষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অভ্রভেদী হিমালয়ের নীরব গন্তীর সৌন্দর্য ও শান্ত সমাহিত ভাব-দর্শনে এবং স্বচ্ছন্দচারী পার্বত্য সমীরণস্পর্শে সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইয়া যাইত। কাঠগোদাম হইতে আলমোড়া পর্যন্ত এইভাবে গেল।

আলমোড়ার পৌছিয়া অথগানন্দ স্বামী তাঁহাকে অম্বাদন্তের বাগানে লইয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে রাখিয়া সারদানন্দ ও কুপানন্দ নামক অপর দুই গুরুভাতাকে (তাঁহারা ইহার কিছু পূর্বে হইতে হিমালয়ে ভ্রমণ করিতেছিলেন) তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রদান করিতে গমন করিলেন। তাঁহারা ঐ সংবাদ-প্রাপ্তিমাत्र সোৎসাহে অম্বাদন্তের বাগানের দিকে ছুটিলেন—কিরদূর গিয়া দেখেন, স্বামীজী নিজেই আগিতেছেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাদের আশ্রয়দাতা লালা বজ্রীসার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনিও সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বোশী নামক একজন সেরেস্তাদারের সহিত 'সন্ন্যাসগ্রহণের আবশ্যকতা' সম্বন্ধে স্বামীজীর সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক ও আলোচনা হয়। তিনি শতমুখে ত্যাগই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, ইহা প্রমাণ করেন এবং স্বীয় জীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে এরূপ দৃঢ় যুক্তির সহিত ঐ বিষয়টি বুঝাইয়া দেন যে অবশেষে ব্রাহ্মণ বোশী তাঁহার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য করিয়া লন।

বজ্রীসার বাটীতে অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যার সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁহারা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গ্রামের

১ এ ঘটনাটি এইসময়ে সংঘটিত হয় নাই। সম্ভবতঃ আমেরিকা হইতে ফিরিবার পর স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার আলমোড়ায় আসেন, সেইসময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

## স্বামী বিবেকানন্দ

মধ্যে খুব মাদলের শব্দ শোনা গেল এবং কিঞ্চিৎ পরেই স্থানীয় এক ব্যক্তি আসিয়া বদ্রীসাকে বলিল, “মহাশয়, শীঘ্র আসুন, একজনকে ভূতে পাইয়াছে।” বদ্রীস তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করিলেন। স্বামীজীও কোতুহল-বিষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিটি শুইয়া যন্ত্রণার ছটফট করিতেছে এবং তাহার চারি পার্শ্বে কতকগুলি লোক বসিয়া তাহার হাত পা চাপিয়া ধরিয়াছে। আর এক ব্যক্তি (বোধ হয় পুরোহিত বা রোজা) ভূত ছাড়াইবার জন্ত মন্ত্র আওড়াইতেছে ও মাঝে মাঝে একথানা অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত কুঠার লইয়া তাহার শরীরের স্থানে স্থানে ছাঁকা দিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ কুঠার দ্বারা তাহার কেশ বা অঙ্গ স্পর্শ করিলেও কোন স্থান দগ্ধ হইতেছে না, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া স্বামীজী অবাক হইয়া গেলেন। ইতোমধ্যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে সমুদ্রমে পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল ও গৈরিকবসন-ধারীমাত্রেই অদ্ভুত শক্তিমান এই বিশ্বাসে বলিল, “মহারাজ, আপনি দয়া করিয়া এই ব্যক্তিকে সুস্থ করুন।” স্বামীজী শুধু ব্যাপারটি কি দেখিতে গিয়াছিলেন, স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহাকে আবার রোজা হইয়া ভূত ছাড়াইতে হইবে। কিন্তু কি করেন, লোকগুলির কাকুতি-মিনতিতে অগত্যা উপদেবতাবিষ্ট লোকটির নিকট অগ্রসর হইতে হইল। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সর্বপ্রথমে কুঠারখানি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেটি তখন প্রায় স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে তথাপি যেমন তিনি তাহাতে হাত দিয়াছেন অমনি হাত পুড়িয়া গেল। তিনি তখন ভূত ছাড়াইবেন কি, নিজেই অস্থির! বাহা হউক, কিঞ্চিৎ পরে নিজের জালা চাপিয়া রাখিয়া ভূতগ্রস্ত লোকটির মস্তকের উপর কর স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে কিল্লংক্ষণ স্থায় ইষ্টনাম জপ



## হিমালয়-জোড়ে

করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ঐক্লপ করিবার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা স্থস্থির হইল এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ শান্ত ও সুস্থ ভাব ধারণ করিল। স্বামীজী বলিতেন, “তারপর আমার উপর গায়ের লোকের ভক্তি দেখে কে! আমার একটা কেঁট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানার কিছুই বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তাঁর কুটীরে ফিরে এলুম। তখন রাত প্রায় ১২টা। এসেই শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু হাতের জালায় আর ঐ ব্যাপারের রহস্ত-উদ্ভেদের চিন্তায় সমস্ত রাত্রি ঘুম হল না। জলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ করতে পারলে না দেখে কেবলই মনে হতে লাগল, ‘There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy’—পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক ব্যাপার আছে বার সন্ধান দর্শনশাস্ত্রে মেলে না।”

আলমোড়ায় কিয়দিবস অবস্থান করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক সহোদরার শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ-সম্বলিত একখানি টেলিগ্রাম আসিল। উহা পাইবামাত্র স্বামীজীর হৃদয় দুঃসহ শোকে মুহূর্তমান হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহাই আবার তাঁহার চিত্তকে এ দেশের নারীজাতির উন্নতির উপায়-নির্ধারণে সজাগ করিয়া তুলিল। কিন্তু এই আকস্মিক পারিবারিক দুর্ঘটনায় বিশেষ ব্যথিত হইলেও তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন না। যেই দেখিলেন বাটার লোকেরা সন্ধান পাইয়াছেন অমনি তাঁহার অন্তর্নিহিত সন্ন্যাসভাব আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন এ স্থান ত্যাগ করিয়া অধিকতর দুর্গম গিরিগহ্বর আশ্রয় করিতে হইবে।

তাহাই হইল। একদিন হঠাৎ সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও কৃপানন্দকে

## স্বামী বিবেকানন্দ

নইয়া বড়ীসার বাটী ত্যাগ করিয়া স্বামীজী গাড়োয়াল রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিয়দূর গিয়া এক চটীতে বিশ্রামকালে স্বামীজী সহসা প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। সেইভাবে চটীতে তিন দিন কাটিল, তারপর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াই তিনি রুদ্রপ্রয়াগে বাত্মা করিলেন। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অনির্বচনীয়। চতুর্দিক স্তব্ধ জনহীন—যেন গভীর শান্তির রাজ্য। কেবল মাঝে মাঝে গিরিনির্ব্বাণীর কলহাস্ত-ময় নৃত্য ও দূরাগত প্রতিধ্বনির ক্ষীণ শব্দ। চির-শুভ্র হিমালয়ের অপ-রূপ সৌন্দর্য্যদর্শনে স্বামীজীর বাল্য ও যৌবনের স্বপ্ন সম্পূর্ণ সার্থক হইল। রুদ্রপ্রয়াগে পূর্ণানন্দ নামে একজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহার আশ্রমেই সকলে রাত্রিবাস করিলেন। এই স্থান হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর স্বামীজীর আবার জ্বর হইল। এবার চটীর অপেক্ষা বিষম জ্বর। তাঁহার এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া সেখানকার কাছারীর আমীন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে একটি কবিরাজী ঔষধ খাইতে দিলেন এবং তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ডাঙীতে করিয়া তাঁহাকে শ্রীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তিনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন। তখন তাঁহাদের আলমোড়া হইতে ১২০ ও কাঠগোদাম হইতে ১৬০ মাইল ভ্রমণ সমাধা হইয়াছে। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, কাঠগোদাম হইতেই তাঁহারা বদরিকার পথে যাত্রা আরম্ভ করেন। আলমোড়া হইতে এই পথটি আসিতে তাঁহাদের দুই সপ্তাহেরও উপর লাগিয়াছিল, কারণ তাঁহারা ভিক্ষা, ধ্যান ও ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন।

শ্রীনগরে আসিয়া অলকানন্দা নদীর তীরে একটি নির্জন কুটারে



তঁাহারা আশ্রয় লইলেন। শুনিলেন পূর্বে শ্রীমৎ তুরীয়ানন্দ স্বামী এই কুটীরে বাস করিতেন। এখানে তঁাহারা প্রায় মাণাবধি বাস করিলেন ও মাধুকরী-ভিক্ষা দ্বারা দিনপাত করিতে লাগিলেন। ভ্রমণকালে বিশেষতঃ এই স্থানে স্বামীজী গুরুভ্রাতাদিগের চিন্তে উপনিষদের উপদেশগুলি বিশেষভাবে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দিনের পর দিন শ্রীনগরে এই কুটীরে বসিয়া তঁাহারা প্রাচীন আৰ্য্যঋষিদিগের নিকট প্রকাশিত সেই সকল গভীর তত্ত্বকথা আলোচনা করিতে করিতে অবশেষে তঁাহাদের ভাবে একেবারে তন্ময় হইয়া উঠিতেন। শ্রীনগরে অবস্থানকালে বৈষ্ণবজাতীয় একজন স্কুল-মাষ্টারের সহিত তঁাহার আলাপ হইল। এ ব্যক্তি ঋগ্বেদগ্রন্থ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া পরে অনুতপ্ত হইয়াছে। স্বামীজী তাহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে নানা তথ্য আলোচনা করিতে লাগিলেন, সে ব্যক্তিও তঁাহাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীনগরে বহুল সাধনা ও ধ্যানভজনের পর স্বামীজী টিহিরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে মোটে আহার মিলিল না, কারণ চতুদ্দিক নিবিড় জঙ্গলপূর্ণ। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন চতুদ্দিক ধূসরশ্রী ধারণ করিয়াছে সেই সময়ে তঁাহারা অবসন্নদেহে একখানি গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। তঁাহারা একস্থানে সকলে মিলিয়া বসিলেন—চারিদিকে গ্রামবাসীদের বাটী, তঁাহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষা করিতে গেলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কিছুই মিলিল না। শেষে তঁাহাদের ‘গাড়োয়াল সরীষা দাতা নেহী, লাঠি বেগর দেতা নেহী’ (গাড়োয়ালবাসীদের মত দাতা নাই, কিন্তু তঁাহারা লাঠি ব্যতীত ভিক্ষা দেয় না),—এই স্থানীয় প্রবাদবাক্য মনে পড়িল। তখন তঁাহারা ঐ প্রবাদবাক্যের পরীক্ষার্থ

## স্বামী বিবেকানন্দ

কোতুকপরবশ হইয়া সকলে মিলিয়া 'এই পাখান (প্রধান) রোটা ল্যাও, লকড়ি ল্যাও' বলিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে হাঁকিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার, দেখিলেন কতকগুলি বলিষ্ঠদেহ গ্রামবাসী নিরীহ মেঘশিশুর ছায় ধীরে ধীরে আমতল্লাদি লইয়া তাঁহাদের নিকট সমাগত হইল। কিন্তু তখন সন্ন্যাসীরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন, পাক করিয়া খাইবার দৈর্ঘ্য ও সামর্থ্য নাই। সুতরাং বলিলেন, "ও সব চাই না, রন্ধনকরা খাদ্যসামগ্রী লইয়া আইস।" অগত্যা গ্রামবাসীরা রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। তখন ঐ কোতুককর ব্যাপার লইয়া তাঁহারা খুব হাসিতে আরম্ভ করিলেন ও রন্ধন সমাপ্ত হইলে প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় মহা তৃপ্তির সহিত উদর পুরিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে গ্রামবাসীদিগের সহিত ধর্ম্ম ও তাহাদের রীতিনীতি সম্বন্ধে বহুবিধ আলাপ করিয়া সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইলেন।

টিহিরি আসিয়া একটা পড়ো বাগানে দুটি ঘর মিলিল। সাধুদের জুতাই ঘর দুটি তৈরী। এখানে গঙ্গার তীরে বসিয়া তাঁহারা অহরহ ধ্যানধারণায় যাপন ও ভিক্ষারে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। এখানে টিহিরি-রাজের দেওয়ান ( সুপ্রসিদ্ধ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অগ্রদূত ) শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী গণেশপ্রয়াগে ( গঙ্গা ও ভিলাঙ্গন নদীর সঙ্গমস্থলে ) তাঁহার সাধনার স্থান পর্য্যন্ত নিদিষ্ট হইল। কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্পমত কার্য্য হইল না। অথগুনানন্দ স্বামী কিছুদিন হইতেই সর্দি জ্বর কাশি প্রভৃতিতে কষ্ট পাইতেছিলেন, এক্ষণে টিহিরির নেটিভ ডাক্তার বলিলেন, তাঁহার bronchitis হইবার খুব সম্ভাবনা, পার্শ্বত বায়ু তাঁহার সহ্য হইবে না, কারণ উহা অতিশয় লঘু। তাহার উপর



## হিমালয়-ক্রোড়ে

আবার সামনেই শীত আসিতেছে। সুতরাং এ সময়ে তাঁহারা বত শীঘ্র নীচে নামিয়া বাইতে পারেন ততই মঙ্গল। একরূপ আশঙ্কার কথা শুনিয়া গুরুভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য স্বামীজী স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া দেৱাছনে বাইবার উদ্যোগ করিলেন। টিহরি ত্যাগ করিয়া মুসুরীর মধ্য দিয়া তাঁহারা রাজপুরে গেলেন। এখানে অপরাত্নে দূর হইতে একজন সাধুকে তুরীয়ানন্দ বলিয়া বোধ হওয়ার তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে সাধুটিকে ডাকিতে লাগিলেন এবং তিনি নিকটে আসিলে দেখিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দই বটে। সহসা এইরূপ আকস্মিক ভাবে একজন প্রিয় গুরুভ্রাতার দর্শন পাইয়া সকলে মহা আহ্লাদিত হইলেন এবং পরম্পরের ভ্রমণকাহিনী কীৰ্ত্তন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন নবরাত্রির একদিন মাত্র বাকি আছে। তারপর সকলে একত্রে দেৱাছনে পৌছিয়া সিভিল সার্জন্ ডাক্তার ম্যাকলারেনের নিকট অখণ্ডানন্দের বক্ষ পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ বাবু উক্ত ডাক্তার সাহেবের নিকট একখানি পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। সাহেব স্বামীজীর সহিত ধর্মবিষয়ে অনেকরূপ আলাপ করিয়া তাঁহার ও তাঁহার সহচর-সন্ন্যাসিগণের বিশেষ গুণানুগী হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অতিশয় যত্নের সহিত অখণ্ডানন্দ স্বামীর বক্ষ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “আর কিছুতেই উপরে উঠিও না, দীর্ঘকাল সমতল প্রদেশে থাকিয়া ভালরূপ চিকিৎসা করাও।” কিন্তু প্রথমেই একটা আশ্রয় চাই, নতুবা কোথায় চিকিৎসা হয়? স্বামীজী নিজে দেৱাছনের বহু বাটীতে গমন করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় মিলিল না। তথাপি নিরস্ত না হইয়া তিনি দ্বারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে পণ্ডিত আনন্দ-

## স্বামী বিবেকানন্দ

নারায়ণ নামে একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও স্থানীয় উকীল পীড়িত সাধুটিকে আশ্রয়দান ও তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারের জন্ত গরম কাপড় ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অথগুনন্দ স্বামীর এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে আর সকলে কোন বণিকের নূতননির্মিত বাটীতে চারিখানি খাটিয়া পাতিয়া ভিক্ষার-সেবনে কয়েকটা দিন কাটাইলেন।

এখানে একজন জ্ঞাতবেনের সহিত স্বামীজীর দেখা হয়। তাহার ধারণা ছিল, সে একজন মহা বৈদান্তিক। “মহারাজ, পাঁচ মিনিটে তত্ত্ব খিঁচ লিয়া হায়। জগৎ তিন কালমে হারাই নেহী। তুসীতো স্বরূপ হায়”—এইরূপ ভাবের কথা সর্বদা তাহার মুখে শুনা বাইত। লোকটি কিন্তু এদিকে মহা রূপণ ছিল। সে “নন্দ গাঁটা” (অর্থাৎ গাঁইট-বন্ধনপটু রূপণ নন্দ) বলিয়া পরিচিত ছিল। স্বামীজী ইহার সহিত মাঝে মাঝে আলাপ করিতেন ও ইহার কথায় বিশেষ কোতুক অনুভব করিতেন। ইহার পুত্রের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হওয়ার সে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ইহাদিগকে খাওয়াইয়াছিল। রূপণ নন্দ বাটীতে আসিয়া দেখে, ইহার তাহার বাটীতে খাইতেছেন। দেখিয়া সে বিস্মিত হইল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

একদিন হৃদয় বাবু নামক একজন ঋষ্টানের (ইনি পূর্বে স্বামীজীর সহিত একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন) বাটীতে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকদিগের সহিত কথায় কথায় তাঁহার মহা তর্ক বাধিয়া গেল। স্বামীজী তাহাদিগের নিকট বাইবেলের higher criticism-এর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা কল্পিনকালেও উহার ধার ধারে নাই, সুতরাং তাঁহার যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না; তাঁহার বিজ্ঞাবুদ্ধির



## হিমানয়-কোড়ে

পরিচয় পাইয়া তাহারা বিস্থিত হইল। তৎপর স্বামীজী হৃদয় বাবুর বাটীতে বসিয়া তাঁহার ধর্মের বিরুদ্ধে আলোচনা করার জন্য হৃৎ প্রকাশ করিলেন।

দেৱাত্মনে তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে স্বামীজী অখণ্ডানন্দকে এলাহাবাদে এক বন্ধুর বাটীতে বাইতে পরামর্শ দিয়া কৃপানন্দের উপর তাঁহার সেবা ও তত্ত্বাবধানের ভারপর্ণ করিয়া অপর গুরুভ্রাতাদিগের সহিত হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে কৃপানন্দও হৃষীকেশ গেলেন। অখণ্ডানন্দ কতকটা সুস্থ হইলে এলাহাবাদে বাইবেন মনে করিয়া প্রথমে সাহারাণপুরে বহু বাবু নামক এক বাঙ্গালী উকীলের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার পরামর্শে তিনি মীরাটে তাঁহার আলাপী ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাটীতে গেলেন। সেখানে প্রায় দেড়মাস তাঁহার চিকিৎসা চলিল।

এদিকে স্বামীজী হৃষীকেশে আসিয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিলেন এবং গুরুভাইদের সহিত তথাকার বিখ্যাত সাধু ধনুৱাজ গিরির বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে কঠোর সাধনার ইচ্ছা উদ্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্দৃষ্টক্রমে পুনরায় সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। কয়েকদিন তপস্তার পর একদিন তিনি প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, গুরুভ্রাতারা চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। একদিন এমন হইল যে, ক্রমাগত বর্ষনিঃসরণে তাঁহার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল ও নাড়ীত্যাগ হইল। তিনি মাটিতে দুইখানি পাটকরা কবলের উপর অজ্ঞান অচেতনভাবে পড়িয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। গুরুভ্রাতারা চিন্তার ও শোকে কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া পড়িলেন, কারণ বহু ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার, কবিরাজ বা চিকিৎসার কোন উপায় নাই। এই ঘোর বিপদে পড়িয়া যখন তাঁহারা

## স্বামী বিবেকানন্দ

একমনে মধুসূদনকে স্মরণ করিতেছেন, সেই সময়ে হঠাৎ কুটারের বহির্দেশে কাহার ধীর পদক্ষেপ শ্রুত হইল। তাঁহারা চকিত হইয়া দেখিলেন কুটার-দ্বারে এক সাধু দণ্ডায়মান। তাঁহারা তাঁহাকে সাগ্রহে অভিবাদন করিয়া গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার নিকট স্বামীজীর সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন। মহাপুরুষ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থলি হইতে কিঞ্চিৎ মধু ও পিপুলচূর্ণ একত্রে মাড়িয়া স্বামীজীকে খাওয়াইয়া দিলেন। কি আশ্চর্য! ঐষধটি যেন অমৃতের ত্রায় কার্য্য করিল; ক্ষণকালমধ্যেই স্বামীজী চক্ষু-ক্লম্বীলন করিয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিলেন। একজন গুরুতাই তাঁহার মুখের নিকট কান পাতিলে তিনি অতি ক্ষীণস্বরে দু-একটা কথা কহিলেন। ক্রমে তিনি অল্প অল্প করিয়া স্নহ হইতে লাগিলেন। পরে সঙ্গীদের নিকট বলিয়াছিলেন, অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকার সময় তিনি যেন দেখিয়াছিলেন যে জগতে তাঁহাকে বিধাতার কোন একটা বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে এবং সেই কার্য্য যতদিন না শেষ হইবে ততদিন তাঁহার বিশ্রাম বা শান্তি নাই। বাস্তবিক তাঁহার গুরুতাইরা এই সময় হইতে তাঁহার মধ্যে একটা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির স্মরণ লক্ষ্য করিয়া ছিলেন। সে শক্তির বেগ এত প্রবল যে মনে হইত তাহা আর তাঁহার ভিতরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তিনি সেই শক্তিবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্রলাভের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

স্ববীক্শে যখন সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগিয়া তাঁহার জীবনের আশা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখনই গুরুতাইরা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন স্বামীজী তাঁহাদের কতদূর স্নেহভালবাসার বস্তু। তাঁহাদের প্রাণে প্রতি-মুহূর্ত্তে বাজিতেছিল—শ্রীগুরুদেবের অদর্শনাবধি ইনিই আমাদের বল বুদ্ধি ভরসা, এখন যদি আবার ইঁহাকেও হারাই তবে আমাদের উপায় কি



## হিমালয়-ক্রোড়ে

হইবে? কিন্তু ঠিক এই সময়েই স্বামীজীর সঙ্কল্প হইল যে তাঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে, তাঁহারা যেন আর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া না চলেন। বাহা হউক, স্ববীকেশে আরও কিছুদিন বাস হইল। প্রথমে কিছুদিন তাঁহারা এক ঝুপড়িতে বাস করিয়াছিলেন—যে ঝুপড়িভে স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি পূর্বে ছিলেন। পরে ইহাদের পূর্বপরিচিত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখানে আসিলে তাঁহার অর্থসাহায্যে একটি ভাল কুটির নির্মিত হইল এবং তাহাতে ইহারা কিছুদিন বাস করিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মসূত্র খুব আলোচনা হইতে লাগিল—চারিদিকে রটিয়া গেল, একজন খুব পণ্ডিত সাধু এখানে আসিয়াছেন। এখানে শঙ্করগিরি নামক একজন সুপ্রাচীন সাধুর সহিত স্বামীজীর আলাপ হয়—তিনি স্বামীজীর সঙ্গে কথা কহিতে বড়ই আনন্দ পাইতেন—বলিতেন, পণ্ডিতের কথা ছেড়ে দাও, কথা বোঝে, এমন লোক কোথা? ‘বাত সম্বে এসা আদমি কাঁহা মিলে।’ স্বামীজীকে ‘ইয়ার’ ও ‘রসিনা’ বলিতেন—অর্থাৎ ইহার সহিত কথা কহিয়া বাস্তবিক সুখ হয়। ইনি স্ববীকেশে অনেকদিন হইতে ছিলেন—গল্প করিতেন—তখন এখানে রীতিমত জঙ্গল ছিল, পালে পালে হাতী আসিত। এখন কি আর স্ববীকেশ আছে, ‘রোটিকেশ’ হইয়াছে অর্থাৎ এখন ছত্রাদিতে কুটির বন্দোবস্ত খুব হইয়াছে, তাই অনেক সাধু এখানে থাকেন। ইনি স্বামীজীর নিকট সেই জ্ঞানী সাধুর গল্প করেন, যাহাকে বাঘে লইয়া যাইবার সময় ক্রমাগত ‘শিবোহহং শিবোহহং’ ধ্বনি করিতেছিলেন। বাহা হউক, স্বামীজী অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিলে সকলে মিলিয়া কনখলে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া সাহারাণপুরে বহু বাবু উকীলের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন যে, গঙ্গাধর মীরাটে

## স্বামী বিবেকানন্দ

আছেন। ব্রহ্মানন্দ স্বামী বছদিন গঙ্গাধর মহারাজকে দেখেন নাই, আর বহু বাবুও বিশেষ করিয়া বলিলেন, মীরাটে কিছুদিন থাকিলে স্বামীজীর শরীর সারিয়া যাইবে; সুতরাং ব্রহ্মানন্দ স্বামীর বিশেষ আগ্রহে ও বহু বাবুর বিশেষ অনুরোধে সকলে মিলিয়া মীরাটে গমন করিলেন।

মীরাটে আসিয়া তাঁহারা সকলে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সে সময়টা ৬কালীপূজার পর, শরতের শেষ। অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর রুগ্ন শীর্ণ মূর্তি দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি বলেন “স্বামীজীকে ওরূপ ক্ষীণ শীর্ণ কখনও দেখি নাই, ঠিক যেন একখানি ছায়ামূর্তির মত হইয়া গিয়াছিলেন, বেশ বোধ হচ্ছিল যে হৃদীকেশের পীড়ার কবল হইতে তখনও তিনি সম্পূর্ণ উদ্ধার লাভ করিতে পারেন নাই।” তাঁহারা উভয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ ত্রৈলোক্য বাবুর বাটীতে থাকিলেন। অপর সকলে যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিয়া একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে স্থান পাইলেন। পরে সকলে একত্রে যজ্ঞেশ্বর বাবুর কোন বন্ধুর বাগানে (উহা শেঠজীর বাগান নামে খ্যাত ছিল) আশ্রয় লইলেন। স্বামীজী তখনও ঔষধ খাইতেছিলেন। যাহা হউক, মীরাটে থাকিতে থাকিতে তিনি ক্রমশঃ বল লাভ করিলেন।

শেঠজীর বাগানে থাকার সময়ে অখণ্ডানন্দ তাঁহার নিকট তাঁহার পূর্ব পরিচিত কাবুলের আমীরের এক আত্মীয়কে আনয়ন করেন। এই ভদ্রলোক স্বামীজীকে দেখিতে আসিবার সময় উজ্জু (নমাজের পূর্বে হস্তাপদাদি প্রক্ষালন) করিয়া পবিত্রভাবে প্রচুর মিষ্টান্নাদি উপঢৌকন লইয়া আসিতেন। স্বামীজী তাঁহার সহিত স্বাতের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির আখুদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা বলিলেন। অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও স্থানীয় অগ্রাণ্ড লোক স্বামীজীর নিকট ধর্মপ্রসঙ্গপ্রবণমানসে আসিতেন। বাস্তবিক

১ ভারত ধর্ম-মহামণ্ডলের অগ্রতম নেতা স্বামী জ্ঞানানন্দ।



## হিমালয়-ক্রোড়ে

জায়গাটি যেন একটি ছোটখাটো বরাহনগর মঠ হইয়া দাঁড়াইল ; স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দ, অখণ্ডানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, কৃপানন্দ সকলেই ছিলেন, তার উপর হঠাৎ অদ্বৈতানন্দ কোথা হইতে আসিয়া জুটিলেন। স্বামীজীর শরীর ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল। তিনি প্রত্যহ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামকালে মৃচ্ছকটিক, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি পাঠ করিয়া গুরুভাইদের শুনাইতেন, বিষ্ণুপুরাণও আরম্ভ করিয়া ছিলেন। ধ্যান-ভজন খুব চলিত ; সকলে মিলিয়া রন্ধনাদি করা হইত, স্বামীজীও কখন যখন তাহাতে সাহায্য করিতেন ; মধ্যে মধ্যে এদিক ওদিক বেড়াইতে বাওয়া হইত। বস্তুতঃ মীরাটে তাঁহাদের জীবনের কয়েকটি অতি সুখের দিন কাটিয়াছিল।

স্বামীজী স্থানীয় সাধারণ পুস্তকাগার হইতে পুস্তকাদি আনাইয়া পাঠ করিতেন। ঐ উপলক্ষে একটি কোতুরুকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার স্যার জন লবকের গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড প্রত্যহ শেষ করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র গ্রন্থাবলী শেষ হইয়া গেলে লাইব্রেরীয়ান মনে করিলেন তিনি কখনই সব বইগুলি পড়েন নাই, শুধু লোক দেখাইবার জন্য পড়িবার ভান করিতেছেন মাত্র। স্বামীজীর নিকট ঐ সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, “আমি সব পুস্তকগুলিই আরম্ভ করিয়াছি, আপনি ইচ্ছা করিলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।” লাইব্রেরীয়ান তখন তাঁহাকে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকল প্রশ্নের সহজতর পাইয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এত শীঘ্র কিরূপে পাঠ করেন জিজ্ঞাসা করাতে স্বামীজী অখণ্ডানন্দ স্বামীকে বলিয়াছিলেন, “আমি এক একটি শব্দের দিকে নজর দিয়া পড়ি না, এক একটি বাক্য একেবারে পড়িয়া যাই।”

## স্বামী বিবেকানন্দ

মীরাটে তিন মাসেরও অধিককাল যাপন করিয়া স্বামীজী হরিদ্বার, হৃদিকেশ প্রভৃতি স্থানের সর্বত্যাগী সাধুদিগের ত্রায় পূর্ণ স্বাধীনতাভোগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি এই সব সাধুদিগের সম্বন্ধে বলিতেন—“হৃদীকেশে আমি অনেক মহাপুরুষের দর্শন পাইয়াছিলাম; একজনের কথা মনে আছে, তিনি উন্মাদভাবে থাকিতেন—রাস্তা দিয়া উলঙ্গ হইয়া চলিয়াছেন, আর ছোঁড়ারা পশ্চাতে দোড়াইতেছে ও ঢিল ছুঁড়িতেছে; সর্বাসঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া দরদরধারায় রক্ত পড়িতেছে, তথাপি ভ্রক্ষেপ নাই—বরং হাসিয়াই খুন! আমি তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আহত স্থানগুলি ধোয়াইয়া দিই ও একটু ত্রাকড়া পোড়াইয়া তাহার ছাই সেই সব স্থানে লাগাইয়া দিই, তবে রক্ত থামে। তিনি কিন্তু ক্রমাগত হাসিয়া লুটোপুটি খাইতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, “কেয়া মজ্জেদার খেল্‌ ছায়! বিলকুল বাবাকা খেল্! কেয়া আনন্দ!” ইত্যাদি। আবার অনেক সাধু আছেন তাঁহারা লোকজনের সঙ্গ ভালবাসেন না, লুকাইয়া থাকিতে চাহেন। আত্মগোপনের কৌশলগুলিও আবার চমৎকার। কেহ বা গুহার চতুর্দিকে মনুষ্যের কঙ্কাল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন—তাহা দেখিয়া লোকে ভাবে তিনি সর্বভুক। কেহ বা লোক দেখিলেই প্রস্তর নিক্ষেপ করেন—এইরূপ।” সেই সব সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে স্বামীজী আরও বলিতেন, “ইহাদের তপস্তা, তীর্থযাত্রা বা পূজাদির কোন প্রয়োজন নাই, তবে যে ইহারা তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ান ও তপস্তাদি কঠোর অনুষ্ঠান করেন সে শুধু নিজ নিজ পুণ্যবলে লোককল্যাণসাধনের জন্য।” তিনি নিজেও এখন এইরূপ লোককল্যাণকামনায় নির্জ্ঞান সাধনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। বোধ হয় তিনি এ সম্বন্ধে স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট হইতে কোনরূপ আদেশও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ এই সময়ে



## হিমালয়-ক্রোড়ে

তিনি গুরুভ্রাতাদের সকলকে ডাকিয়া একদিন বলিলেন—“আমার জীবন-ব্রত স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে আমি একাকী অবস্থান করিব। তোমরা আমার ত্যাগ কর।” অখণ্ডানন্দ অনেক অতুলন প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত থাকিবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি বলিলেন, “গুরুভাইদের মায়াও মায়া, বরং আরও প্রবল। এ মায়ার পাকে পড়িলে কার্যসাধনের বহু বিষয় ঘটিবে। আমি আর কোন মায়ার বেড়ী রাখিতে চাহি না।” এ সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্যে পরিণত হইল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন।

## আলোয়ার রাজ্যে

হিন্দু-মুসলমানের পুরাতন রাজধানী দিল্লী নগরী অতীতের বহু স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আজও শত শত ভুবন-পর্যটকের মনোহরণ করিয়া থাকে। ইউরোপখণ্ডে রোম নগরী যেমন গরীবসী সভ্যতার খনি, ভারতখণ্ডে দিল্লী নগরীও তেমনি। উহার বিগত গৌরব-স্মরণে স্বামীজীর ভাবোন্মত্ত প্রাণ নাচিয়া উঠিল। দিল্লীতে তিনি শ্রামলদাস শেঠের বাটীতে গিয়া উঠিলেন। সেখানে তাঁহার দর্শনমাত্র সকলে তাঁহাকে সম্মানে অভ্যর্থনা করিল। কিছুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের সহিতও তাঁহার আলাপ হইল। উক্ত হেম বাবুর সহিত স্বামীজীর ধর্মসম্বন্ধীয় বহু তর্কবিতর্ক হয়, হেম বাবু স্বামীজীর অগাধ বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

গুরুভ্রাতাগণ মীরাটে তাঁহাকে বিদায় দিয়া অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। শীঘ্রই সকলে আবার দিল্লীতে তাঁহার নিকটে আসিয়া জুটিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার প্রাণে নির্জন ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লীতে তিনি যে কয়দিন একাকী ছিলেন বেশ সুখেই ছিলেন। কারণ সেটি তাঁহার তৎকালীন মনোমত অবস্থা। তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন যেন কোন উচ্চশক্তি তাঁহাকে নিঃসঙ্গ বিচরণের দিকে টানিয়া লইয়া বাইতেছিল, যে যেন তাঁহাকে আদেশ করিতেছিল—‘এই কর’। সুতরাং কিছুদিন গুরুভাই-দিগের সহিত একসঙ্গে কাটাইয়া আবার একলা বাহির হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হইল। স্বামী অখণ্ডানন্দ



## আলোয়ার রাজ্যে

তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এক আধবার মাত্র তাঁহার সহিত, একবার স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত ও একবার স্বামী অভেদানন্দের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার সন্ধান করিতে করিতে এক এক স্থানে উপস্থিত হইয়া গুনিতেন, তিনি কয়েকদিন পূর্বে সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে তিনি স্বামীজীর এই সময়কার ভ্রমণের কতক কতক ঘটনা অবগত হন। পরে স্বামীজীও গুরুভাইদের নিকট এই সময়কার কিছু কিছু গল্প করেন। এই সময়ে যে সকল ব্যক্তির সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়, তাঁহাদেরও মধ্যে কেহ কেহ পরে তাঁহাদের সহিত স্বামীজীর কিরূপে মিলন হইল ও কিরূপ আলাপাদি হইয়াছিল, তাহা গল্পচ্ছলে বলেন বা লিপিবদ্ধ করেন। এই সমুদয় উপাদান হইতেই স্বামীজীর এই অজ্ঞাতবাসের পূর্বাপর একটা বিবরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্বামীজী রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়ার প্রদেশে গমন করিলেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী ট্রেন হইতে আলোয়ার ষ্টেশনে অবতরণ করিলেন। শ্রাম-শম্পাবৃত ভূমি ও উত্তানরাজিবেষ্টিত রাজপথ বাহিরা বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণী অতিক্রমপূর্বক অবশেষে তিনি সরকারী চিকিৎসালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার দ্বারদেশে একজন বাদ্দালী ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকেই ডাক্তার বাবু অনুমানে বঙ্গভাষায় সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, এখানে সাধুসন্ন্যাসীর থাকবার কি একটু স্থান হতে পারে?” ভদ্রলোকটি প্রকৃতই সেখানকার ডাক্তার, নাম গুরুচরণ লস্কর। অনেক দিন বিদেশে আছেন, বাদ্দালা কথা বড়

## স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রুতিগোচর হয় না, সুতরাং এই কমনীয়বদন তরুণ সন্ন্যাসীর মুখ হইতে হঠাৎ বাঙ্গালা কথা শুনিয়া বড় আনন্দ পাইলেন, এবং তাঁহাকে সম্মানে প্রণাম করিয়া উত্তর করিলেন—“নিশ্চয়! আস্তে আস্তে আজ্ঞা হয়, আসুন” এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চিকিৎসালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বাজারের উপর একখানি দ্বিতল গৃহ দেখাইয়া বলিলেন, “আপাততঃ এখানে থাকতে কষ্ট হবে কি?” স্বামীজী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “কিছু না।” ডাক্তার বাবু তৎক্ষণাৎ কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনাইয়া দিলেন, কারণ স্বামীজীর সঙ্গে তখন একখানি গেরুরা কাপড়, একটি দণ্ড, একটি কমণ্ডলু ও কয়লা বাঁধা ২।৪ খানি বই ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বন্দোবস্তাদি শেষ করিয়া ডাক্তার তাঁহার একজন মুসলমান বন্ধুর (তিনি স্থানীয় হাইস্কুলের উর্দু ও ফার্সির শিক্ষক ছিলেন) নিকটে গিয়া বলিলেন, “মোলবী সাহেব! এইমাত্র একজন বাঙ্গালী দরবেশ এখানে আসিয়াছেন, দেখিবেন ত শীঘ্র আসুন। এমন মহাত্মা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনি তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলুন, আমি একটু কার্য সারিয়া আসি।” মোলবী সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া নম্রপদে তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ভক্তিসহকারে তাঁহাকে সেলাম করিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে আপনার নিকট যত্নপূর্বক বসাইয়া ধর্ম-বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, “কোরাণের এইটি বিশেষত্ব যে আল্প পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে কেহ কলম চালাইতে পারে নাই। ১১০০ বৎসর পূর্বেও ইহা যেমন ছিল, আজও ঠিক সেইভাবে রহিয়াছে, কোথাও একটি নূতন কথা বসে নাই। প্রাচীন পুস্তকের এইরূপ বিশুদ্ধতা রক্ষা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।” গুরুচরণ ডিম্পেন্সারীতে ফিরিয়া



## আলোয়ার রাজ্যে

গিয়া সমাগত লোকদিগের নিকট স্বামীজীর আগমনবার্তা কহিলেন। ডাক্তার বাবুর মুখে ঐ কথা শুনিয়া শহরের অনেক ভদ্রলোক স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্ত আসিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুও দৈনিক কার্য শেষ করিয়া তাঁহাকে আপন আবাসে লইয়া গেলেন এবং ভোজনান্তে পুনরায় সেই কুঠুরিতে ফিরিয়া আসিলেন। লোকসমাগম ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মোলবী সাহেবের মুসলমান বন্ধুগণ পর্য্যন্ত দলে দলে আসিয়া স্বামীজীর মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিয়া চরিতার্থ হইতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে দিতে মাঝে মাঝে উর্দু গান, হিন্দী ভজন ও বাঙ্গালা কীর্ত্তন এবং বিষ্ণুপতি, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণের পদাবলী গাহিতেন। কখনও বা উপনিষদ, পুরাণ, কোরান ও বাইবেলাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বচনাবলী উদ্ধৃত করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, তুলসীদাস, কবীর, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনের নানা ঘটনা শাস্ত্রোক্ত বচনের প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সকলকে ধর্ম্মের সার শিক্ষা প্রদান করিতেন।

এইরূপে দুই তিন দিন কাটিলে পর জনকয়েক বন্ধিগ্ন লোক পরামর্শ করিলেন যে, স্বামীজীকে নগরের মধ্যস্থলে কাহারও বাটীতে রাখিলে সকলেরই তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন ও সেবা করিবার সুবিধা হইতে পারে। এই স্থির করিয়া তাঁহারা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ইঞ্জিনিয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজীর বাটীতে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। এখানে তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ধ্যান-ভজনাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। তার পর গৃহের বাহিরে আসিয়া লোকজনের সহিত আলাপ করিতেন। প্রতিদিন দশ পনর হইতে পঁচিশ-ত্রিশ জন লোক তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। তন্মধ্যে ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত, মুর্থ, বুঝা, বুদ্ধ, শিয়া, মুন্সি,

## স্বামী বিবেকানন্দ

শৈব, বৈষ্ণব সকল শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যাইত। বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত এই জনতা সমভাবে বর্তমান থাকিত। স্বামীজীর মুখের বিরাম নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনিও সকলের প্রশ্নের সমান উত্তর দিতেছেন। এক এক সময়ে এমন হইত যে, তিনি জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যাदि উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে হয়ত একজন অবিবেচক শ্রোতা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া প্রশ্ন করিল, “মহারাজ, আপ্কা শরীর কিন্ জাতিকা হায়?” অথ কেহ হইলে সম্ভবতঃ এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দিত না, কিন্তু স্বামীজী বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বাটতি উত্তর করিতেন, “ইয়ে কাশ্বশ শরীর হায়।” আবার খানিক পরেই হয়ত আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ, আপ্ গেরুয়া পিহনুতে হায় কেঁও?” (মহারাজ আপনি গেরুয়া পরেন কেন?) স্বামীজী উত্তর দিতেন, “ইয়ে ফকীরকে ভেক হায়, সফেদ কাপড়া পিহনুনেসে গরীব লোগ হম্‌সে ভিক মান্‌গতে হায়। লেকিন ম্যু ত ফকির হ্। ভিক কাঁহাসে দিউ? উন্‌ লিয়ে ম্যু আপ্ গরীবোকা ভেগ বনায়, য়েসে গরীবো হম্‌সে তকাং যায়, ইয়ে সমঝকে কি যো খুদ আপহি মান্‌গনেওয়াল হায় উসে মান্‌গনেকা কিয়া কয়েদা?” (সাধা কাপড় পরে থাকলে অনেক দরিদ্র লোক ভিক্ষা চায়। নিজে ভিক্ষুক, অনেক সময় কাছে এক পরসাত থাকে না যে তাদের দিই। আবার চাইলে না দিতে পারলেই কষ্ট হয়। গেরুয়া পরা দেখলে তারা বোঝে এও আমাদের একজন, এর কাছে আবার কি চাইব?) পরক্ষণেই আবার পূর্ববৎ তত্ত্বপ্রবাহ চলিতে থাকিত। তাহা হইতে ক্রমে হয়ত শক্তি-উপাসনার কথা উঠিল। জগজ্জননীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ এরূপ নাচিয়া উঠিত যে মুখে আর অস্ত্র কথা নাই, শুধু মা মা



## আলোয়ার রাজ্যে

ধ্বনি। প্রথমে উচ্চকণ্ঠে, পরে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ অতি অশ্রুটস্বরে সে ধ্বনি বাহু ছাড়িয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মিলাইয়া যাইত, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্বাঙ্গ স্থির হইয়া উঠিত এবং আরক্তিম আয়ত-লোচনদ্বয় হইতে প্রবলবেগে প্রেমাশ্রু ছুটিত। শ্রোতৃবৃন্দ সে ভাবদর্শনে চিত্তার্পিতের স্থায় তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিতেন ও অবিশ্রান্ত নয়নজলে ভাসিতেন। তারপর স্বামীজী আবার গান ধরিতেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠের সহিত নয়নের স্নিগ্ধবারি মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে ভগবৎপ্রেমের প্রস্রবণ মুক্ত করিয়া দিত। আবার কখন কখন দার্শনিক প্রশঙ্গ ও তত্ত্বকথা ছাড়িয়া নানা দেশের ও জাতির নানাবিধ রীতিনীতির কথায় হাসির হিল্লোল তুলিয়া অপরূপ উপদেশ দিতেন। দ্বিপ্রহরের সময় গৃহস্বামী পণ্ডিতজী তাঁহাকে আহ্বারে আহ্বান করিলে তিনি বিদায় লইয়া ভোজনে গমন করিতেন, তাঁহারাও সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেন। ভোজনান্তে আবার বাহিরে আসিয়া দেখিতেন, হয়ত নিকটস্থ পল্লীর লোকেরা তাঁহার জগ্ম অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে পুনরায় পূর্বের মত জনতা হইত এবং সেই প্রাণস্পর্শী কথার প্রস্রবণ ছুটিত।

বৈকালে তিনি যখন ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখনও অন্ততঃ দশ বার জন লোক তাঁহার সঙ্গে থাকিত। সন্ধ্যার পরে দৈনিক কার্য্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আরও অধিক লোক আসিয়া জুটিত। স্বামীজী সে সময়ে গান আরম্ভ করিতেন ও সকলকে তাঁহার সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতে বলিতেন। হয়ত একটা বাজালা কীর্ত্তন ধরা হইল, দুই-চারি দিন চেষ্টার পর অনেকেই তাঁহার সহিত সমস্বরে বেশ বাজালা কীর্ত্তন গাহিতে পারিতেন। মধ্যে মধ্যে নৃত্যও হইত। রাজপুতানা বৈষ্ণব-প্রধান স্থান, কৃষ্ণ-বিষয়ক গান সকলের অত্যন্ত ভাল লাগে, তাই স্বামীজী একদিন গাহিলেন—

## স্বামী বিবেকানন্দ

(আমি) গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিয়ে শঙ্খের কুণ্ডল পরি।

যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যথায় নিষ্ঠুর হরি ॥

(আমি) মথুরানগরে

প্রতি ঘরে ঘরে

খুঁজিব যোগিনী হয়ে।

যদি কোন ঘরে

মিলে প্রাণবঁধু

বাঁধিব অঞ্চল দিয়ে ॥

আমি আপন বঁধুয়া

আপনি বাঁধিব—

রাখিতে নারিবে কেউরে।

যদি রাখে কেউ

তাজিব এ জীউ

নারীবধ দিব তারে ॥

গাহিতে গাহিতে তাঁহার গণ্ড বহিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সকলের চক্ষে জল—দৃষ্টি সেই মহাপুরুষের প্রতি। কেহ ভাবিতেছেন,—“বাবাজী নিশ্চয় বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছেন, তাই এত প্রেমবিভোর। নতুবা আমরাও ত তাঁহাকে ডাকি, কিন্তু কৈ, আমাদের ত এমন তন্ময়তা হয় না।” কেহ বা ভাবিতেছেন,—“এইটুকু ঈশ্বরের বিভূতি, ইনি নিশ্চয় ঈশ্বরলাভ করিয়াছেন।” গাহিতে গাহিতে স্বামীজীর স্বর ক্রমে করুণ হইতে করুণতর হইয়া আসিল, হৃদয়ের আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ ও দেহ প্রস্তুতবৎ কঠিন হইয়া গেল এবং মুখশ্রী প্রাণবঁধুর স্পর্শে উৎক্লিষ্ট গোপিকার ন্যায় প্রেমরাগে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব আভা ধারণ করিল।

স্বামীজী যে সকল বাঙ্গালা গান গাহিতেন, শ্রোতৃবৃন্দের সুবিধার জন্ত গাহিবার পূর্বে সেগুলি হিন্দিতে বুঝাইয়া দিতেন। অনেকে সেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন, কেহ বা ভুলিয়া যাইবার ভয়ে লিখিয়া রাখিতেন।

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কয়দিন গেল কেহ তাহার হিসাব



## আলোয়ার রাজ্যে

রাখিল না—খেয়ালও করিল না। সকলেই তখন আশ্বহারা। এক এক দিন রাজি চারটা পর্য্যন্ত এইরূপ আনন্দ চলিত। আর রাজের মত বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিবার সময় সকলেরই মুখে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা। কেহ বলিতেছেন, ‘বাবাজীর হৃদয় আনন্দে ভরপুর, মুখে হাসি লেগেই আছে।’ কেহ কহিতেছেন, ‘মশায়, এমন সুন্দর শ্লোকপাঠ আর কারও মুখে শুনি নি, কণ্ঠে বেন রূপার তার বাজে।’ কেহ বলিলেন, ‘হাঁ, তাঁর কণ্ঠে নাদ আছে।’ আর একজন তাহা শুনিয়া বলিলেন, ‘শুধু তাই নয়, এমন একটা বৈদ্যাতিক শক্তি আছে যে শুনলেই মুগ্ধ হতে হয়।’ কেহ বা বলিল, ‘আর দেখেছেন, প্রকৃতিটি কি মধুর! এত লোক এত বিরক্ত করে, আহাম্মকের মত যা-তা জিজ্ঞাসা করে, তা রাগ নেই, সব কথার জবাব দিচ্ছেন।’ তদন্তরে আর একজন কহিলেন, ‘রাগ টাগ নেই, সিদ্ধপুরুষ—নইলে দেখুন না কেবল মনে হয় কতক্ষণে তাঁর কাছে যাব? ইচ্ছা হয় দিনরাত তাঁর নিকট বসে থাকি।’ ইত্যাদি—

ফলতঃ ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্থ সকলেই তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিল, প্রত্যেকে মনে করিত সে-ই সর্বাপেক্ষা স্বামীজীর অধিকতর প্রিয়। কিন্তু স্বামীজীর নিকট কোন ভেদ ছিল না, বরং গরীবের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও ভালবাসা আরও অধিক দেখা যাইত। তিনি তাঁহাদিগকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং কাহাকে কাহাকে ইষ্টলাভের পথ দেখাইবার জন্ত দীক্ষাও দিয়াছিলেন।

ইহাদের মধ্যে পূর্বোল্লিখিত মৌলবী সাহেব তাঁহার একজন প্রধান ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মনে একদিন স্বামীজীকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করাইবার অতি প্রবল ইচ্ছা হইল। ভাবিলেন, “স্বামীজী ত একজন শ্রেষ্ঠ ফকির, তাঁহার নিকট জাতিভেদ নাই, কিন্তু পণ্ডিতজী

## স্বামী বিবেকানন্দ

(অর্থাৎ শম্ভুনাথজী) হয়ত আপত্তি করিতে পারেন।" যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে একদিন সন্ধ্যার সময় অত্যাশ্চর্য্য দিনের মত স্বামীজীকে দর্শন করিতে গিয়া সকলের সাক্ষাতে করষোড়ে বুদ্ধ পণ্ডিতজীকে বলিলেন, "পণ্ডিতজী, আপনারা অনুমতি করিলে আমি কাল বাবাজীকে আমার কুটিরে লইয়া গিয়া ভিক্ষা দিই। তাঁহার জন্ত এমন বন্দোবস্ত করিব যে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। বৈঠকখানার সব জিনিসপত্র সরাইয়া ঘরটি উত্তমরূপে ধোয়াইব। তারপর ব্রাহ্মণের বাটী হইতে পিতলের হাঁড়িবাসন ইত্যাদি আনাইয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বাজার ও রসুই করাইব। স্বামীজী ঐ গৃহে বসিয়া সেবা গ্রহণ করিবেন, আর এ অবসর ঘন শুধু দূর হইতে তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।" মোলবী সাহেব এরূপ আন্তরিক বিনয় ও সৌজন্যের সহিত কথাগুলি বলিলেন যে, তাঁহার অকপটতায় কাহারও সন্দেহ হইল না। পণ্ডিতজী হাসিয়া সাদরে তাঁহার করমর্দন করিয়া বলিলেন, "দোস্ত, স্বামীজীর আবার জাতি কি? তিনি ত মুক্তপুরুষ! তবে তোমার যেরূপ অভিরূচি করিতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার এত কষ্ট করারও কোন দরকার ছিল না, কারণ তুমি যেরূপ ব্যবহার কথা বলিলে তাহাতে স্বামীজীর কথা ছাড়িয়া দাও, আমিই নির্বিবকার চিত্তে তোমার গৃহে ভোজন করিতে পারি।" সকলেই হাসিয়া মোলবী সাহেবকে লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন ও তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি ও দীনতার স্মৃতি করিলেন। পরদিন মোলবী সাহেবের অভিলাষ পূর্ণ হইল। স্বামীজী তাঁহার গৃহে আহার করিলেন। মোলবী সাহেবের সাধুসেবা দেখিয়া আরও কয়েকজন ভক্ত মুসলমানবন্ধু অতিশয় আগ্রহের সহিত স্বামীজীকে নিজ নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন।



## আলোয়ার রাজ্যে

ক্রমে ক্রমে আলোয়ার মহারাজের দেওয়ান মেজর রামচন্দ্রজী শুনিতে পাইলেন যে, নগরমধ্যে একজন মত্ত সাধু আসিয়া বাস করিতেছেন। শ্রবণমাত্র তিনি স্বামীজীকে অতি সমাদরে নিজালয়ে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামীজীর প্রভাবে আলোয়ার-রাজ্যের ইংরেজী-ভাবাপন্ন মতিগতির পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। এই ভাবিয়া তিনি মহারাজকে সংবাদ দিলেন, “একজন সাধু এখানে আসিয়াছেন। তিনি ইংরেজীতে প্রকাণ্ড পণ্ডিত।” মহারাজ তখন ঐ স্থান হইতে দুই-তিন মাইল দূরে একটি নিভৃত প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। দেওয়ানজীর পত্র পাইয়া তিনি পরদিন নগরে আগমন করিলেন ও একেবারে দেওয়ানজীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে দর্শন ও শ্রদ্ধাসহকারে প্রণাম করিয়া সাদরে নিজ সম্মুখে উপবেশন করাইলেন।

মহারাজের প্রথম কথা হইল—“আচ্ছা স্বামীজী মহারাজ, শুনিতেছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তা আপনি ত সহজেই অনেকটাকা উপার্জন করিতে পারেন। তাহা না করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন?” স্বামীজী উত্তর করিলেন, “মহারাজ, আপনি বলিতে পারেন, আপনি রাজকার্য্য অবহেলা করিয়া দিন-রাত্র সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়া শিকার করিয়া বেড়ান কেন?” সভাসদগণ ত স্বামীজীর কথার ভঙ্গীতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “একি দুঃসাহসিক সাধু! হয়ত এর কপালে আজ কি আছে।” কিন্তু মহারাজ স্বামীজীর কথা বীর-ভাবে শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, “কেন আমি ঐরূপ করি বলিতে পারি না, তবে হ্যাঁ, ঐরূপ করিতে ভাল লাগে।” স্বামীজী সহর্ষে বলিলেন, “বেশ, আমারও সেই রকম, ফকিরী করে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে।”

## স্বামী বিবেকানন্দ

মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বাবাজী মহারাজ, এই যে সকলে মূর্তি পূজা করে, আমার ওতে মোটেই বিশ্বাস নেই, তা আমার দশা কি হবে?” বোধ হয় একটু বিজ্ঞপের ছলে বলিয়াছিলেন বলিয়া কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিলেন। স্বামীজী প্রথমে যেন কথাটা প্রত্যয় হইতেছে না এইভাবে বলিলেন, “মহারাজ বোধ হয় রহস্য করিতেছেন।” মহারাজ বলিলেন, “না স্বামীজী, মোটেই নয়। দেখুন বাস্তবিকই আমি অণু লোকের মত কাঠ, মাটি, পাথর, ধাতু এ সকল পূজা করিতে পারি না। এতে কি পরজন্মে আমার নীচগতি হবে?” স্বামীজী বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন, “বাহার যেমন বিশ্বাস।” এই কথা শুনিয়া স্বামীজীর ভক্তেরা ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “একি হইল? স্বামীজী মহারাজের কথায় দেখে এই জবাব দিলেন! এতে ত উহার শ্রদ্ধাহীনতার আরও প্রশ্ন দেওয়া হইল। আর কি বলিয়া তিনি এরূপ মনরাখা কথা বলিলেন? এত তাঁহার নিজের ভাব নয়।” তাঁহারা সকলেই মূর্তিপূজার দৃঢ়বিশ্বাসী এবং কৃষ্ণভক্ত। স্বামীজীর কৃষ্ণভক্তি তাঁহারা অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং এক এক দিন তাঁহাকে শ্রীবিহারীজীর সমক্ষে প্রেমে গদগদ হইয়া গড়াগড়ি দিতে ও অশ্রুজলে ভাসিতেও দেখিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে স্বামীজীর কথায় তাঁহাদের হৃদয়ে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। ঠিক সেই সময়ে স্বামীজী তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নির্ভীকতায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন।

সন্মুখের দেওয়ালে আলোয়ার মহারাজের একখানা ফটোগ্রাফ টাঙ্গান ছিল। হঠাৎ তাহার উপর নজর পড়ায় স্বামীজী একজনকে তাহা নামাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। সে ব্যক্তি তাহা নামাইয়া আনিতে তিনি ছবিখানি স্বহস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কার ছবি?”



## আলোয়ার রাজ্যে

দেওয়ানজী উত্তর করিলেন, “মহারাজের।” সকলে বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, স্বামীজীর মতলব কি। কিন্তু কেহই কিছু ঠাহর করিতে পারিলেন না। যুদ্ধকাল পরে যখন স্বামীজী গম্ভীরবরে দেওয়ানজীকে আদেশ করিলেন, “দেওয়ানজী, এই চিত্রের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর,” তখন সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। মহারাজের সম্মুখে এ কি স্পর্দ্ধার কথা! স্বামীজী পুনরায় সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেহ হউক এই ছবির উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর।” কেহই অগ্রসর হইল না দেখিয়া তিনি বলিলেন, “এ কি? এ ত একখানা কাগজ মাত্র! ইহাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে তোমাদের কি এত আপত্তি?” দেওয়ানজীও বজ্রাহতপ্রায়, আর সকলে ভয়ে জড়সড়—একবার মহারাজের দিকে, একবার স্বামীজীর দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। কাহারও মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরণ হইতেছে না। দেওয়ানজী ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন, “স্বামীজী, আপনি এ কি আদেশ করিতেছেন? ইহা আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি—ইহার প্রতি আমরা কিরূপে অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারি?” স্বামীজী বলিলেন, “কেন, মহারাজ ত আর সশরীরে ঐ চিত্রে বিদ্যমান নাই! উহাতে না আছে তাঁহার হাড় মাস রক্ত, না আছে তাঁহার কথাবার্তা, না আছে তাঁহার চালচলন। উহা তো এক খণ্ড কাগজমাত্র, ইহা সবেও তোমরা উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে এত ভয় বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছ কেন?” কিন্তু তথাপি কেহ কোন উত্তর দিল না বা তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিল না। অবশেষে তিনি নিজেই বলিলেন, “ভয় কেন? না, এই ফটোতে তোমরা মহারাজের ঐ সাদৃশ্যটুকু, ঐ ছায়াটুকু দেখিতে পাইতেছ। উহার উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে গেলেই তোমাদের অনুভব হইতেছে যেন স্বয়ং

## স্বামী বিবেকানন্দ

মহারাজেরই গাত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা হইতেছে।” এতক্ষণ পরে দেওয়ানজী ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে।” স্বামীজী তখন মহারাজের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “মহারাজ দেখুন—যদিও এই চিত্রটি আপনি নহেন, এক টুকরা কাগজ মাত্র, তথাপি ইহারা উহাকে ঠিক আপনার মতই ভাবেন, কারণ উহাতে আপনার প্রতিবিম্ব বিদ্যমান। সুতরাং এক হিসাবে ঐ চিত্রের সহিত আপনার কোন প্রভেদ নাই। উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আপনার স্মৃতি ইহাদের চিত্রপটে জাগিয়া উঠে—অনুভব হয় যেন আপনি স্বয়ং সম্মুখে বিদ্যমান। সেই হেতু সকলেই প্রকৃত মহারাজকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, এই চিত্রকেও সেইরূপ সম্মানের চক্ষে দেখেন। ভগবদ্ভক্ত ও প্রস্তুত বা ধাতুনির্মিত দেবদেবীর মূর্তিকে এইভাবে দেখেন। তাঁহার প্রস্তুত বা ধাতুবোধে ঐ সকল মূর্তির উপাসনা করেন না, উহার মধ্যে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কোন লীলার ভাব প্রত্যক্ষ করেন। মূর্তিটি শুধু মনে আরাধ্য দেবতার স্মৃতি ফুটাইয়া তোলে বা তাঁহার কোন গুণকে স্মরণ করাইয়া ভাবের উদ্দীপন করে। ইহাই প্রকৃত প্রতীকোপাসনাতত্ত্ব। আমি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি দেখি নাই মূর্তিপূজক বলিতেছে, ‘হে প্রস্তুত, আমি তোমার উপাসনা করি। হে ধাতু, আমার প্রতি সদয় হও!’ মহারাজ, সকলেই সেই এক পূর্ণ পরব্রহ্মসত্তার উপাসনা করিয়া থাকে এবং তিনিও ভক্তের ভাব ও আকাজক্ষা অনুযায়ী তাহার নিকট আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করেন। পাষণ বা ধাতু মূর্তি দেখিলে সেই চিন্ময় ইষ্টকেই মনে পড়ে, তাই ভক্ত ঐ মূর্তির এত সম্মান করেন। মহারাজ, আমি ত এইভাবে দেখি, অপরের কথা বলিতে পারি না।”

মহারাজ মঙ্গলসিংহ এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে স্বামীজীর বচন শ্রবণ করিতে-



## আলোয়ার রাজ্যে

ছিলেন। স্বামীজীর কথা শেষ হইলে তিনি করযোড়ে নিবেদন করিলেন, “প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, তাহার প্রতি বর্ষ সত্য। আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আজি আমার চক্ষু খুলিল।” স্বামীজী গাত্ৰোত্থান করিলে মঙ্গলসিংহজী বলিলেন, “মহারাজ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।” উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, “রাজন্! পরমাত্মা ব্যতীত কেহ কাহাকেও অনুগ্রহ করিতে পারে না। তিনি অসীম করুণাসিদ্ধ। আপনি তাঁহার শরণাগত হউন, তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে রূপা করিবেন।”

স্বামীজী প্রস্থান করিলে পর মহারাজ কিয়ৎক্ষণ চিন্তামগ্নভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া কহিলেন, “দেওয়ানজী! এরূপ মহাত্মা আর কখনও আমার নয়নগোচর হয়েন নাই। ইঁহাকে কিছুদিন এখানে রাখিতে পারেন না?” দেওয়ানজী সাধ্যমত মহারাজের আদেশপালনের অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, “বলিতে পারি না মহারাজ, কারণ ইনি অতি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি। হয়ত এখানে থাকিতে ইচ্ছুক হইবেন না। তবে আমি যেরূপে পারি ইঁহার সন্ধান রাখিব।” দেওয়ানজী মহারাজের অভিপ্রায় স্বামীজীর গোচর করিলে ও আলোয়ারে কিয়দ্দিন যাপন করিবার জন্য তাঁহাকে সর্বিশেষ অনুরোধ করিলে স্বামীজী দেওয়ানজীর প্রস্তাবমত তাঁহার আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন—কিন্তু এই সর্ত্তে বে, ধনী দরিদ্র মুর্থ বা পণ্ডিত নির্বিশেষে যে-সকল শ্রেণীর লোক এখন তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছে, পরেও তাহারা তেমনি স্বাধীনভাবে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে পারিবে। দেওয়ানজী সাহসাদে স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলে স্বামীজী তাঁহার আলয়ে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

এই সময়ে স্বামীজীর সংস্পর্শে বহু ব্যক্তির জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তিনি স্থানান্তরে যাইবার প্রস্তাব করিলেই তাঁহাদের মুখ শুকাইয়া যাইত, বলিতেন, “মহারাজ, দয়া করিয়া আরও কিছুদিন থাকুন, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় না।” স্বামীজীর হৃদয় পুষ্প হইতেও কোমল, স্মৃতরাং একমাসের মধ্যে তাঁহার যাওয়া ঘটির উঠিল না।

একজন বৃদ্ধ প্রত্যহ তাঁহার নিকট আসিয়া আশীর্বাদ ও দয়া ভিক্ষা করিত। স্বামীজীও তাহাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া তদনুযায়ী কার্য করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি উপদেশানুযায়ী কার্য না করিয়া কেবল বলিত—“আমার কুপা করুন, আমার আশীর্বাদ করুন” ইত্যাদি। বহুদিন ধরিয়া প্রত্যহ ঐরূপ করাতে স্বামীজী আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। একদিন দূর হইতে সেই ব্যক্তিকে আসিতে দেখিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিব্রাজলাভমানসে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। বৃদ্ধ আসিয়া পূর্ববৎ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে লাগিল ও হৃৎ রকম কথা পাড়িল। কিন্তু স্বামীজী নির্বাক, নিশ্চল, এমন কি পূর্ব হইতেই বাহাদিগের সহিত খুব আলাপ করিতেছিলেন তাহাদিগেরও কথার উত্তর দেওয়া বন্ধ করিলেন। কেহ তাঁহার এইরূপ আকস্মিক ভাব-পরিবর্তনের কোন কারণ অনুমান করিতে পারিলেন না। এইভাবে দেড়ঘণ্টা কাটিয়া গেল, অথচ স্বামীজী প্রস্তরমূর্তির স্থায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, চোখের পাতাটি পর্যন্ত পড়িল না। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি অবশেষে অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনমনে বকিতে বকিতে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। স্বামীজী তখন বালকের স্থায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন ও উপস্থিত সকলে তাঁহার হাস্তে যোগদান করিল। এই ব্যাপার দর্শনে একজন সুবক তাঁহাকে



## আলোয়ার রাজ্যে

জিজ্ঞাসা করিল, “বাবাজী মহারাজ, আপনি বুদ্ধের উপর আজ এত বিরূপ হইলেন কেন?” স্বামীজী সম্মেহ-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বাবা, তোমাদের শ্রায় যুবকগণের জ্ঞান আমি প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নহি, কারণ তোমরা বালক, আমি বাহা বলিব তাহা প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে এবং ঐক্লপ করিবার শক্তিও তোমাদের আছে। কিন্তু এই বুদ্ধটি জীবনের তিনকাল ইন্দ্রিয়সেবার কাটাইয়া এক্ষণে ঐহিক ও পারমাণ্বিক উভয়বিধ পথের পক্ষে অক্ষম ও অপটু হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং উনি এখন সত্যায় কীকি দিয়া ঈশ্বরের দয়া খুঁজিতেছেন, যদি তাহাতে কার্য্য সারিতে পারেন, পুরুষকার একেবারেই নাই। কিন্তু পুরুষকার-বর্জিত ব্যক্তির প্রতি কি ঈশ্বরের দয়া হয়? বুঝিয়া দেখ, অর্জুনের শ্রায় মহাবীর কুরুক্ষেত্রে পুরুষকার হারা হইতে উত্তত হইয়াছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে গীতার উপদেশ দিয়া তাঁহার পুরুষার্থ জাগাইলেন, কৰ্ম্ম স্বধৰ্ম্ম সব করাইলেন। বাহার পুরুষার্থ নাই, সে ত তমোগুণে আচ্ছন্ন। তমোগুণীর কি ধৰ্ম্ম হয়? তাহাকে পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়া রজোগুণী হইতে হইবে। স্বধৰ্ম্মপালক, নিকাম কৰ্ম্মসাধন প্রভৃতি দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ করিতে হইবে—তবে ধৰ্ম্মলাভ। যে গৃহী স্বধৰ্ম্মই করিতে পারে না, কোন প্রকার নিকাম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহার নিবৃত্তি আসিবে কেমন করিয়া? উনি চান নিবৃত্তি, অথচ প্রবৃত্তির কোন কার্য্যই অনুষ্ঠান করিবেন না—মহা তমোগুণী। চোর হইয়া যে চুরি করিতে পারে, আমার মতে এমন দৃঢ়চেতা হৃষ্ট লোকও ভাল, কারণ তাহার পুরুষকার আছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে। একদিন ঐ দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরতাই তাহাকে হয়ত কুপথ হইতে সুপথে ফিরাইয়া আনিবে এবং অসত্যের স্থলে সত্য ও প্রবৃত্তির স্থলে নিবৃত্তিকে

## স্বামী বিবেকানন্দ

তাহার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবে, কিন্তু দুর্বল লোকের দ্বারা কোন কার্য সিদ্ধ হয় না—তাহার উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক ও সে যতই সংসঙ্গ করুক।”

স্বামীজীর উপদেশানুসারে আলোয়ানের অনেকগুলি যুবক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। সময়ে সময়ে স্বামীজী স্বয়ং ঐ শিক্ষা দিতেন ও বলিতেন, সংস্কৃত বিদ্যার প্রভূত চর্চা কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসটাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কর। কারণ বর্তমানে এদেশের ইতিহাস অতিশয় অসম্পূর্ণ ও ঘটনার পৌরোপাখ্য-রক্ষণ-বিষয়ে উদাসীন। আর ইংরেজ লেখকগণ এদেশের যে সকল ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের অধঃপতনের চিত্রগুলিই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, উহা পাঠ করিলে হৃদয়ে দৌর্বল্য উপস্থিত হয়। তাঁহারা বিদেশীয়, এদেশের আচার-ব্যবহার, ধর্ম, দর্শন, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহাদের দ্বারা এদেশের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হওয়া কখনই সম্ভব নহে, সুতরাং তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে শত শত ভ্রমপ্রমাদ ও অপসিদ্ধান্ত পরিলক্ষিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? তবে ইউরোপীয়েরা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন, কি করিয়া পুরাতত্ত্ব আলোচনা ও প্রাচীন ইতিবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হয়। এখন আমাদের এই সকল পথে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা উচিত ও প্রয়োজন। বেদ-পুরাণাদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ ও তৎসাহায্যে ভারতের একটি যথার্থ ইতিহাস সঙ্কলন কর। শিবাজীর জীবন অনুসন্ধান কর, দেখিবে তিনি একজন জাতি-প্রতিষ্ঠাতা মহা-শক্তিশালী পুরুষ—ইংরেজ ঐতিহাসিক-চিত্রিত দস্যু নহেন। প্রকৃতপক্ষে বৈদিক কাল হইতে বুদ্ধান্তর্ধানের পর এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত আমাদের কোন ধারাবাহিক



## আলোয়ার রাজ্যে

ইতিহাস পাওয়া যায় না। অবশ্য এখন এ বিষয়ে একটা নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস ভারতসন্তান কর্তৃক গ্রথিত হওয়াই উচিত। তোমরা বিশ্বভিত্তিসাগর হইতে এই লুপ্তরত্ন-উদ্ধারের জ্ঞান বন্ধপরিকর হও। উহাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিবে ও উহার ক্রমোন্নতির সহিত দেশে প্রকৃত স্বদেশানুরাগ জাগ্রত হইবে।”

আলোয়ারবাসী যুবকগণ স্বামীজীর বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদের কল্যাণের জ্ঞান নিয়ত প্রার্থনা করিতেন ও তাহাদের উপর খুব ভরসা রাখিতেন। তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগবহি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল ও তাহারা তাঁহাকে আপনাদিগের নেতা ও গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল।

একদিন স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “নিকটে কোন সাধু আছেন কি না।” তত্বতরে একজন বলিল, “কিছু দূরে একজন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী আছেন।” স্বামীজী বলিলেন, “আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া চল ও তাঁহার সহিত দর্শন করাইয়া দাও।” তখন দুইজনে সেই ব্রহ্মচারীর আশ্রমে গমন করিলেন। ব্রহ্মচারীজী বোধ হয় বৈষ্ণব ও বৈদান্তিক সাধুদিগের উপর বিশেষ কুপিত ছিলেন। কারণ, দূর হইতে স্বামীজীকে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি গেরুয়ার শত সহস্র নিন্দা ও সন্ন্যাসীদিগের উপর অথবা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলিলেন, “তুই গেরুয়া পরেছিস কেন? আমি গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টক্ষেপে দেখতে পারি না।” স্বামীজী কোন বাদপ্রতিবাদ না করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট ঈশ্বর ও ধর্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মচারী ঈষৎ প্রশন্ন হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা বাক, তোর ওপর আমার তেমন

## স্বামী বিবেকানন্দ

রাগ নেই, তুই কিছু খাবি? স্বামীজী করঘোড়ে বলিলেন, “আজ্ঞে, এইমাত্র ভিক্ষা করে আসছি, এখন আর কিছু আহারের আবশ্যক নেই। আপনি অনুগ্রহ করে কিছু তত্ত্বকথা বলুন, আমি শুনি।” আর কোথায় যাবি! ব্রহ্মচারী এ কথা শুনিবামাত্র পুনরায় বিষম ক্রোধ প্রকাশপূর্বক চীৎকার করিয়া বলিলেন, “তবে যা, দূর হ, কিছু খাবিনি ত দূর হ।” স্বামীজী তদনুসারে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে সাধুদর্শন করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি স্বামীজীর এরূপ অবমাননায় অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন, স্বামীজী হয়ত তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। এই ব্যাপারে অসন্তোষের পরিবর্তে তাঁহার এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, যতক্ষণ ব্রহ্মচারীর নিকটে ছিলেন, ততক্ষণ অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া ছিলেন। কিন্তু রাস্তায় আসিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, এমন হাসিয়া উঠিলেন যে তাঁহার সহচরটি পর্য্যন্ত না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তারপর, “আচ্ছা সাধু দেখালে বাবা, কি তিরিক্ষে মেজাজের লোক, আর কি গালাগালির চোট রে বাবা !”—এই বলিয়া পুনরায় হাস্য করিতে লাগিলেন এবং সেই ব্রহ্মচারীর মত নকল করিয়া আপনি হাসিতে ও সঙ্গীটিকে ততোধিক হাসাইতে লাগিলেন।

স্বামীজীর গুণাবলী, চরিত্র-মহিমা ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা সকলকেই মুগ্ধ করিল। যে সকল লোক প্রতিদিন তাঁহার নিকট আসিতেন, তাঁহাদের কেহ একদিন অনুপস্থিত হইলে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন ও কাহারও দ্বারা তাহার সংবাদ আনাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালক আসিয়া উপস্থিত, তাহার উপনয়নের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, অথচ উপনয়ন হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলেন পেটের অন্নই জুটে না,



## আলোয়ার রাজ্যে

তা আবার উপনয়ন-সংস্কার! স্বামীজীর আর অল্প চিন্তা নাই। যিনি তাঁহার নিকট আসেন, তাঁহাকেই বলেন, “আমার এক ভিক্ষা আছে— অর্থাভাবে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বালকটির উপনয়ন হইতেছে না, তোমাদের ত্রায় গৃহস্থগণের কর্তব্য, এ বিষয়ে উহাকে সাহায্য করা। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া উহার ঐ কার্যটি উদ্ধার করিয়া দাও ও সঙ্গে সঙ্গে যদি পার উহার শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা কর। এত বড় ব্রাহ্মণ-বালকের পক্ষে বর্ণা-শ্রমোচিত সংস্কারবিহীন হইয়া থাকা বড় নিন্দার কথা।” তাঁহার অনুরোধে ভক্তেরা আপনাদিগের মধ্যে টাকা তুলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করার স্বচক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন-কার্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তবে তাহার কথা তিনি বিশ্বস্ত হন নাই, তাহার প্রমাণ এই যে মাসখানেক পরে আলোয়ারের এক বন্ধুকে তিনি যে পত্র লেখেন, তাহার আরম্ভেই ঐ বালকের উপনয়ন সমাধা হইয়াছে কি না তাহার খোঁজ করিয়াছিলেন।

এইভাবে প্রায় দুইমাস অতীত হইলে স্বামীজী বলিলেন, “আর এখানে থাকা যায় না।” ইহা শুনিয়া তাঁহার জনৈক মন্ত্রশিষ্য তাঁহাকে আপন আলয়ে ভিক্ষা করিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী যখন তাঁহার বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন, শিষ্য তখন স্নান করিতেছিলেন। স্বামীজী উপবিষ্ট হইলে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, “বাবাজী, তেল মাখার কি কোন উপকার আছে?”

স্বামীজী কহিলেন, “আছে বৈকি! এক ছটাক তেল ভাল করে মাথলে এক পোয়া ঘি খাওয়ার কাজ করে।”

আহারাতির পর নানা কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, “স্বামীজী মহারাজ, আপনি বলেন, চরিত্রের দিকে আমাদের বিশেষ নজর রাখা

## স্বামী বিবেকানন্দ

চাই—সত্যনিষ্ঠ, অকপট, পরোপকারী, কর্মঠ, আর অসীম সাহসী হওয়া চাই; এ সব না থাকলে গৃহস্থ স্বধর্ম করতে পারে না, চিত্তশুদ্ধি হয় না—কিন্তু চাকুরী করা ত দাসত্ব, তাতে এ সব ভাব আসে না দেখছি—তাই ভাবি, আমাদের ত অর্থোপার্জন করতে হবে, নইলে নিকাম কার্যের অনুষ্ঠান কেমন করে করব? আজকালকার ব্যবসা যে রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে ত অনেক ম্যাচকাফের আছে। আমার মনে হয়, এতে অনেক অর্থের আবশ্যক, তারপর সরলতা থাকে না। তা মহারাজ, কোন্ কাজ করলে সব দিক বজায় থাকে?”

স্বামীজী উত্তর করিলেন, “দেখ, এ বিষয়ে আমিও অনেক ভেবেছি, কিন্তু দেখতে পাই চরিত্র বজায় রেখে অর্থ উপার্জন করতে কেউ বড় চায় না, এ বিষয়টা নিয়ে কেউ ভাবে না, কারুর মনে একটা সমস্তা উঠে না। আমাদের শিক্ষার দোষেই এটা দাঁড়িয়েছে; যা হোক আমি ত ভেবে চিন্তে চাষবাস করাটা বড়ই ভাল মনে করছি। চাষবাসের কথা বললেই এখন মনে হয় তবে লেখাপড়া কেন শিখলাম? চাষবাসের কথা বললেই প্রথমে মনে হয় দেশশুদ্ধ লোককে কি আবার চাষা হয়ে দাঁড়াতে হবে! দেশশুদ্ধ লোক ত চাষা আছেই, তাই না আমাদের এত দুর্গতি। তা নয়, মহাভারত পড়ে দেখ—জনক ঋষি এক হাতে লাঙ্গল দিচ্ছেন, আর এক হাতে বেদ অধ্যয়ন করছেন। আমাদের দেশের ঋষিরা সকলেই ঐ কাজ করেছেন, আবার আজকাল দেখ, আমেরিকা চাষবাস করেছে এত বড় হয়েছে। নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষবাস নয়, বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে। পল্লীগ্রামের ছেলেরা ছপাতা ইংরেজী পড়ে শহরে পালিয়ে আসে, গ্রামে হয়ত অনেক জায়গা জমি আছে, তাতে তাদের গোট ভরে না—মনের তৃপ্তি হয় না। শহরে হতে হবে, চাকরী করতে হবে,



## আলোয়ার রাজ্যে

অত্যাশ্চর্য জ্ঞাতের মত আমাদের হিন্দু জাতটা তাই বেড়ে উঠতে পারছে না। আমাদের মূল্যসংখ্যা এত বেশী যে, যদি এরকম ভাবে জন্ম-মৃত্যু চলতে থাকে, তা হলে ত আমরা মরতে বসেছি। এর একটা কারণ, উৎপন্ন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না। শহরে বাস করার বোঁক বেশী, আর একটু পড়াশুনো করলেই চাষার ছেলে স্বার্থ ত্যাগ করে গোয়ার গোলামী করতে দৌড়ায়। পল্লীগ্রামে বাস করলে পরমায়ু বাড়ে, রোগ ত প্রায় হয় না। ছোটখাটো খারাপ গ্রামগুলো ভাল হয়ে উঠে, লেখাপড়া জানা লোকে পল্লীগ্রামে বাস করলে, আর চাষ-বাসটা বিজ্ঞানসাহায্যে করলে উৎপন্ন বেশী হয়—চাষাবের চোখ খুলে যায়; তাদেরও একটু আধটু বুদ্ধি খোলে, লেখা পড়া করতে ইচ্ছে হয়, আর যেটা আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা বেশী আবশ্যক তাও হয়।”

শিষ্য আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেটা কি স্বামীজী?”

স্বামীজী আবার বলিতে লাগিলেন, “এই ছোট জ্ঞাত আর বড় জ্ঞাতের মধ্যে একটা ভাই ভাই ভাবে মেশামিশি হয়। যদি তোমাদের মত লোকেরা কিছু লেখা পড়া শিখে পল্লীগ্রামে থেকে চাষ-বাস করে, আর চাষা লোকদের সঙ্গে আপনার মত ব্যবহার করে, ঘৃণা না করে, তা হলে দেখবে তারা এতই বশীভূত হয়ে পড়বে যে, তোমার জ্ঞাত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হবে। যেটা আমাদের এখন অত্যাবশ্যক—জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া—ছোট জ্ঞাতের মধ্যে ধর্মের উচ্চ উচ্চ ভাব দেওয়া, পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা, উপকার করতে শেখান, তাও অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্ত হবে।”

শিষ্য আবার প্রশ্ন করিলেন, “সে কেমন করে হবে?”

স্বামীজী বলিলেন, “কেন, দেখ না পল্লীগ্রামে ছোট জ্ঞাতের সঙ্গে

## স্বামী বিবেকানন্দ

একটু মেশামিশি করলে তারা কেমন আগ্রহের সহিত ভদ্রলোকের সঙ্গ করতে চায়। জ্ঞানপিপাসা যে সকল মানুষের ভেতর রয়েছে, তাই না তারা একজন ভদ্রলোক পেলে তাঁকে ঘিরে বসে, আর তাঁর কথা গিলতে থাকে। তাঁরা সেই সুযোগে যদি নিজের বাড়ীতে ঐ রকম তাদের সব জড় করে সন্ধ্যার সময় গল্পছলে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলন করে হাজার বৎসরে বা না করতে পারা যাবে, তার শতগুণ বেশী ফল দশ বৎসরে হয়ে পড়বে।”

পরদিন অর্থাৎ ২৮শে মার্চ স্বামীজী আলোয়ারের ভক্তমণ্ডলীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।



## জয়পুর ও খেতড়িতে

আলোয়ার হইতে স্বামীজী পাণ্ডুপোল অভিমুখে চলিলেন। পাণ্ডুপোল আলোয়ার হইতে ১৮ মাইল। প্রথমে তাঁহার সঙ্কল্প ছিল পদব্রজেই যাইবেন, কিন্তু ভক্ত ও বন্ধুদের উপরোধে তাহা না হইয়া তাঁহাকে রথে (এক প্রকার গরুর গাড়ী) বাইতে হইল। এই সকল ভক্ত ও বন্ধু আলোয়ার হইতে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে অন্ততঃ ৫০৬০ মাইল পর্য্যন্ত বাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্বামীজী প্রথমে তাঁহাদের নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের মনঃকোন্ডের সম্ভাবনা দেখিয়া উহাতে সম্মতি দান করেন।

পাণ্ডুপোলে পৌছিয়া রাজিটা তাঁহার তত্ত্ব্য প্রসিদ্ধ হুম্মানজীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে বাপন করিলেন এবং পরদিন প্রভাতে গো-যান ত্যাগ করিয়া ১৬ মাইল দূরবর্তী টাহলা নামক গ্রামে যাত্রা করিলেন। পথটি পর্বত সঙ্কুল ও হিংস্রবনজঙ্ঘম-পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁহার স্বামীজীর মধুর গল্প ও সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে প্রক্লান্ত অন্তঃকরণে গমন করিতে লাগিলেন।

টাহলায় নীলকণ্ঠ মহাদেবের একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। তাঁহার সেই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সমুদ্রমহনকালে দেবাসুর যুদ্ধের পরিণামে বিষ উদ্গীর্ণ হইলে কেমন করিয়া মহাদেব তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ ও মৃত্যুঞ্জয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে করিতে স্বামীজী ঐ পৌরাণিক বৃত্তান্তের একটি মনোহর ব্যাখ্যা করিলেন। বলিলেন, “সমুদ্রটা হচ্ছে মায়া-সমুদ্র। এই রূপ-রস-গন্ধাদিময় বিচিত্র জগৎ হচ্ছে মায়ার রচনা। এখানে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর নানারূপ ভোগ্যপদার্থ আছে, সে

## স্বামী বিবেকানন্দ

সকল পদার্থ যতই ভোগ কর, পরিণামে তা থেকে হলাহল উদ্গীর্ণ হবে। সে হলাহল আত্মজ্ঞানের পরিপন্থী। কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নিকট তা ব্যর্থ, নিস্তেজ। ভূমানন্দে মগ্ন সন্ন্যাসী মানুষের কুহকে প্রভাবিত হন না, বরং দেবাদিদেব শঙ্করের ত্রায় ইন্দ্রিয়ভোগতৎপর জীবকুলকে মরণাদি ভয়াবহ অবস্থায় সাহায্য করেন ও তাহাদের উদ্ধারসাধনার্থ স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন। তিনি মানুষকে বিনাশ করে মৃত্যুর কবল হতে জগৎকে রক্ষা করেন, সকলকে দেখান যে মানুষজন্মী পুরুষ মৃত্যুকেও জয় করতে সমর্থ।<sup>১০</sup> এই বলিয়া স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ বিগ্রহের সম্মুখে ধ্যানস্থ রহিলেন।

পরদিন প্রভাতে তিনি এখান হইতে ১৮ মাইল দূরবর্তী নারায়ণীতে এক দেবীস্থানে গমন করিলেন। এখানে প্রতি বৎসর একটি সুবৃহৎ মেলা হয় ও দেবীর পূজার জন্ত রাজপুতানার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক নরনারীর সমাগম হয়। এখান হইতে স্বামীজী ভক্ত-বন্ধুদিগকে বিদায় দিলেন ও একাকী ১৬ মাইল দূরবর্তী বসওয়া নামক রেলওয়ে স্টেশনে উপনীত হইলেন; তথা হইতে রেল চড়িয়া জয়পুর যাত্রা করিলেন। এই স্থানের নিকটেই বান্দীকুই নামক স্টেশনে একজন ভক্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি ঐ স্থানে ট্রেনে উঠিলেন। তার পর জয়পুরে পৌঁছিয়া স্বামীজীকে একখানি ফটো তোলাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। আলোয়ারবাসী বন্ধুগণ এ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন, সেই জন্তই তিনি আরও ধরিয়া বসিলেন। শিষ্যদিগের সম্ভোবার্থ অগত্যা স্বামীজী অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহাই তাঁহার পরিব্রাজকবেশের প্রথম চিত্র। ছবিখানিতে পরিব্রাজকের ভাব বেশ ফুটিয়াছিল।

আলোয়ার হইতে জয়পুরে আসিয়া স্বামীজী তথায় দুই সপ্তাহ



## জয়পুর ও খেতড়িতে

রহিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণের পরিচয় লাভ করিয়া তিনি তাঁহার নিকট পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু পণ্ডিতজী নিজে ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী তত সরল ছিল না। তিনি ক্রমান্বয়ে তিন দিবস ধরিয়া প্রথম সূত্রের ভাষ্যটি ব্যাখ্যা করিলেন, তথাপি স্বামীজীকে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারিলেন না। চতুর্থ দিবসে বলিলেন, “স্বামীজী, আমার আশঙ্কা হইতেছে, যখন তিন দিনেও প্রথম সূত্রের অর্থ আপনার বোধগম্য করাইতে পারিলাম না, তখন আমার দ্বারা আপনার বিশেষ উপকার হইবে না।” স্বামীজী পণ্ডিতজীর এই উক্তিভে অতিশয় লজ্জা বোধ করিয়া দৃঢ়পণ করিলেন, যে করিয়াই হউক নিজের চেষ্টায় ভাষ্যের অর্থ উপলব্ধি করিবেন এবং যতক্ষণ না অর্থবোধ স্পষ্ট হয়, ততক্ষণ অল্প কোন কার্য করিবেন না। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি নির্জনে পুনঃ পুনঃ ভাষ্যটি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এমনই আশ্চর্য ফল ফলিল যে, পণ্ডিতজীর সাহায্যে তিন দিনেও বাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, নিজ চেষ্টায় তিন ঘণ্টায় তাহা জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে তিনি পণ্ডিতজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভাষ্যটি ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সরল, স্মৃতিস্থিত, গূঢ়লক্ষ্যার্থ-সম্পন্ন ব্যাখ্যা শ্রবণে পণ্ডিতজী একেবারে স্তম্ভিত। অনন্তর তিনি সূত্রের পর সূত্র ও অধ্যায়ের পর অধ্যায় অনারামেই বৃষ্টিতে লাগিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি পরে বলিতেন, “সংকল্পই সব, যনে যদি আগ্রহ আসে, তবে কোন কাজ পড়িয়া থাকে না।”

জয়পুর ত্যাগ করিয়া আজমীর হইয়া তিনি আবু পর্বতের রমণীয় সৌন্দর্য্যদর্শনে গমন করিলেন। এখানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রায় আট

## স্বামী বিবেকানন্দ

কোটি টাকা ব্যয়ে একটি জৈন-মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহার ভাণ্ড অপূর্ণপ কারুকার্যবিশিষ্ট মন্দির ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা নির্মাণ করিতে চৌদ্দ বৎসর লাগিয়াছিল এবং দুই জন ধার্মিক জৈন বণিক-ভ্রাতা ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। স্বামীজী কয়েক দিন ধরিয়া এই মন্দিরের অদ্ভুত কারুকার্য তন্ন তন্ন করিয়া দর্শন করিলেন ও তাহাদের গৌরবে সমগ্র ভারতের গৌরব অনুভব করিলেন। মন্দিরের সর্বত্র দর্শন শেষ হইলে তিনি পর্বতবক্ষ-শোভিত বিশাল হ্রদের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিলেন। স্থানটি তাঁহার নিকট যেন নন্দনকাননের স্থায় মনোহর প্রতীত হইল। কিছু দিন এই ভূস্বর্গে অতিবাহিত করিয়া তিনি পুনরায় আজমীড় যাত্রা করিলেন।

আজমীড়ে তিনি আকবর সাহের প্রাসাদ ও দরগা নামে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা-ভাজন মুসলমান ফকির চিন্তি সাহের সমাধিক্ষেত্র দর্শন করিলেন। এখানে তিনি আর একটি জিনিস দেখিলেন, যাহা ভারতের আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সেটি ব্রহ্মার মন্দির।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে স্বামীজী আজমীড় ত্যাগ করিয়া পুনরায় আবু পর্বতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এইবার ভাগ্যচক্রে খেতড়ির মহারাজের সহিত পরিচিত হইলেন। আবুতে তাঁহার কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কোটার রাজা ও ঠাকুর ফতেসিংহের উকীল ও রাজার পূর্ব মন্ত্রী নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদেরই একজনের ভবনে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার এক ভক্ত খেতড়ির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলালকে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী সকাল হইতে বকিয়া বকিয়া তখন বিশ্রাম করিতে ছিলেন, একটু ঘুমও আসিয়াছিল। জগমোহনজী উচ্চশিক্ষিত, তাঁহার ধারণা সাধুর বেশে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের অধিকাংশই চোর



## জয়পুর ও খেতড়িতে

ছেঁচড়। সুতরাং সামান্য একটা কোপীন ও বহির্দাস-পরিহিত ব্যক্তিকে দেখিয়া তিনি প্রথমটা বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু অনতি-বিলম্বে স্বামীজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন মুন্সীজী তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। বহুক্ষণ আলাপের ফলে তাঁহার অনেকগুলি ভ্রান্ত ধারণা ও সন্দেহ দূর হইল এবং তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্থির করিলেন, মহারাজের সহিত স্বামীজীর আলাপ করাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু স্বামীজীকে ঐ কথা বলিলে তিনি বলিলেন, “আচ্ছা পরশু দিন হবে।” রাজার নিকটে পৌছিয়া জগমোহনজী আত্মোপাস্ত সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলে মহারাজ স্বামীজীর দর্শনলাভার্থ এতদূর ব্যগ্র হইলেন যে স্বয়ংই তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট গমন করিতে উত্তত হইলেন। স্বামীজীর নিকট এই সংবাদ পৌছিবামাত্র তিনি নিজে আসিয়া মহারাজকে দর্শন দিলেন।

খেতড়িরাজ মহাসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যথাবিহিত শিষ্টালাপের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী, জীবনটা কি?” স্বামীজী উত্তর দিলেন, “প্রতিকূল অবস্থাচক্রের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ-প্রকাশের নামই জীবন।” মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা স্বামীজী, শিক্ষা কি?” স্বামীজী উত্তর করিলেন, কতকগুলি সংস্কারকে অস্থিমজ্জা-গত করার নামই শিক্ষা।” (Education is the nervous association of certain ideas.) বিষয়টি আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিলেন, “বতক্ষণ না কোন চিন্তা বা ভাব মনোমধ্যে এরূপ দৃঢ় সংস্কারের আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রতি স্নায়ু ও শিরায় তাহার কার্য প্রকাশ পাইতে থাকে, ততক্ষণ সেই চিন্তা বা ভাবকে প্রকৃতপক্ষে স্বীয় মনের নিম্নস্থ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না।” উদাহরণস্বরূপ তিনি পরমহংসদেবের জীবনের কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বলিলেন যে, একখণ্ড ধাতু

## স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র অঙ্গটি এমন কি নিদ্রাবস্থাতেই বাঁকিয়া যাইত—কাঞ্চন-ত্যাগে তিনি এমনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটা যেন পবিত্রতার পূর্ণ বিকাশ ও মানবমনের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ।

এইরূপে দিনের পর দিন স্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া মহারাজ তাঁহার এতদূর অনুরাগী হইয়া উঠিলেন যে এক দিন প্রস্তাব করিলেন, “স্বামীজী, আপনি আমার রাজ্যে চলুন। সেখানে আমি পরম্বদে আপনার সেবা করিব।” স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিলেন, “আচ্ছা মহারাজ, তাহাই হইবে। আমি আপনার সহিত গমন করিব।” কয়েক দিন পরে স্বামীজী রাজা, পাত্র-মিত্র, অনুচর লইয়া ট্রেনে জয়পুর গমন করিলেন ও পরে রথে চড়িয়া ২০ মাইল দূরবর্তী খেতড়িতে পৌঁছিলেন।

মহারাজ স্বামীজীকে পাইয়া পরম আহ্লাদে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী, সত্য কি?”

স্বামীজী বলিলেন, “মহারাজ, পূর্ণ সত্য এক ও অদ্বিতীয়। তবে সাধারণতঃ আমরা যেগুলিকে সত্য বলিয়া মনে করি, সেগুলি সব আপেক্ষিক সত্য। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক সত্য ত্যাগ করিয়া অপর সত্য গ্রহণ করে। যেটি ত্যাগ করে সেটি যে মিথ্যা তাহা নহে, তবে যেটি নূতন ধরে, সেটি আরও উচ্চতর। এ অবস্থায় চরম সত্যের উপলব্ধি নাই। চরম সত্যের উপলব্ধি হইলে আপেক্ষিক সত্যজ্ঞানের লোপ হয়।”

মহারাজ ইতঃপূর্বে আর কখনও কোন লোকের নিকট এরূপ মৌলিক চিন্তাপূর্ণ বাক্যসমূহ শ্রবণ করেন নাই। তিনি স্বামীজীর সঙ্গলাভে



## জয়পুর ও খেতড়িতে

উত্তরোত্তর অধিকতর প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন এবং খেতড়ি পৌছিবার কয়েক দিন পরেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। মনে হয় রাজা হইয়া একরূপ ভাবে গুরুসেবা অন্ন লোকেই করিয়াছেন। গভীর রজনীতে মহারাজ শয্যা ত্যাগ করিয়া নিদ্রিত গুরুর পদসেবা করিতেন। প্রথম দিন যখন নিদ্রাভঙ্গে স্বামীজী মহারাজকে ঐ ভাবে দেখিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি মহারাজকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেও মহারাজ শুনিতেন না। বলিতেন, “স্বামীজী, আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য। আপনি আমার এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করিবেন না।” এমন কি দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজসভাতেও তিনি ঐ ভাবে স্বামীজীর সেবার জন্ত উৎকর্ষা প্রকাশ করিতেন এবং স্বামীজীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি প্রভুত্ব সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু স্বামীজী সভাসদবর্গের সম্মুখে কিছুতেই তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেন না, বলিতেন উহাতে প্রজার চক্ষে রাজার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।”

এইভাবে অধ্যয়ন, উপদেশদান ও আধ্যাত্মিক চিন্তার খেতড়িতে বহু সপ্তাহ অতীত হইল। রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিলেও স্বামীজী ঠিক সন্ন্যাসীর ছাত্র থাকিতেন—সেই পূজা, পাঠ, ইষ্টচিন্তা ও জগজ্জননীর চরণে আত্মনিবেদন! অনুক্ষণ এই সকল কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজসভায় নারায়ণ দাস নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ; ইহার সহিত আলাপ হওয়ায় স্বামীজী দেখিলেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিবার এক উত্তম সুযোগ উপস্থিত। তিনি পণ্ডিতজীর নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে পণ্ডিতজী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম দিনই পড়াইয়া

## স্বামী বিবেকানন্দ

বলিলেন, “মহারাজ, আপকো মাকিক বিদ্যার্থী মিলনা মুকিল” (আপনার জায় ছাত্র লাভ করা বড় কঠিন)। পণ্ডিত মহাশয় একদিন একটু বেশী করিয়া পড়াইলেন। পরদিন তিনি সেইসকল বিষয়ে প্রশ্ন করিলে স্বামীজী পূর্বদিনের প্রশ্নে যে-যে বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত আবৃত্তি করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতজী চমৎকৃত হইলেন ও পূর্বোপেক্ষা আরও বেশী পড়াইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল এই ভাবে অতীত হইলে পণ্ডিতজী দেখিলেন স্বামীজী মধ্যে মধ্যে এমন সব কুট প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যাহার উত্তর তিনি খুঁজিয়া পান না। এক দিন তিনি স্বামীজীকে স্পষ্টই বলিলেন, “স্বামীজী, আমার আর আপনাকে শিখাইবার অধিক কিছুই নাই। আমি যাহা জানিতাম তাহা আপনাকে দান করিয়াছি।” স্বামীজী পণ্ডিতজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার প্রতি এতদূর দয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। বস্তুতঃ শেষে তিনিই একরূপ পণ্ডিতজীর শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, কারণ পণ্ডিতজীর দ্বারা যে সব প্রশ্নের সুমীমাংসা হইত না, তিনি নিজেই তাহার মীমাংসা করিতেন। খেতড়িরাঙ্গের সভায় অনেক সংস্কৃত বিজ্ঞাবিশারদ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ দর্শনে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সমাগম হইত। তাঁহারাও সকলে স্বামীজীকে গুরুবৎ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

স্বামীজী যখন কোন পুস্তক পাঠ করিতেন, তখন পুস্তকের দিকে চাহিয়া অতি সত্বর পাতা উলটাইয়া যাইতেন। মহারাজ তাহা দেখিয়া এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী, আপনি এত শীঘ্র কি প্রকারে পড়েন?” স্বামীজী বলিলেন, “বালক যখন প্রথম পড়িতে শিখে, তখন এক-একটি অক্ষর ছবার তিনবার উচ্চারণ করিয়া তৎপরে শব্দটি



## জন্মপূর ও খেতড়িতে

উচ্চারণ করে। এ সময়ে তাহার দৃষ্টি থাকে, শুধু এক-একটি অক্ষরের উপর। কিন্তু বখন আরও বেশী শিক্ষা করে, তখন তাহার নজর এক-একটি অক্ষরের উপর না পড়িয়া এক-একটি শব্দের উপর পড়ে এবং অক্ষরের উপলব্ধি না হইয়া একেবারে শব্দের উপলব্ধি হয়। ক্রমে অভি্যাসের দ্বারা এক-একটি বাক্যের উপর নজর পড়ে ও তাহারই উপলব্ধি হয়। এইরূপে ভাবগ্রহণের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইলে এক নজরে পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা উপলব্ধি হয়। ইহা কিছুই নহে; শুধু অভি্যাস, ব্রহ্মচর্য্য ও একাগ্রতার ফল, যে-কেহ চেষ্টা করিলে পারিবে। আপনি চেষ্টা করুন, আপনারও হইবে।”

আর একদিন মহারাজ বিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী, বিধি বা নিয়ম কি?” (What is law?) স্বামীজী ক্ষণকাল চিন্তা না করিয়া বলিলেন, “Law is the mode in which the mind grasps a series of phenomena. (মন যে প্রণালীতে কতকগুলি বস্তুর ধারণা করে তাহাই নিয়ম।) অর্থাৎ বহির্জগতে নিয়মের কোন অস্তিত্ব নাই, তবে কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরার উপলব্ধি আমাদের মনে যে প্রকারে হয়, তাহাকেই আমরা নিয়ম বলিয়া থাকি। মন আপন সংস্কারগুলিকে বিভিন্ন সমজাতীয় শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লয় ও প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত বিষয়গুলির সাধারণ লক্ষণসমূহকে এক-একটি নিয়মাকারে প্রকাশ করে। এইরূপে বাহ্য বস্তুর সংস্কারের উপর বুদ্ধির প্রতিক্রিয়া হইতে প্রত্যেক নিয়মের উৎপত্তি হয়।” এই প্রসঙ্গে স্বামীজী সাংখ্য-দর্শনের কথা পাড়িয়া দেখাইলেন যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সহিত সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির বিশেষ ঐক্য আছে। বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ প্রায়ই হইত। স্বামীজী মহারাজকে ঐ বিষয়ের আলোচনায় অতিশয় উৎসাহিত করিতেন এবং বর্তমান কালে এদেশে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও তত্ত্বসংগ্রহের

## স্বামী বিবেকানন্দ

বহুল প্রচলন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহা তাঁহার চিত্তে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন। এমন কি তিনি মহারাষ্ট্রের জ্ঞান কয়েকখানি সরল বৈজ্ঞানিক পুস্তক (Science Primer) ও যন্ত্রাদি আনাইয়া স্বয়ং কিছুদিন তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন। পরে নিয়মমত শিক্ষা দিবার জ্ঞান এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়।

এ সময় খেতড়িরাঙ্গ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার এক দিন মনে হইল, বোধ হয় স্বামীজী আশীর্বাদ করিলে তিনি সন্তানের মুখ দর্শন করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি একদিন স্বামীজীর নিকট হুঃখ করিয়া বলিলেন, “স্বামীজী, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন আমার একটি পুত্রলাভ হয়। আমার বিশ্বাস আপনি যদি শুধু একবার মুখ দিয়া ঐ কথাটি উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেই অতীষ্ট পূর্ণ হইবে।” স্বামীজী তাঁহার বিশ্বাস ও ঐকান্তিক আগ্রহ-দর্শনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। পাঠক দেখিবেন, আজন্ম ব্রহ্মচারীর এ আশীর্বাদ বিফল হয় নাই।

একদিন নিদাঘসন্ধ্যায় সুশীতল বায়ুসেবনার্থ মহারাজ কয়েক জন বয়স্কের সহিত প্রমোদ-উদ্যানে উপবিষ্ট আছেন ও বিশাল পুরীমধ্যে কয়েকজন নর্তকী বীণাবাদ্যসহযোগে সুললিত সঙ্গীত-তান তুলিয়াছে; এমন সময় মহারাষ্ট্রের মনে স্বামীজীকে সেই স্থানে আনয়ন করিবার ইচ্ছা উদ্ভিত হইল। কারণ তাঁহার মনে প্রফুল্লতা ছিল না, সেথায় কি যেন একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীকে স্বামীজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। স্বামীজী তখন ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। ধ্যান সাঙ্গ হইলে সংবাদ পাইয়া মহারাষ্ট্রের নিকট আগমন করিলেন। কিঞ্চিৎ ধর্মপ্রসঙ্গের পর মহারাজ একজন নর্তকীকে একটি গীত গাহিতে আদেশ করিলেন। নারীকঠোচ্চারিত কোমল



## জয়পুর ও খেতড়িতে

স্বরলহরী শ্রুত হইবামাত্র স্বামীজী সেখানে থাকা অনুচিত বিবেচনায় গাত্রো-  
থান করিলেন ; কারণ প্রথমতঃ তিনি জীলোকের সঙ্গীত কখনও শুনিতেন  
না, দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীত-ব্যবসায়ী জীলোক সাধারণতঃ অসচ্ছরিত্রা বলিয়া তাঁহার  
ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি উঠিবামাত্র মহারাজ বিশেষ অনুরোধ সহকারে  
বলিলেন, “স্বামীজী, ইহার একটি গান শুনিয়া যান। সে গান শুনিলে  
সাধারণের মনেই অতি উচ্চ ভাবের উদয় হয়, স্মৃতরাং আপনি নিশ্চয়ই আনন্দ  
পাইবেন।” রাজা কর্তৃক এরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া অগত্যা স্বামীজী পুনরায়  
আসন গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন, এই গানটি সমাপ্ত হইলেই চলিয়া  
যাইবেন। রমণী গাহিতে লাগিল। রজনী অন্ধকারময়ী, স্থির ও শান্ত—  
নীলাকাশ তারকাখচিত, এমন সময়ে বৈষ্ণবশিরোমণি সুরদাসের অপূর্ণ  
পদাবলী পদ্যায় পদ্যায় নৈশবায়ুতরঙ্গ ভেদ করিয়া উঠিল—

“প্রভু মেরো অগুণ চিত না ধরো,

সমদরশী ছায় নাম তুমারো।

এক লোহ পূজ্যমে রহত হৈ,

এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।

পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়,

হুঁহু এক কাঞ্চন করো ॥

এক নদী, এক লহর, বহত মিলি নীর ভরো।

যব মিলিহে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গা নাম পরো ॥

এক মায়ী এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।

অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো ॥”

গান শুনিয়া স্বামীজী অতিশয় প্রীত ও ততোধিক বিস্মিত হইলেন।  
বেথিলেন যে গায়িকা সামান্য রমণী হইলেও আত্ম ‘সর্বৎ খবিসৎ ব্রহ্ম’—

## স্বামী বিবেকানন্দ

এই সার সত্যটি সুপরিষ্কৃতভাবে তাঁহার মর্মবোধ করিয়া দিয়াছে। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, “গান শুনিয়া ভাবিলাম, এই আমার সম্যাস? আমি সম্যাসী আর এই স্ত্রীলোক পতিতা নারী, এ ভেদজ্ঞান ত আজিও যায় নাই! সর্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি কি কঠিন!” শুনা যায় চণ্ডালের বাক্যে ভগবান শঙ্করাচার্যের মন হইতে ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছিল, কে জানে কত তুচ্ছ ঘটনা হইতে কত মহৎ ফল প্রসূত হয়! আজিও তাহাই হইল। গার্লিকার ভাবোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠের প্রতিশব্দট বেন অগ্নিশলাকার ত্রায় স্বামীজীর ভেদ-বুদ্ধিকে বিদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল—‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম।’ স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, “না, আমি অপরাধ করিয়াছি, আপনাকে ঘৃণা করিয়া উঠিয়া যাইতে ছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।”<sup>১</sup>

উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, স্বামীজী দ্বিবারাত্র রাজপ্রাসাদেই অতিবাহিত করিতেন। তিনি প্রায়ই দীন দরিদ্র ভক্তমণ্ডলীর গৃহে দর্শন দিতেন। সমগ্র খেতড়ি শহর তাঁহার গুণে মোহিত হইয়াছিল এবং তিনি মহারাজকে যেরূপ মেহের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহার দীনতম প্রজাকেও সেই চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাহাদিগের নিকট বহুবার পরমহংসদেবের চরিত্র কীর্তন করিয়াছিলেন। তাহারা পরমহংসদেবের দর্শনলাভ করে নাই বটে, কিন্তু স্বামীজীর বৈদনন্দিন জীবনের পবিত্রতা ও মধুরতা অনুভব করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই পরমহংসদেবের স্থানে বসাইয়া পূজা করিত।

১. এই ঘটনাটি সম্ভবতঃ খেতড়িরাজের জয়পুরবাটিতে সংঘটিত হয়।



## গুজরাট প্রদেশে

স্বামীজীর হৃদয়ে আবার পর্যটন-স্পৃহা উদ্ভিত হইল। খেতড়ি ত্যাগ করিয়া তিনি আজমীর অভিযুখে গমন করিলেন; আজমীরে দুই-এক দিন কাটাইয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমেদাবাদ নগরে গমন করিলেন। কয়েক দিন ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার পর অবশেষে মিঃ লালশঙ্কর উমীয়াশঙ্কর নামক একজন সাব-জজেরবাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐখানে থাকিয়া আমেদাবাদ নগর ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে যে-সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় বিষয় ছিল তাহা দর্শন করিলেন। দর্শনকালে তাঁহার মনে ঐসকল স্থান-সংশ্লিষ্ট নানা প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি উদ্ভিত হইল। পূর্বে আমেদাবাদ গুজরাটের সুলতানদিগের রাজধানী ছিল, তখন ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ও সুরম্য নগর বলিয়া ইহার খ্যাতি ছিল। এমন কি সার টমাস রো পর্য্যন্ত ইহাকে "a goodly city as large as London" (লন্ডনের স্থায় বড় সুন্দর শহর) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বামীজীর মনে হইল যে, এক সময়ে আমেদাবাদের নাম ছিল কর্ণাবতী। জৈনদিগের উন্নতিকালের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি মনোহর মন্দির এবং মুসলমানদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ কতকগুলি মসজিদ ও সমাধি-মন্দির এখনও ঐ শহরে বিদ্যমান আছে। স্বামীজী সেগুলি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলেন। এখানেও তিনি জৈন পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়া আপনার জৈন-ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি করিলেন এবং আরও কয়দিন কাটাইয়া সেপ্টেম্বরের শেষভাগে কাথিয়াওয়ারের অন্তর্গত ওয়াডওয়ান নামক স্থানে যাত্রা করিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

ওয়াডওয়ানে রনিকদেবীর প্রাচীন মন্দির দর্শন করিয়া তিনি লিমড়ী অভিমুখে গমন করিলেন। লিমড়ীরাষ্ট্র তুলার জন্ত বিখ্যাত। ইহার প্রধান নগরের নামও লিমড়ী। পথে স্বামীজী ভিক্ষা করিয়া শরীর ধারণ করিয়া ছিলেন, দিবসে ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেন, রাত্রিতে যেখানে হয় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এইভাবে তিনি লিমড়ী শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, নিকটেই সাধুদিগের একটা আড্ডা আছে। সেখানে গমন করিয়া একটি নির্জন আশ্রয় দেখিলেন। সাধুরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল যে, তাঁহার যতদিন ইচ্ছা এখানে বাপন করিতে পারেন। বহু ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষুধাও বিলক্ষণ পাইয়াছিল, সুতরাং কিঞ্চিৎ আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা ক্ষুধিবৃত্তি করিবার মানসে তিনি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্থানটি যে কিরূপ সে সময়ে তাঁহার ধারণা ছিল না। দুই-এক দিন থাকিবার পর তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন যে, আড্ডাধারী লোকগুলি একটি নিরুপশ্রান্ত ধর্মধ্বজী (বৌদ্ধমার্গী সম্প্রদায়ভুক্ত)। ধর্মের নামে যত কুৎসিত কার্যের অনুষ্ঠানই তাহাদের নিত্য ক্রিয়া। পার্শ্বের ঘর হইতে তিনি এসকল ইন্দ্রিয়পূজকের প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠ শুনিলেন এবং কতকগুলি দ্রীলোকের কণ্ঠস্বরও তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এই সব ব্যাপার দেখিয়া তিনি পাছে তাহারা কোন অনিষ্ট করে, এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কি বিপদ! যেই তিনি দ্বার খুলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে গেলেন, অমনি দেখিলেন যে, দ্বারটি বাহ্যিক হইতে তালাবদ্ধ, আর ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন, লোকগুলি তাঁহার উপর খুব নজর রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি এখন তাহাদের হাতে বন্দী।



## গুজরাট প্রদেশে

একাকী বিদেশে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া স্বভাবতঃ তাঁহার মনে বিষম উদ্বেগের সঞ্চার হইল। কিন্তু তারপর তিনি যখন হুর্কৃত্তদিগের অভিপ্রায় অবগত হইলেন, তখন তাঁহার সর্বশরীর ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হুর্কৃত্তদিগের অধ্যক্ষ তাঁহাকে আসিয়া কহিল, “তুমি একজন উচ্চদরের সাধু বলিয়া বোধ হইতেছে, সম্ভবতঃ তুমি বহু বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছ। এখন তুমি এই তপস্যার ফল আমাদের দান কর। আমরা একটি বিশেষ সাধনার অনুষ্ঠান করিতেছি, তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তোমার ছাত্র একজন ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গ করা বিশেষ আবশ্যক। অতএব তুমি প্রস্তুত হও।” স্বামীজী তাহার প্রস্তাব শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। লোকটি কি পাগল নাকি? বলে কি? তাঁহার মনে হইল, পূর্বে শুনিয়াছিলেন ধর্ম্মের নামে কোন কোন সম্প্রদায় এইরূপ নানাবিধ গুপ্ত পাপাচরণ করিয়া থাকে এবং তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য এমন কি নরহত্যা-দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তিনি বিশেষ ভীত হইলেন বটে, কিন্তু বাহিরে কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ভয় প্রকাশ করিলেন না। শুধু চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে ইহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। সে-দিবস তাহারা তাঁহাকে আর বেশী কিছু বলিল না, শুধু বন্দী করিয়া রাখিল। তিনি সেই নির্জন কক্ষে পড়িয়া একান্ত চিন্তে স্বীয় ইষ্টদেবতার নামজপ ও বিপত্তারিণী জগদম্বাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এখানে আসার পর একটি বালক প্রায় স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিত ও প্রথম দর্শনাবধি তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। সে বালকটি যখন-তখন তাঁহাকে দেখিতে আসিত। আড্ডার লোকেরা তাঁহাকে কোনরূপ সন্দেহ করিত না বা স্বামীজীর নিকট যাইতে

## স্বামী বিবেকানন্দ

তাহাকে নিষেধও করিত না। পরদিবস সেই বালকটি স্বামীজীকে দেখিতে আসায় স্বামীজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আনুপূর্বিক তাহাকে সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন। বালকটি তাঁহার বিপদ বুঝিতে পারিয়া অতি গৃহস্থরে ভিজ্ঞাসা করিল—তাহার দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে কি না। স্বামীজী 'মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া সাগ্রহে বলিলেন, "হাঁ, হাঁ বৎস, তোমার দ্বারাই আমার উদ্ধার হইবে।" তিনি একথও কাঠের কয়লা দ্বারা একটি খোলামকুটির উপর দুই-চার কথার তাঁহার বিপদের সংবাদ লিখিয়া বালকটির হস্তে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "এই লও। তোমার চাদরের ভিতর এইটি লুকাইয়া লইয়া এখান হইতে বাহির হও। তারপর বত ছোরে পার দৌড়িয়া রাজবাটিতে পৌছবে এবং সেখানে আর কেহ নয়, স্বয়ং মহারাজার হস্তে ইহা প্রদান করিয়া আমার অবস্থার কথা তাঁহাকে সব খুলিয়া বলিবে।" বালকটি ঠিক তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করিল—যেন কিছুই হয় নাই, এইভাবে আড্ডা হইতে বাহির হইয়া উর্দ্ধ্বাঙ্গে দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাজবাটিতে উপস্থিত হইল এবং স্বয়ং লিমড়ীরাজের নিকট সমুদয় ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিল। মহারাজ এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ কয়েকজন দেহরক্ষীকে স্বামীজীর উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন এবং আড্ডার চতুর্দিকে সতর্ক প্রহরীসমূহ সন্নিবেশ করিলেন।

প্রাসাদে উপনীত হইয়া স্বামীজী রাজার নিকট আত্মোপাস্ত সমুদয় ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। মহারাজ এই অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং অচিরে অত্যাচারী পাণ্ডুদিগের দমন ও তাহাদের শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বামীজী প্রাসাদেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ সংগ্রহ



## গুজরাট প্রদেশে

ও ধর্ম্মালোচনার দ্বারা মহারাজের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাজ-প্রাসাদে অবস্থানকালে স্থানীয় পণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃতভাষায় অনেক বিচার হইত। শুনা যায় গোবর্দ্ধনমঠের পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার এ সময় সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারকালে তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। লিমড়ীতে কয়েক দিন অবস্থানের পর স্বামীজী মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট কতকগুলি পরিচয়-পত্র গ্রহণ করিয়া জুনাগড় যাত্রা করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে পথে একাকী ভ্রমণকালে বিশেষ সাবধান হইবার ভয় অহুরোধ করেন। স্বামীজীও ইদানীং যেক্রপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে বাসস্থান-নির্ণয়-বিষয়ে সতর্ক হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

জুনাগড় যাইবার পথে লিমড়ীর ঠাকুর সাহেবের পরিচয়-পত্র লইয়া স্বামীজী ভাবনগর ও শিহোর দর্শন করিতে গেলেন। জুনাগড় পৌছিয়া তত্রত্য রাজদেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারীদাসের ভবনে আশ্রয় লাভ করিলেন। দেওয়ান সাহেব তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সমুদয় রাজকর্ম্মচারীকে স্বামীজীর সকাশে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিতে লাগিলেন। সেখানে সকলে উদগ্রীব হইয়া স্বামীজীর কথোপকথন শ্রবণ করিতেন। কোন কোন দিন রাত্রি অধিক হইয়া যাইত, কেহ বুঝিতে পারিত না কি ভাবে সময় চলিয়া গেল। দেওয়ান আফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সি. এইচ. পাণ্ডিয়া স্বামীজীর একজন প্রধান গুণানুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কিছুদিন তাঁহাকে স্ব-ভবনে রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন—“জুনাগড়ে আমরা সকলেই স্বামীজীর অকপট ভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, বিবিধ শিল্প-

## স্বামী বিবেকানন্দ

বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান, উদার মতসমূহ, ধর্মপরাগতা, প্রাণস্পর্শী বাগ্মিতা এবং অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সকল গুণ ব্যতীত তাঁহার সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা এবং বহুবিধ ভারতীয় কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল। এমন কি তিনি রন্ধনাদি কার্যেও সুপটু ছিলেন এবং অতি উত্তম রসগোল্লা প্রস্তুত করিতে পারিতেন। আমরা সকলেই তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলাম।”

জুনাগড়ে স্বামীজী মহর্ষি ঈশার কথা প্রায় বলিতেন। তিনি বলিতেন যে, প্রধানতঃ রোমসম্রাট কনষ্ট্যান্টাইন ও খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদিগের চেষ্টায় ঈশার প্রভাব সমুদয় পাশ্চাত্য জগতের উপরে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তত্রত্য রীতিনীতি, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম-দর্শনাদি নূতন ছাঁচে গঠিত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার বাক্যগুলি শ্রোতৃগণের চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নানা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেন, সম্যাসী ঈশার উপদেশের সহিত ইউরোপের কত কি নিগূঢ় সম্বন্ধ। এইরূপে ইউরোপের মধ্যযুগ, রাফেলের চিত্রাবলী, মহর্ষি ফ্রান্সিসের ধর্মপ্রাণতা, গথিক গীর্জা-নির্মাণ, ক্রুসেড নামক বিখ্যাত ধর্মযুদ্ধ হইতে ইউরোপের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িত। কিন্তু তিনি ঈশার গুণকীর্তনে শতমুখ হইলেও বর্তমানকালের পাদ্রীদিগের উপর তীব্র কশাঘাত করিতে ছাড়িতেন না। বলিতেন, তাহারা কেহই ঈশার ত্যাগবৈরাগ্যের অধিকারী হইতে পারে নাই, আর দুঃখের বিষয় এদেশে আসিয়া ঈশার উচ্চাদর্শ দেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন না করিয়া ক্রমাগত তাহারা প্রাচীন মহাত্মাদিগের অজ্ঞপ্র নিন্দাবাদ ও ধর্মাদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে কলেজে পাঠকালে খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগের সহিত তাঁহার কিরূপ



## গুজরাট প্রদেশে

তুমুল তর্কবিতর্ক হইত, তাহাও বর্ণনা করিতেন এবং বলিতেন, যদি জৈনা স্বয়ং আত্ম ভারতে আসিতেন, তাহা হইলে এদেশের নীতি বা ধর্মশিক্ষাকে তুচ্ছ বা খর্ব করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগের মাহাত্ম্যই প্রচার করিতেন ও দেশের লোকের সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন। কিন্তু বৈদেশিক সাধুদিগের প্রতি এরূপ উদারভাব পোষণ করিলেও হিন্দুধর্মের সনাতন মহিমা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। জুনাগড়বাসীদিগের নিকট তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেন যে, পাশ্চাত্যের ধর্মাদর্শ হিন্দুধর্মের প্রভাবে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া পূর্ব পূর্ব যুগে বহুবার পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় ও চিন্তার আদান-প্রদান করিয়াছে।

সনাতন ধর্মের গভীরতা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক সময় পরমহংসদেবের জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার অমৃতোপম উপদেশসমূহ সকলকে শুনাইতেন। এইভাবে সুদূর জুনাগড়ের লোকেরাও পরমহংসদেবের বিবরণ জানিতে ও তাঁহার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল এবং অচিরেই অনেক ব্যক্তি হিন্দুধর্মের এই নববৈজয়ন্তীতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। জুনাগড়েও স্বামীজীর সহিত অনেক প্রাচীন-পন্থী হিন্দু পণ্ডিতের ধর্ম-বিষয়ক বিচার হইয়াছিল।

জুনাগড় হইতে কয়েক মাইল দূরে সুবিখ্যাত গীর্ণার পর্বত অবস্থিত। এই পর্বত হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন—সর্বসম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র এবং বহুবিধ প্রাচীন স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষের দৃশ্যস্থল। এখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির, মসজিদ ও সমাধিস্থান বর্তমান আছে। হিন্দুদিগের কীর্ত্তির কতকগুলি ভগ্নাবশেষ বিশেষতঃ ‘খাপড়াখোদির’ নামে কতকগুলি

## স্বামী বিবেকানন্দ

শুধা বহুদিন ধরিয়া বহু সম্প্রদায় কর্তৃক মঠের স্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে। স্বামীজী অতিশয় আগ্রহের সহিত এগুলি দর্শন করিলেন, কিন্তু সর্কা-পেক্ষা তাঁহার পর্কতটিই ভাল লাগিল। পর্কতে যাইতে হইলে যে সুবিখ্যাত শিলাস্তম্ভে সত্ৰাট অশোক তাঁহার চতুর্দশটি আদেশ ক্ষোদিত করিয়াছিলেন, তাহা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ছাড়া পথে পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের অনেক দেখিবার বস্তু আছে। ভবনাথ নামে খ্যাত শিবের মন্দিরে সদাসরুদা বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। পর্কতে উঠিতে উঠিতেও আশে পাশে বহু মন্দির দৃষ্ট হয়। দেখিলে স্থানটি যে বহু প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। মন্দিরে উঠিবার রাস্তাটি অর্ধপথ অতিক্রম করিলে ক্রমশঃ অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখা যায় এবং সময়ে সময়ে একটা প্রকাণ্ড ছুরারোহ শিলার ঠিক প্রান্তভাগে আসিয়া পড়িতে হয়। ১৫০০ ফুট উপরে 'ভৈরো বাম্পা' (বা ভীষণ লক্ষ) নামে একটি স্থান আছে। এখান হইতে অনেক ভক্তসাধু ভক্তির আতিশয্যে ১০০০ ফুট বা ততোধিক গভীর খাদে লক্ষ দিয়া পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। স্বামীজীর পার্শ্বত্যাগে ভ্রমণ করা পূর্ব হইতেই অভ্যাস ছিল, সুতরাং তিনি ক্লাস্তিবোধ না করিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন। জুনাগড় হইতে ২৩৭০ ফুট উপরে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত স্থান আছে, তন্মধ্যে দুর্গের স্থায় চূর্ভে ১৬টি ছৈন মন্দির আছে। এখানে আসিয়া স্বামীজী মন্দিরগুলির অত্যদ্বুত নির্মাণকৌশল ও মণিরত্ন-বিভূষিত তীর্থঙ্করদিগের মূর্তি দেখিয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। তারপর প্রাচীন মহাপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ও ভারতের অতীত গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া পুনরায় আরও উপরে উঠিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মন্দিরের শিখরে উপনীত হইলেন। এ



## গুজরাট প্রদেশে

স্থানটি ৩৩৩০ ফুট উচ্চ। এখান হইতে বহুদূর চক্ষু যায়, দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মনে হইল সমস্ত ভারতক্ষেত্র যেন একটি বিশাল ধর্মমন্দির।

এই শিখর হইতে অবতরণ করিয়া তিনি আর একটি শিখরে অবধূত দস্তাবেজের পদাঙ্ক দর্শন করিবার জন্ত আরোহণ করিলেন। নিম্নে বহুদূরবিস্তৃত শৈলমালা, অদূরে ৪ অঙ্কের ত্রায় আকৃতিবিশিষ্ট একটি হ্রদ—লোকে বলে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর আকার ঐরূপ। মোটের উপর গীর্গার পাহাড় দেখিয়া স্বামীজী অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং তথায় সাধন করিবার জন্ত উৎসুক হইলেন। অনতিবিলম্বে একটি নির্জন গুহা আবিষ্কার করিয়া তাহাতে কিয়দিন ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন এবং জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিয়া বহুদিগের নিকট বিদায় লইয়া ভুজরাজ্যান্তিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে জুনাগড়ের দেওয়ান সাহেব ভুজরাজ্যের উচ্চ রাজকর্মচারীদিগের উপর কয়েকখানি পরিচয়-পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে যে, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর রাজ্য ও রাজকর্মচারীদিগের সহিত এত আলাপ-পরিচয় করার কি প্রয়োজন? সত্য বটে, আপাত-দৃষ্টিতে ইহা যেন স্বামীজীর চরিত্রের বিরুদ্ধভাব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, এই তেজস্বী পুরুষ, যিনি চিরদিন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন এবং দারুণ অভাব-অনটনের মধ্যেও এক সুহৃদের জন্ত অর্থের লালসা করেন নাই, যিনি মনে করিলে আপনার অসাধারণ মানসিক ও নৈতিক শক্তিবলে জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী, মামী ও সমাজ-শিরোমণি হইতে পারিতেন, তিনি স্বীয় নীচ স্বার্থসিদ্ধি বা রাজ্য-মহারাজের প্রসাদ-কাজ্জল্য তাঁহাদের দ্বারস্থ হন নাই। তাঁহার লক্ষ্য ছিল অতি উচ্চ, অতি

## স্বামী বিবেকানন্দ

মহৎ। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের কল্যাণসাধন করিতে হইলে শুধু ক্ষুণ্ণপিপাসাকাতর দীন-দরিদ্রের মধ্যে ধর্ম ও সংশিক্ষা প্রচার করিলেই হইবে না, কিন্তু সম্পদে প্রতিষ্ঠিত, অর্থ ও জনবলসহায় রাজশ্রবর্গের চিন্তের গতি বিলাস-বৈভব হইতে স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে। তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের প্রভু, প্রজাদিগের পালক, রক্ষক ও সকল উন্নতির মূল। সুতরাং তাঁহাদিগেরই মতি-পরিবর্তন হওয়া সর্বোপায় আবশ্যক। সাধারণ জনমণ্ডলীর সুখদুঃখের প্রতিই তাঁহার প্রধান দৃষ্টি ছিল, রাজা ও রাজপুরুষগণের সাহায্যলাভের চেষ্টা শুধু সেই মূল উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়স্বরূপ অবলম্বিত হইয়াছিল।

কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে তিনি মধ্যে মধ্যে বিগুপ্ত পরিব্রাজক-জীবন ত্যাগ করিয়া রাজারাজড়ার গৃহে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও পুজা লাভ করিতেন। আর তাহা ছাড়া তাঁহার অন্তঃকরণ বৈরাগ্যের বিমল দীপ্তিতে চির-সমুজ্জল। ত্যাগী পুরুষের নিকট রাজপ্রাসাদই বা কি আর পর্ণকুটীরই বা কি? তিনি যখনই কোন রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, তখন এই বলা থাকিত যে, কোন দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার দর্শনাকাজ্ঞা হইলে যেন দ্বার হইতে বিতাড়িত না হয়, আর বাস্তবিক হইতও তাহাই। কোন সাধারণ ব্যক্তি তাঁহার দর্শনকামনায় রাজপ্রাসাদে গিয়া কখনও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। তিনি যখন যেকোন অবস্থায় থাকিতেন, তাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিত। একদিন লোকে হয়ত দেখিল তিনি রাজোদ্যানে রাজপারিষদবর্গের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন বা চতুরখবাহিত রাজশকটে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, তাহারাই আবার অনেক সময় দেখিত যে তিনি একাকী ধূলিপূর্ণ রাজপথে পদব্রজে ঘর্ষাক্তকলেবরে কোন দরিদ্র ভক্তের পর্ণকুটীরে



## ভুজরাট প্রদেশে

দেখা করিতে চলিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি রাজা মহারাজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের সংসর্গেই অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আর রাজাদিগের নিকট কখনও তাঁহাদিগের অনুরূপপ্রত্যাশীর স্থায় শশব্যস্তভাবে অবস্থান করিতেন না। তাঁহার নিষেধ মধ্যে এমন একটা শক্তি ছিল যে, তিনি কোন রাজারাজড়াকে তাঁহার অপেক্ষা বিশেষ উচ্চশ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার নিষেধ প্রকৃতিই অনেকটা রাজ-প্রকৃতির স্থায় গভীর ও গরীয়ান ছিল। তিনি নিষে কিছু বুঝিতে পারিতেন না—কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকার অনেকেই তাঁহার ধরণ-ধারণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিত এবং বড় বড় পরিবারের অনেকেই তাঁহাকে দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ হইবেন বলিয়া ভ্রম করিতেন। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং রাজা-মহারাজাদিগের সহিত অবস্থান না করিয়া তাঁহাদিগের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ রাজাদিগের অপেক্ষা এইসকল উচ্চপদস্থ রাজভৃত্যের ক্ষমতা অনেক অধিক। শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি বা অথ কোন প্রকার সংস্কারকার্যে দেওয়ানেরাই প্রকৃতপক্ষে অধিকতর সাহায্য করিতে সমর্থ, রাজারা ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়া এ সকল দিকে ইচ্ছাসম্পন্নও তত দৃষ্টি রাখিতে পারেন না।

এই সব কারণে ভুজরাজ্যে উপনীত হইয়া তিনি তত্রত্য দেওয়ানের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে স্বামীজীর জনৈক শিষ্যের সঙ্গে এই দেওয়ানজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তিনি বার্নিক্যবশতঃ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, “তাঁহার

## স্বামী বিবেকানন্দ

বিদ্যাবুদ্ধির ইয়ত্তা হয় না, তাঁহার দর্শনেই আনন্দ বোধ হইত এবং তাঁহার কথাবার্তায় এমনি একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে, যে একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিত সেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যাইত। অতি গভীর চিন্তাসমূহও তিনি অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন।” জুনাগড়ের প্রধান অমাত্যের ছায় এই দেওয়ানজীর সহিতও উক্ত রাজ্যের শিল্প, কৃষি ও অশ্বাশু বিষয়ের উন্নতি সম্বন্ধে স্বামীজী অনেক আলাপ ও আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে স্থানেই যাইতেন, সর্বত্রই সেই স্থানের আর্থিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং কৃষকদিগের অবস্থা ও জমির অবস্থা কিরূপ, সন্ধান লইতেন—শ্রমজীবীদিগের উন্নতির উপায়-উদ্ভাবনের জন্ত দিব্যাত্ম চিন্তা করিতেন। দেশীয় রাজ্যসমূহে হিন্দু-স্মৃতিকারদিগের ব্যবস্থানুযায়ী শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হয়, এইটো তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল এবং রাজপুরুষেরা প্রজাসাধারণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের বিষয় বাহাতে গভীরভাবে চিন্তা করেন, সেজন্ত বিধিमत চেষ্টা করিতেন। তিনি কে-সকল রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেন, প্রত্যেক স্থানে তদ্রূপ প্রধান রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে সাধারণ প্রজার উন্নতিসাধন, হিন্দু-আদর্শানুযায়ী শাসন-প্রণালীর প্রবর্তন এবং হিন্দুজাতির নব নব উদ্ভাবনী শক্তিশালী প্রতিভার পুনর্জাগরণের প্রবল বাসনা প্রজ্বলিত করিতেন। ইহাকেই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি যতই অধিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ততই দরিদ্র প্রজার অভাব-অনটনের সহিত পূজানুপূজ্যভাবে পরিচিত হইতে লাগিলেন।

ভুজরাজ্যে পৌছিয়া স্বামীজী প্রথমে দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও পরে তাঁহার সাহায্যে মহারাজের সহিতও পরিচিত হইলেন।



## গুজরাট প্রদেশে

মহারাজের সহিত তাঁহার যে সুবীৰ্য আলাপ হয়, তাহার ফলে মহারাজের মনে তাঁহার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা অঙ্কিত হইয়া যায়। তিনি এখান হইতে দূরে ও নিকটে যত তীর্থ ছিল, সব জায়গায় ঘুরিলেন এবং বহু সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে মিশিয়া আপনার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিলেন। তাহার পর জুনাগড়ে কিরিয়া গিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করেন; বিশ্রামান্তে পুনরায় বহির্গত হইলেন। এবার ভেরাওয়াল ও সোমনাথপুত্র, লোকে বাহাকে সাধারণতঃ প্রভাস বলে, সেইদিকে চলিলেন। ভেরাওয়াল অতি প্রাচীন স্থান বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু সোমনাথের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অধিকতর হৃদয়স্পর্শী। প্রবাদ আছে যে, সোমনাথের প্রথম মন্দির সোমরাজ কর্তৃক স্রবণ দ্বারা ও দ্বিতীয় মন্দির রাবণ কর্তৃক রোপ্য দ্বারা নিৰ্ম্মিত হয়। তৃতীয় বারে কৃষ্ণ এক দারুণ মন্দির নিৰ্ম্মাণ করেন ও সৰ্ব্বশেষে ভীমদেব কর্তৃক সেইস্থানে এক প্রস্তরময় মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা নাকি তিনবার ধ্বংস ও তিনবার পুনর্নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাও কথিত আছে যে, পূর্বে এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্ত দশ সহস্র গ্রাম ইহার অধীন সম্পত্তিরূপে নির্দিষ্ট ছিল এবং তিন শত বাদক এই মন্দিরের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কালের করাল কবলে নিপতিত এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের নিকট আসিয়া স্বামীজী ত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইলেন ও ভারতের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার চতুর্পার্শ্বে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধূলিপরিমাণ হিন্দুর আধ্যাত্মিক ইতিহাসের পবিত্র স্মৃতি বহন করিতেছে। কারণ এইখানেই শ্রীকৃষ্ণ যোগসমাধিতে তনুত্যাগ করেন এবং এইখানেই যদুবংশীয়গণ পরস্পরের প্রাণবধ করিয়া সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হন। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, একজন কৃষ্ণকায় ব্যাধ-নিষ্কিপ্ত শরে শ্রীকৃষ্ণ হত হন। কথাটা কতদূর

## স্বামী বিবেকানন্দ

সত্য তাহা এখন নির্ণয় করা অসম্ভব বটে, কিন্তু ঐখানে স্বামীজী একজন কৃষ্ণকায় আদিমবাসীকে দেখিয়াছিলেন, তাহার আকার-প্রকার অবিকল কাক্রোর স্থায়। ভেরাওয়ালবাসীদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, সোমনাথের নিকটবর্তী গীর পর্বতে বহুকাল হইতে একদল কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী আছে, তাহাদের আকৃতি আফ্রিকা-বাসী নিগ্রোদিগের আকৃতি হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে, কিন্তু কতকাল ধরিয়া যে তাহারা ঐ স্থানে বাস করিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সোমনাথের মন্দির দেখিয়া তিনি সূর্য্যমন্দির দেখিতে গেলেন। এখন এই বহুকালপ্রসিদ্ধ মনোহর মন্দির ভগ্নস্থাপে পরিণত হইয়াছে। ভেরাওয়াল ও সোমনাথ উভয় স্থানই সমুদ্রতটে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত সোমনাথে তিনটি নদীর সঙ্গমস্থান বলিয়া একটা ঐতিহাসিক পবিত্র স্থানতীর্থ আছে। এই তীর্থে স্নান করিয়া তিনি সমুদ্রতটে ভ্রমণ করিতে গেলেন। প্রভাসে পুনরায় ভুজরাঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার বৈজ্ঞানিক আকর্ষণে মুগ্ধ ও গভীর বিজ্ঞাবৃত্তায় স্তম্ভিত হইয়া রাজা বলিলেন, “স্বামীজী, অনেকগুলি বই এক সঙ্গে পড়িলে যেমন মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আপনার কথা শুনিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। আপনি এতটা প্রতিভা লইয়া কি করিবেন? একটা কোন বিরাট কার্য সম্পাদন না করিয়া ক্লান্ত হইবেন না দেখিতেছি।” ভেরাওয়ালে অল্পদিন থাকিয়া তিনি পুনরায় জুনাগড়ে ফিরিয়া গেলেন। এই স্থানটি যেন তাঁহার কাথিয়াওয়াড় ও কচ্ছদেশ-ভ্রমণের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল। তৃতীয়বার জুনাগড় ত্যাগ করিয়া তিনি পোরবন্দরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য প্রধান মন্ত্রীকে দিবার জন্ত একখানি পরিচয়-পত্র সঙ্গে লইলেন। ভাগবত-পাঠকেরা যে সুদামাপুরীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন, এই



## গুজরাট প্রদেশে

পোরবন্দরই সেই প্রাচীন সুদামাপুরী বলিয়া খ্যাত। এখানে স্বামীজী প্রাচীন সুদামামন্দির ও দর্শনযোগ্য অশ্রদ্ধা স্থান দেখিলেন। তারপর দেওয়ানজীর গৃহে বাইবামাত্র পরমসমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে দেওয়ানজী তাঁহাকে মহারাজের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পোরবন্দরে তিনি ৮৯ মাস ছিলেন এবং মহারাজের আস্থানে রাজবাটিতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে আরও একটু সুযোগ জুটিয়াছিল। মহারাজের সভায় কতকগুলি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদের সাহায্যে স্বামীজী সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনাদি বিষয়ে বহুল আলোচনা করিতেন। তিনি দ্বিবারাত্রিই অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন, শুধু অপরাহ্নে বিশ্রামের জন্য কখন কখন রাজকুমারদিগের সহিত অথারোহণ বা অশ্রদ্ধা ক্রীড়ায় যোগ দিতেন।

পোরবন্দরে অবস্থানকাল তাঁহার অত্যন্ত গুরুত্বাতি স্বামী ত্রিগুণাতীতের সহিত স্বামীজীর দেখা হয়। ঘটনাটি এইরূপ—ত্রিগুণাতীত স্বামী কিছুকাল হইতে তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি দ্বারকা হইয়া জাহাজে করিয়া সম্প্রতি পোরবন্দরে উপস্থিত হইয়া তথায় হাটকেথর শিবমন্দিরে উঠিয়াছিলেন। সেখানে কতকগুলি সাধু হিন্দুনাথ তীর্থে গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানটি পোরবন্দর হইতে বহুরূপে অবস্থিত এবং তাঁহারাও ইতঃপূর্বে বহু পথ ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত ও বিকৃতপদ হইয়াছিলেন, সুতরাং পদব্রজে হিন্দুনাথগমনের আশা ত্যাগ করিয়া ষ্টীমারযোগে প্রথমে করাচী ও পরে করাচী হইতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে মরুভূমি পার হইয়া সেখানে বাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ইহাতে অর্থের প্রয়োজন। এখন অর্থ কোথা হইতে আসে? অনেক যুক্তি-পরামর্শ হইল, কিন্তু কিছু সাব্যস্ত হইল না। ইতোমধ্যে একজন সাধু বলিলেন, “ওনিতেছি পোরবন্দর-মহারাজের আলয়ে একজন বাঙ্গালী

## স্বামী বিবেকানন্দ

পরমহংস অবস্থান করিতেছেন। তিনি নাকি গড় গড় করিয়া ইংরেজী বলিতে পারেন ও একজন মন্ত পণ্ডিত। তাহা ছাড়া মহারাজের সঙ্গে তাঁহার খুব খাতির আছে; আমি বলি কি, ত্রিগুণাভীতও বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এবং ইংরেজীও জানেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাহাতে রাজাকে বলিয়া তিনি আমাদের কিছু অর্থ সাহায্য করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করুন।”

ত্রিগুণাভীত একটু ইতস্ততঃ করিয়া সন্ন্যাসীদের অনুরোধ-রক্ষায় স্বীকৃত হইলেন এবং তৎপরদিন দ্বিপ্রহরের সময় ঐ সাধুদের একজনকে সঙ্গে লইয়া উক্ত বাঙ্গালী পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তিনি তখন মোটেই বুঝিতে পারেন নাই যে, ঐ পরমহংস আর কেহ নহেন, তাঁহাদেরই নরেন্দ্রনাথ।

সামান্য সাধু দেখিয়া প্রথমে প্রহরিগণ প্রবেশ করিতেই দিল না। শেষে অনেক হাদ্যমা করিয়া “আমরা দুইজন সাধু উক্ত পরমহংসের সাক্ষাৎ-প্রার্থী,” এই মর্মে ইংরেজীতে একটু লিখিয়া সংবাদ দেওয়া হইল। স্বামীজী সেই সময়ে পাছে কোন পরিচিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ কোন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে বাহার-তাহার সহিত দেখা করিতেন না। এই কারণে তিনি গাড়ীবারান্দার ছাদের উপর আসিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু সে সময় স্বামী ত্রিগুণাভীত গাড়ী-বারান্দার ভিতর দিকে ছায়ায় দাঁড়াইয়াছিলেন, সুতরাং কাহাকেও না দেখিয়া একেবারে নীচে নামিয়া আসিলেন—আসিয়াই দেখেন সারদা দাঁড়াইয়া। স্বামী ত্রিগুণাভীতও পরমহংসের সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশে আসিয়া তাঁহাদেরই নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন স্বামীজী অপর সাধুটিকে বিদায় করিয়া দিয়া ইঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত নানা কথাবার্তা কহিলেন। কথায় কথায় বলিলেন,



## গুজরাট প্রদেশে

“ঠাকুর যে বলতেন, এর ভিতর সব শক্তি আছে, ইচ্ছা করলে এ জগৎ মাতাতে পারে, একথা এখন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।” স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন বলিলেন, “ভাই! আমি কতকগুলি সন্ন্যাসীর একান্ত অনুরোধে এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে এখানে এরূপ ভাবে রহিয়াছ, তাহা ঘৃণাকরও জানিতাম না। উঁহার হিন্দু রাজত্বার্থে যাইবেন বলিয়া রাজার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য চান, তা তুমি যদি এ বিষয়ে রাজাকে বলিয়া কিছু সাহায্য করিতে পার, এই জন্ত আমাকে লইয়া উঁহাদের একজন আসিয়াছিলেন।” এই কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, “ছি ছি, তুমি অর্থ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ? কেন? ভিক্ষা করিবে কি জন্ত? যদি কেহ স্বেচ্ছায় কিছু দেয় ভাল, নতুবা অর্থের জন্ত পরের নিকট হাত পাতিবে! এ কি হীন বুদ্ধি! আর আমিই বা তোমাদের হইয়া রাজাকে অনুরোধ করিতে যাইব কেন? তুমি জান, আমি কখনও কাহারও নিকট অর্থের জন্ত হাত পাতি না। আজ রাজপ্রাসাদে আছি, কাল হয়ত দরিদ্্রের কুটীরে গিয়া থাকিব। সন্ন্যাসীর তাতে কি আসে যায়? আর বাস্তবিকও আমি ২৪ দিনের মধ্যেই আবার পথে পথে ঘুরিব। তোমরা সকলেই পরিত্রাজক, অদৃষ্টে যাহা ঘটবে চূপ করিয়া সহ্য করিবে। যদি তোমার কাছে কিছু থাকে তাহা দিয়া দিতে পার।” যাহা হউক, স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া পরদিন প্রত্যুষে ত্রিগুণাতীত স্বামী তাঁহার পুঁটলি-পাটলা বাঁধিতেছিলেন, উদ্দেশ্য অন্তহানে চলিয়া যাওয়া; এমন সময়ে সেই হাটকেশ্বর মন্দিরে স্বামীজী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও নিজে জোর করিয়া পুঁটলি হাতে করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতকে নিজের নিকট লইয়া গেলেন ও তথায় দুইদিন রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিলেন, “আমি যে এখানে রহিয়াছি, তাহা মঠে, বিশেষতঃ অখণ্ডানন্দের নিকট কোনমতে জানাইবে না।”

## স্বামী বিবেকানন্দ

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে তাঁহার শীঘ্র ঐস্থান হইতে চলিয়া বাইবার সঙ্কল্পের বিষয় জানাইতেই তিনি বলিলেন, এত শীঘ্র যাওয়া হইতে পারে না, তাঁহাকে আরও কিছুদিন তথায় থাকিতে হইবে। স্বামীজীর মনে হইল, বোধ হয় এখানে কিছুদিন বাপন করার মধ্যে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় আছে, সুতরাং তিনি অগত্যা মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতিদান করিয়া ঐস্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ও দিবারাত্র পাঠাদিতে রত হইলেন।

রাজসভায় এ সময় শঙ্কর পাণ্ডুরাং নামে একজন পণ্ডিতাগ্রগণ্য সভ্য বেদের অনুবাদ করিতেছিলেন। তিনিও স্বামীজীকে কয়েকদিন তাঁহার নিকট থাকিয়া উক্ত অনুবাদ-কার্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা উভয়ে কয়েক মাস ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা বেদের মহিমা উত্তরোত্তর গভীরতর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অধ্যয়ন ও মৰ্মোদ্ঘাটনে পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্নশীল হইলেন। এখানে পূৰ্ব্বাবশিষ্ট পতঞ্জলির মহাভাষ্য-পাঠও সমাপ্ত হইল। কিন্তু তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহের কুট বিষয়গুলি আয়ত্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, পণ্ডিতজীর সাহায্যে ফরাসী ভাষায় প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মোটামুটি ঐ ভাষায় অধিকার লাভ করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, “স্বামীজী, দেখিবেন ভবিষ্যতে উহা আপনার কাজে আসিবে।”

বেদানুবাদকালে পণ্ডিতজী স্বামীজীর অদ্বুত ধীশক্তি ও শৃঙ্গারপট্টর সবিশেষ পরিচয় পাইয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, “স্বামীজী, আমার মনে হয় যে, আপনি এদেশে বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। কারণ এদেশে আপনার শক্তির যথাযোগ্য পরিমাণ-নির্দ্ধারণে সমর্থ লোকের



## গুজরাট প্রদেশে

সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আপনার উচিত একবার ইউরোপাদি দেশে গমন করা। সেখানকার লোকে আপনার মর্যাদা বুঝিবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি তাহাদের মধ্যে সনাতন ধর্ম প্রচার করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতার উপর নূতন আলোকরশ্মিপাত করিতে পারিবেন।” স্বামীজী চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার নিজে মনেও কিছুদিন হইতে ঐরূপ একটা চিন্তার ক্ষীণাভাস উঠিতেছিল, পণ্ডিতজীর কথার সহিত তাহার ঐক্য দেখিয়া তিনি যেন একটু সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু প্রকাশে কিছু বলিলেন না। এমন কি জুনাগড়ে অবস্থানকালে সি. এইচ. পাণ্ডিয়া মহোদয়ের নিকটও তিনি একদিন পাশ্চাত্যদেশে যাইবার ইচ্ছা কথায় কথায় একটু প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে একটা অস্থায়ী কল্পনার মত মনে উদ্ভিত হইয়াই অদৃশ্য হইয়াছিল, কারণ তখন ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

এই সময়ে স্বামীজীর মনে প্রবল অস্থিরতার উদয় হইয়াছিল। পূর্বেই আমরা ত্রিগুণাভীত স্বামীর প্রসঙ্গেও তিনি যে নিজের ভিতর একটা প্রবল শক্তির বিকাশ অনুভব করিতেছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃতই তাঁহার মধ্যে এরূপ একটা শক্তির উন্মেষ যে সময়ে শুধু তিনি নিজে নহে, পোরবন্দর রাজসভার পণ্ডিত ও জ্ঞানবান ব্যক্তিমাতেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শঙ্কর পাণ্ডুরাং-এর মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন, “সত্যই স্বামীজী, ভারত আপনার উপযুক্ত স্থান নহে। আপনি পাশ্চাত্যদেশে গমন করুন এবং একবার সে দেশে আগুন জালিয়া আনুন—দেখিবেন, এদেশের লোক আপনার প্রত্যেক কথায় উঠিতেছে বসিতেছে।” এ সময়ে তিনি যে যে স্থানে ভ্রমণ ও যে যে রাজা, রাজপুত্র বা শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার মধ্যে দেশের জ্ঞান একটা কিছু করিবার মত প্রবল ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার ভাব লক্ষ্য

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অন্তরের গভীরতার সীমা নির্দেশ করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন, তিনি প্রবল চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন। বস্তুতঃ তখন তাঁহার মনে কি করিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। তিনি পুরাতনপন্থীদিগের অন্ধতা ও আধুনিক সংস্কারকদিগের অপরিণামদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন এবং যাহারা আপনাদিগকে জনসাধারণের নেতা বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদের অনেকের কপটতা ও মূঢ়াচার—সর্বত্রই ক্ষুদ্র ঘেঘহিংসা, স্বার্থানুসন্ধান ও একতার অভাব অবলোকন করিয়া মনে মনে বিশেষ মর্শ্বপীড়া অনুভব করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারতের মধ্যে গগনস্পর্শী গৌরব ও মহত্বের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে—আর্য্য-সভ্যতার অতুলনীয় সম্পদরাশি দেশমাতার পদতলে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত-ভাবে পতিত রহিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহপঙ্কে নিপতিত, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, নিশ্চয় সংস্কারকের করাল কুঠার ও কুপমণ্ডকের দ্বারা আত্মগর্ভস্থীত রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অন্ধতা ও বধিরতা—এই উভয় বিপদ মিলিত হইয়া দিন দিন দেশের সর্বনাশ সাধন করিতেছে। তিনি দেখিলেন, এই উভয় বিপদ হইতে দেশকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। সেই জন্য তিনি যে-সকল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতেন ও ভালবাসিতেন, তাহাদের সকলকেই বলিয়াছিলেন যে, একটা নূতন যুগ আসিতেছে—তাহাতে পুরাতনের অনেক পরিবর্তন হইবে বটে, কিন্তু আমূল ধ্বংস হইবে না, অথচ জগতের চতুর্দিক হইতে একটা নূতন আশা, নূতন আশঙ্কা ও নবতর রশ্মি এই প্রাচীন দেশে আসিয়া পড়িবে। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, বর্তমানে কেবল ধ্যান-ধারণা, সমাধি বা তপস্যায় নিযুক্ত হওয়া



## গুজরাট প্রদেশে .

অপেক্ষা এই দরিদ্র পতিত অবস্থা হইতে দেশকে উদ্ধার ও উন্নত করা অধিকতর আবশ্যিক ও বাঞ্ছনীয় এবং সমগ্র ধর্মকে জাগ্রত ও পুনর্জীবিত করাই এখনকার শ্রেষ্ঠ কার্য। দেশীয় নরপতিবৃন্দ ও প্রধান প্রধান রাজ-অমাত্যদিগকে তিনি এই কথাই বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও সেই আত্মসাক্ষাৎলব্ধ মহাপুরুষের হৃদয়োথ গম্ভীর কল্যাণ-নির্বোধ অবনত মস্তকে শ্রবণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তখন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, জগতের চক্ষে ভারতকে আবার উন্নত করিতে হইলে প্রথমে একবার পাশ্চাত্য দেশে গিয়া ভারতের গৌরবের দিনের সংবাদটা শুনাইতে হইবে, ভারতের ধর্ম-দর্শনের মধ্যে যে অনন্ত আশার বাণী ধ্বনিত হইতেছে, তাহা সেই বিলাসবাত্যাবিস্ক্রুদ্ধ ভোগনিপীড়িত বলমদদগ্ধ পাশ্চাত্য বীরজাতিদিগের নিকট বহন করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাই আজি পোরবন্দরবাসী পণ্ডিতদিগের কথা তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে সবলে আঘাত করিতে লাগিল—প্রতি আঘাতে হৃদয়সমুদ্রের চতুষ্কোণ হইতে অগণন ভাব-তরঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি যতই অভিনিবেশ সহকারে বেদপাঠ করিতে লাগিলেন, যতই আধ্যাত্মবিদগের প্রচারিত দর্শনাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই মর্মে মর্মে অনুভব করিলেন সত্যই ভারত জগতের বরণ্য ধর্মজননী, আধ্যাত্মিকতার মূল উৎস ও মানব-সভ্যতার আদি জন্মভূমি। কিন্তু ভারতের এই গৌরব-মহিমা যে অজ্ঞতার অন্ধকারময় স্তূপের নিম্নে চিরপ্রোথিত হইয়া রহিল, কোটি কোটি ভারত-সন্তান তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না, এইটাই তাঁহার বিশেষ মনঃকষ্টের কারণ হইল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, জলস্রোতে জীর্ণ অট্টালিকার ত্রায় শতাব্দী-

## • স্বামী বিবেকানন্দ

ব্যাপী বৈদেশিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রবল আক্রমণে ধ্বংসোন্মুখ আর্যসভ্যতা আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না; আর বাঁহারা সেই সভ্যতার কর্ত্তার, শিক্ষার ত্রাসপাত্র ও গৌরবের রক্ষক, সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বা পুরোহিত-গণের অনেকেই কর্ত্তব্যে পরাভুত, ধর্মপালনে উদাসীন, আচার-ব্যবহারে অসংযত এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ। শুধু ফনোগ্রাফবস্ত্রের ত্রায় ব্যাকরণ ও দর্শনের গুটিকতক বাঁধা বুলি আওড়াইয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল মনে করিতেছেন—সদসদ্বিচার দ্বারা পুরাতনের পঙ্কোদ্ধার করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা বা জাতীয়তাবুদ্ধি কোনদিকেই অগ্রসর নহেন। এই সকল বিষয়ে স্বামীজী যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। “আমি কি করিতে পারি,” “আমার দ্বারা কি হওয়া সম্ভব?”—পুনঃ পুনঃ এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি সময়ে সময়ে হতাশ হইয়া পড়িতেন, কিন্তু তথাপি ঐ চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেন না।

যাহা হউক, অবশেষে একদিন তিনি পোরবন্দরবাসীদিগের মায়া কাটাঁইয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর বেশে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকাধামে উপনীত হইলেন। দ্বারকার আজি আর সেদিন নাই—যে স্থানে একদিন অতীত ভারতের হৃদয়-দেবতা পুণ্যস্মৃতি শ্রীকৃষ্ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং যাহা সতত প্রবলপরাক্রান্ত যাদববীরগণের পদভরে কল্পিত হইত, আজি সেখান মহাসাগরের নীল জলরাশি সকৌতুকে ক্রীড়া করিতেছে! হায় সে প্রাচীন দিন!

দ্বারকায় আসিয়া স্বামীজী আবার পূর্ববৎ পরিব্রাজকের স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কখনও গভীর ধ্যানে থাকিতেন, কখনও অতীতের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিতেন, কখনও নিরাশার বিতীৰিকার তাঁহার বেদনা-কাতর হৃদয় ভূগর্ভের তিমিরপুঞ্জের মধ্যে ডুবিয়া



## গুজরাট প্রদেশে

যাইত, কখনও বা আশার উজ্জল আলোকে আনন্দলহরী তালে তালে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিত। তিনি আশা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেন না এবং ইষ্টদেবতার নিকটে মনোবাঞ্ছা-পূরণের জন্য প্রার্থনা করিতেও বিরত ছিলেন না। তিনি অকূল বারিধির কূলে বসিয়া উদ্যম শ্রোতোবেগ নিরীক্ষণ করিতেন আর ভাবিতেন—বৈদেশিক সভ্যতার প্রচণ্ড শ্রোত কি করিয়া বন্ধ করা যায়। এইভাবে নীল সিদ্ধুজলের অপর পারে চাহিয়া চাহিয়া উদ্যমভাবে কুছাটিকাবৃত ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে স্বামীজী সময় সময় আত্মহার্য্য হইয়া যাইতেন।

দ্বারকায় তিনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত সারদামঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মোহন্তজী তাঁহাকে সাধরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার বাসের জন্য একটি নির্জন কক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই নির্জন কক্ষে বসিয়া তিনি ভাবিতেন—এক সময়ে এই মঠ কিরূপ বিখ্যাতোচনার স্থান ছিল, এখানে যুগে যুগে কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত যতি ও কত পণ্ডিতের চরণধূলি পতিত হইয়াছে, আর আজি ইহার কি দশা! ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ভাবোন্মেষ হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে নয়নদ্বয় প্লাবিত হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি দেশের দুর্দশা দেখিয়া শুধু কাঁদিতেন না—কিসে এ দুর্দশামোচন হইতে পারে, অহরহঃ তাহার চিন্তা করিতেন। সে চিন্তার আদি-অন্ত ছিল না—সে দিকহীন, কূলহীন চিন্তাসাগরে তিনি যেন একখানি কাণ্ডারীহীন তরণীর ছায় লক্ষ্যহারা হইয়া ভাসিয়া চলিতেন। কিন্তু একদিন কূল মিলিল—সারদামঠের নির্জন কক্ষে বসিয়া তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারতের উজ্জল চিত্র দেখিতে পাইলেন।

দ্বারকা ত্যাগ করিয়া স্বামীজী মাণ্ডবী গমন করিলেন; সেখানে

## স্বামী বিবেকানন্দ

অনেক ভক্তবন্ধুর শ্রদ্ধা-ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া প্রথমে নারায়ণ-সরোবর নামক তীর্থে ও পরে আশাপুরী, কোটিঘর প্রভৃতি লইয়া পুনরায় মাণ্ডবীতে প্রত্যাগত হইলেন। সব স্থানেই পূর্ববৎ যত্রতত্র শয়ন, ভিক্ষামাত্র সম্বল ও ইষ্টদেবতার চিন্তারত হইয়া তিনি স্বেচ্ছাবিহারী সিংহের স্থায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন।

মাণ্ডবীতে অখণ্ডানন্দ স্বামী পুনরায় স্বামীজীর সহিত দেখা করেন। তিনি তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া মনে করিতেন স্বামীজী তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন; তাই সুর্যোগ পাইলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতেন। এবারও উভয়ে এক বুদ্ধা শেঠীর গৃহে আট দিন ছিলেন। শেষে অখণ্ডানন্দ, স্বামীজীকে ছাড়িতে না চাওয়ায়, স্বামীজী তাঁহাকে বলপূর্বক বিদায় করেন। মাণ্ডবী ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি ভুজরাজ ও তাঁহার দেওয়ানের আমন্ত্রণে আর একবার ভুজরাজ্যে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখান হইতে বহুক্রোশ ভ্রমণ করিয়া তিনি পলিটানা নামক প্রাচীন স্থানে শত্রুঞ্জয় নামক পবিত্র জৈনমন্দির দর্শন করিলেন। শত্রুঞ্জয় পর্বতের উপরে হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি হনুমানজীর মন্দির ও হেন্‌গার নামক কোন মুসলমান পীরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি মুসলমান দেবালয় আছে। পর্বতের শৃঙ্গদেশ হইতে চতুর্দিক্কার দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়। নিম্নে বহুদূরপ্রসারী সমতলক্ষেত্র, পূর্বে কাষে উপসাগর ও উত্তরে চামর্দীশিখর-শোভিত শিহোরের শৈলমালা—সে দৃশ্য অতি সুন্দর। এই বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে কত জাতি উদ্ভিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, কে তাহাদের কথা মনে করে! অদূরে পশ্চিম ভারতের ভূতপূর্ব রাজধানী প্রাচীন বল্লভীপুর নগর—যাহা রোমনগরী অপেক্ষাও প্রাচীন—আজি তাহার সে গৌরব কোথায়।



## গুজরাট প্রদেশে

শত্ৰুজয় পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া স্বামীজী পলিটানার অন্তর্গত শত শত মন্দির দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রভাস ও পলিটানায় সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি রটিয়াছিল। অনন্তর তিনি বরোদার গায়কবাড়ের রাজধানীতে ভূতপূর্ব দেওয়ান বাহাদুর মনিভাইয়ের বাটীতে অল্পকালের জ্ঞাত আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মধ্যভারতের অন্তর্গত খাণ্ডোয়া শহরে উপনীত হইলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নামক একজন উকীলের বাটীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। কাছারী হইতে বাটী ফিরিয়া হরিদাস বাবু দেখিলেন, দ্বারদেশে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রথম দর্শনে তিনি মনে করিয়াছিলেন, একজন সাধারণ সন্ন্যাসী হইবে, কিন্তু দুই-চারিটি কথা কহিয়াই বুঝিলেন যে, এত বড় পণ্ডিতসাহু আর কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। সুতরাং তিনি তাঁহাকে নিজ গৃহে আহ্বান করিলেন এবং বাটীর সকলে নিকট-আত্মীয়ের স্তায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি তিন সপ্তাহ রহিলেন, মধ্যে একবার ইলোরা ভ্রমণে গিয়াছিলেন।

খাণ্ডোয়ার বাঙ্গালী সম্প্রদায় ও অজ্ঞাত লোকেরা স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও ইংরেজী সাহিত্যে অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

হরিদাস বাবু স্বামীজীকে সাধারণের সম্মুখে একটি বক্তৃতা দিবার জ্ঞাত অনুরোধ করিলেন। প্রথমে স্বামীজী বলিলেন যে সাধারণ্যে বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা পূর্বে গুরুশিষ্যের মধ্যে যেরূপভাবে কথোপকথন হইত, সেই ভাবে পরস্পর সম্মুখে বসিয়া কোন বিষয় আলোচনা করা ভাল; ইহাতে আলোচ্য বিষয়টিও সুপরিষ্কৃত হয় আর বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে বেশ ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটে। কিন্তু

## স্বামী বিবেকানন্দ

তথাপি হরিদাস বাবু আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে থাকিলে তিনি অধীনস্থ হইয়া বলিলেন যে, সাধারণে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার কখনও অভ্যাস না থাকাতে কি করিয়া স্বরের উচ্চাষ আয়ত্তাধীন করিতে হয়, সে অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, তবে যদি অনেকগুলি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অনুরাগী শ্রোতা আসিয়া জুটে, তবে তাহাদের সহানুভূতিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি হুচার কথা বলিতে পারেন। কারণ অনুরাগী শ্রোতা পাইলে বক্তার অন্তর্নিহিত বক্তৃতাশক্তি আপনিই ফুটিয়া বাহির হয়। কিন্তু খাণ্ডোয়ার ছাত্র সামান্য স্থানে এরূপ শ্রোতার অভাব হওয়ায় হরিদাস বাবুর ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। খাণ্ডোয়ার অবস্থান কালে দেওয়ানী আদালতের জজ বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর সম্মানার্থ স্থানীয় বাঙ্গালীদিগকে একদিন ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনের পূর্বে ও পরে সমগ্রটা বেশ আনন্দে ও শিক্ষায় কাটিবে এই ভাবিয়া স্বামীজী উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর একখণ্ড হাতে লইয়া নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভায় সকলে সমবেত হইলে তিনি কতকগুলি কঠিন ও দুর্কৌশল স্থান আবৃত্তি করিয়া অতি সরল শিশু-ধারণোপযোগী ভাষায় ব্যাখ্যা করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাবু পিয়ারীলাল গাঙ্গুলী নামে একজন উকীল ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল, সুতরাং সভায় তিনিই সমালোচকের স্থান অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী যে-সকল অপূর্ণ সরল ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে তিনি অবশেষে বিরক্ত হইতে বাধ্য হইলেন। স্বামীজীর পাঠ সমাপ্ত হইলে পিয়ারী বাবু হরিদাস বাবুর কানে কানে বলিলেন, “স্বামীজীকে দেখিয়াই মনে হয়, ইনি ভবিষ্যতে একজন জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন।”

খাণ্ডোয়াতেই প্রথম স্বামীজীর মনে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যাইবার



## গুরুজী প্রদেশে

সঙ্কল্প স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। জুনাগড় ও পোরবন্দরে যে চিন্তার অঙ্কুরমাত্র হইয়াছিল, এখানে তাহা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। তিনি একদিন হরিদাস বাবুকে বলিলেন, “যদি কেউ আমার বাতায়ান্তের খরচ দেয়, তাহলে আমি যেতে পারি।” খাণ্ডোয়া ত্যাগ করিবার পূর্বে হরিদাস বাবু স্বামীজীকে আরও কিছুদিন রাখিবার অন্ত্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী বলিলেন, “তোমরা সবাই এত যত্ন করিতেছ যে, তোমাদের ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু আমার থাকিবার ষো নাই। আমি তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইয়াছি—রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাইতেই হইবে। যদি আমি এইভাবে প্রত্যেক স্থানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করি, তাহা হইলে আর আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না।” হরিদাস বাবু যখন দেখিলেন স্বামীজী নিশ্চয়ই তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইবেন, তখন তিনি তাঁহার বোম্বাই-প্রবাসী এক সহোদরের নিকট একখানি পরিচয়-পত্র তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, “আমার ভ্রাতা আপনাকে মিঃ ছবিলদাসের সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। বোধ হয় তিনি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হইবেন। বাস্তবিক স্বামীজী, আপনার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।” স্বামীজী উত্তর করিলেন, “বলিতে পারি না, কিন্তু গুরুজী ত আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতেন।” এইরূপে খাণ্ডোয়ার বহু ভক্ত ও বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি বোম্বাই যাত্রা করিলেন। হরিদাস বাবু তাঁহাকে একখানি টিকিট কিনিয়া দিয়া রেল যাইতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী তাঁহাকে অশীর্বাদ করিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

## বোম্বাই প্রদেশে

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী বোম্বাই শহরে পদার্পণ করিলেন। এখানে হরিদাস বাবুর ভ্রাতার সাহায্যে প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার রামদাস ছবিলদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। তিনি রামদাস বাবুর অনুরোধে তাঁহারই গৃহে কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং এখানেও অধিকাংশ কাল বেদচর্চা লইয়া রহিলেন। দৈবক্রমে একদিন অভেদানন্দ স্বামীর সহিত দেখা হয়। তিনি বলেন, “এ সময়ে স্বামীজীর হৃদয়টা যেন অগ্নিকুণ্ডের তায় হইয়াছিল। আর কোন চিন্তা নাই, কেবল কি করিয়া ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, অহর্নিশ ইহাই ভাবিতেন।” স্বামীজীর চিন্তের উৎকর্ষ দেখিয়া অভেদানন্দ ভীত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, “তখন স্বামীজীকে দেখিলেই একটা প্রচণ্ড ঝঙ্কার বালিয়া মনে হইত।” স্বামীজী নিজেও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “কালী, আমার ভেতর এতটা শক্তি জমেছে যে ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।”

কয়েক সপ্তাহ বোম্বাইয়ে থাকিয়া তিনি পুণায় গমন করিলেন। স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বাইতেছিলেন। সেই গাড়ীতে বালগঙ্গাধর তিলক ও আর কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। স্বামীজীকে দেখিয়া ঐ ভদ্রলোকেরা ইংরেজী ভাষায় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীদের দ্বারাই ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, স্বামীজী ইংরেজী জানেন না, সেই জন্য খুব স্বাধীনভাবে সন্ন্যাসীদের সমালোচনা করিতেছিলেন, আর তিলক সন্ন্যাসীদের পক্ষ



## বোম্বাই প্রদেশে

হইয়া তাঁহার সম্মান করিতেছিলেন। স্বামীজী প্রথমটা চূপ করিয়া ইহাদের বাদ-প্রতিবাদ শুনিতেন, শেষে ইহাদের কথার যখন যোগ দিলেন, তখন সকলে স্বামীজীর অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিলক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুণায় নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া এক মাস রাখিলেন।

এই প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত বহুবিষয়ে আলাপ করিয়া স্বামীজী বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে লিমডীরাজ মহাবালেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন শ্রবণ করিয়া স্বামীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাজ পুনরায় গুরু দর্শনলাভে প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চিরস্থায়িত্বাবে লিমডীতে বসবাস করিবার জ্ঞপ্তি অহরোধ করিলেন; কিন্তু স্বামীজী বলিলেন, “মহারাজ, এখন নহে, এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। যতদিন না কার্য শেষ হয়, ততদিন আমার বিশ্রাম নাই। তবে যদি কখন বিশ্রামের সময় থাকে, নিশ্চয় জানিবেন আপনার ওখানে গিয়া থাকিব।”

অতঃপর স্বামীজী বেলগাঁওয়ে সাবডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার বাবু হরিপদ মিত্রের বাড়ীতে নয় দিবস বাসন করিয়াছিলেন। হরিপদ বাবুর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ আমরা যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষায় দিলাম।

“১৮৯২ সালের ১৮ই অক্টোবর মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। আমার একজন উকীল বন্ধু একটি পুষ্ঠদেহ প্রফুল্ল-কান্তি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে লইয়া আমার বাসায় উপস্থিত। বলিলেন, ‘ইনি একজন বিদ্বান বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ-মানসে আসিয়াছেন।’ সন্ন্যাসী ঠাকুরের মুর্তিটি বেশ প্রশান্ত, চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুতের আলো বাহির হইতেছে, অঙ্গে আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী এবং পায়ে মহারাষ্ট্রদেশীয় চটিজুতা। সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ

## স্বামী বিবেকানন্দ

হইলে এখনও যেন চক্ষুর সামনে দেখি। দেখিয়া আনন্দ হইল—  
 তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। কিন্তু তখন উহার কারণ জানিতে  
 পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,  
 ‘মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন হুক  
 নাই, আপনার যদি আমার হুক তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে,  
 তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।’ তিনি বলিলেন,  
 ‘তামাক চুরট যখন যাহা পাই, তখন তাহাই খাইয়া থাকি। আর  
 আপনার হুক খাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।’ তামাক সাজাইয়া  
 দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস গেরুয়াবেশধারী সন্ন্যাসীমাত্রেই জুয়া-  
 চোর। ভাবিলাম, ইনিও সম্ভবতঃ কিছু প্রত্যাশা করিয়া আমার নিকট  
 আসিয়াছেন, কিম্বা উক্ত মারাঠী বন্ধুর বাটীতে থাকিবার অসুবিধা  
 হইতেছে বলিয়া বোধ হয় আমার বাটীতে থাকিবার মতলব। মনে  
 এইরূপ নানা তোলাপাড়া করিয়া তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে  
 বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কিনা জিজ্ঞাসা  
 করিলাম। তিনি বলিলেন, ‘আমি উকীল বাবুর বাসায় বেশ আছি।  
 আর বাঙ্গালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার  
 মনে দুঃখ হইবে। কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহভক্তি করিতেছেন,  
 অতএব আসিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।’ সে রাতে  
 বড় বেশী কথাবার্তা হইল না। কিন্তু দুই-চারি কথা যাহা কহিলেন,  
 তাহাতেই বেশ বুঝিলাম, তিনি আমা অপেক্ষা হাজার গুণে বিদ্বান ও  
 বুদ্ধিমান, ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন; তথাপি  
 টাকাকড়ি স্পর্শ করেন না ও সুখী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব  
 সম্বন্ধেও সহস্রগুণে সুখী। বোধ হইল তাঁহার কিছুই অভাব নাই, কারণ



## বোম্বাই প্রদেশে

স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছা নাই। আমার বাসায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, 'যদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্যা প্রাতে আমার সহিত চা খাইতে আসিলে সুখী হইব।' তিনি আসিতে স্বীকার করিলেন ও উকীলটির সহিত তাঁহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম। মনে হইল এমন নিষ্পৃহ, চিরসুখী, সদাসন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ ত কখন দেখি নাই। মনে করিতাম, 'যাহার পয়সা নাই, তাহার মরণ ভাল,' 'বাস্তবিক নিষ্পৃহ সম্যাসী জগতে অসম্ভব'। কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হইয়া এতদিনে তাহাকে শিথিল করিয়া ফেলিল।"

পর দিবস ভোর ছটার সময় উঠিয়া হরিপদ বাবু অনেকক্ষণ স্বামীজীর পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেলা ৮টা বাজিয়া গেলেও যখন তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তখন তাঁহাকে লইয়া আসিবার জ্ঞাত মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকটির গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন যে এক বৃহৎ সভা হইতেছে, তাহাতে অনেক প্রধান প্রধান উকীল, পণ্ডিত ও স্থানীয় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি সমবেত হইয়া স্বামীজীকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন ও খুব কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহাকেও ইংরেজীতে, কাহাকেও সংস্কৃতে এবং কাহাকেও হিন্দুস্থানীতে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সেজ্ঞাত তাঁহাকে একবার একটুও চিন্তা করিতে হইতেছে না। এক ভদ্রলোক হাক্কলীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে বাবতীয় জ্ঞান নিহিত আছে মনে ভাবিয়া সেইসকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া স্বামীজীকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর নিকট সে-সব কতক্ষণ টিকিবে? তিনি বহু পূর্বেই হাক্কলীর গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং কখন গভীর যুক্তিতে, কখন

## স্বামী বিবেকানন্দ

বিজ্ঞপের তীব্র কশাঘাতে, কখনও বা আপনার আধ্যাত্মিক তেজঃপ্রভাবে সহজেই প্রতিপক্ষকে নিরস্তর করিলেন। মিত্রজ্ঞ স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া অবাক হইয়া বসিয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিলেন—‘ইনি কি মনুষ্য, না দেবতা?’

নয়টার পর বাহাদের অফিস বা কোর্ট ছিল তাঁহার। চলিয়া গেলেন। কেহ বা তখনও বসিয়া রহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি হরিপদ বাবুর উপর পড়ায় চা খাইতে যাইবার কথা মনে পড়িল। বলিলেন, “বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।” মিত্রজ্ঞ পুনরায় স্বামীজীকে তাঁহার গৃহে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলে স্বামীজী বলিলেন, “আমি যাহার বাটীতে আছি, তাঁহার মত করিতে পারিলে যাইতে পারি।” অনেক চেষ্টার পর গৃহস্বামী হরিপদ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন স্বামীজীর সঙ্গে ফরাসী সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক, একটি কমণ্ডলু ও একখানি মাত্র গেরুয়া বস্ত্র ছিল।

হরিপদ বাবুর বাটীতে শহরের অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। ক্রমাগত ধর্ম্মালোচনা, বিচার ও প্রশ্নোত্তরে তিন দিবস কাটিয়া গেল এবং এই অল্পকালের মধ্যেই হরিপদ বাবুর মনের দীর্ঘকালসঞ্চিত সন্দেহরাশি দূর হইল। চতুর্থ দিবসে স্বামীজী বলিলেন, “আর নহে, এবার যাইতে হইবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে শহরে তিন দিন ও গ্রামে এক দিনের অধিক থাকা বিধি নহে, বেশী দিন থাকিলেই আসক্তি জন্মায়। সন্ন্যাসী মায়াপাশ হইতে যথাসাধ্য দূরে দূরে থাকিবে।” কিন্তু মিত্রজ্ঞ তাঁহাকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার একান্ত অনুরোধে স্বামীজী আরও কয়েক দিবস ওখানে রহিলেন।

সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে বিবেচনা করিয়া হরিপদ বাবু



## বোম্বাই প্রদেশে

একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া স্বামীজীকে বক্তৃতা দিতে বলিলেন; কিন্তু স্বামীজী তাহাতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন, “না, উহাতে নাম-ঘণের আকাঙ্ক্ষা আসিতে পারে। ওটা আমি পছন্দ করি না। আর তা ছাড়া ওরূপ বৃহৎ সভা করিয়া বক্তৃতা দেওয়া অপেক্ষা সামান্য-সামান্য বসিয়া প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভাল।”

একদিন স্বামীজী অর্থ স্পর্শ না করিয়া দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা হইয়াছিল, তাহা হরিপদ বাবুর নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাসের পর নিতান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় একজন একরূপ ভীষণ ঝাল তরকারী খাইতে দিল যে, তাহা রসনায় পড়িবামাত্র উদর পর্যন্ত ভরানক জ্বলিতে লাগিল, অবশেষে বাটি বাটি তেঁতুল-গোলা খাইয়াও সে জ্বালা থামাইতে পারেন না! আর এক জায়গায় এফবার ভিক্ষা চাহিবামাত্র গৃহস্থ অতিশয় জুকা হইয়া গালি দিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, বলিয়াছিল, “এখানে চোর-হেঁচড়, সাধু-ফকির, ছোচ্চোর এ সবেয় জায়গা হবে না।” আবার অনেক দিন ধরিয়া তিনি কিরূপ ডিটেকটিভ পুলিশের নজরে নজরে থাকিতেন, তাহাও বলিলেন। হরিপদ বাবু তাঁহার প্রবাস-ভ্রমণের ক্লেশকাহিনী শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “আহা, ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত সহ্য করিয়াছেন!” কিন্তু স্বামীজী সে সব যেন কত মজার কথা এইরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেলেন। শেষে বলিলেন, “সবই মহামায়ার খেলা।”

স্বামীজীর অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম ও দরিদ্রদিগের প্রতি সহানুভূতির উল্লেখ করিয়া হরিপদ বাবু লিখিয়াছেন, “একদিনের কথা—কলিকাতা শহরে এক ব্যক্তি অনাহারে মারা গেছে, খবরের কাগজে একথা পড়িয়া স্বামীজীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি এত দুঃখিত হইয়াছিলেন যে,

## স্বামী বিবেকানন্দ

বলিবার কথা নহে। বারবার বলিতে লাগিলেন, 'এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়!' কেন, দ্বিজ্ঞান করায় বলিলেন, 'এদেশে চিরদিন ভিখারীর অল্প মুষ্টিভিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। যতই গরীব হউক না কেন ভিক্ষা করিয়া দুবেলা দুমুঠা পায়। দুর্ভিক্ষ না হইলে একেবারে না খাইয়া মরে না। কিন্তু এই আমি প্রথম গুনিলাম কলিকাতার মত জনপূর্ণ শহরে একটা লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।' ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় আমি তখন দুই চারি পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। সুতরাং বলিলাম, 'স্বামীজী, ভিখারীদের যৎসামান্য কিছু দেওয়াতে কি অর্থের সদ্যবহার হয়? আমার ত বোধ হয় উহাতে তাহাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী হইয়া থাকে; কারণ বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া তাহারা গাঁজা গুলি খায় ও আরও অধঃপাতে যায়; লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়।' স্বামীজী বলিলেন, 'যদি অবস্থায় কুলায় তবে ভিখারীকে যাহা হয় কিছু দেওয়া উচিত। দিবে ত ২১টি পয়সা, তাহা নিয়া কে কি করে না করে সে জ্ঞাত তোমার মাথা ঘামাইবার অত দরকার কি? যদি তাহার প্রকৃতই অভাব হয় আর তোমার নিকট সে কিছু না পায়, তবে সে নিশ্চয়ই চুরি করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে আরও বেশী অনিষ্ট হইবে। কারণ গাঁজা গুলিতে শুধু তাহার নিজেরই ক্ষতি, কিন্তু চুরি করিলে সমস্ত সমাজে ক্ষতি। এদেশে ভিখারী চিরদিনই ভগবানের নামে ভিক্ষা করে। দাতারও উচিত ভিখারীকে নারায়ণজ্ঞানে ভিক্ষা দেওয়া, কারণ সে দানরূপ কর্মদ্বারা তোমার চিত্তশুদ্ধি-সাধনের সহায়তা করিতেছে। তুমি যাহা দিতেছ, তাহার বদলে যাহা পাইতেছ, তাহার মূল্য অনেক অধিক।'

আর একদিন হরিপদ বাবু বলিলেন, 'স্বামীজী! আপনার আজ তর্ক



## বোম্বাই প্রদেশে

বিতর্কে অনেক কষ্ট হইয়াছে।” তিনি বলিলেন, “বাবা, তোমরা বেক্সপ utilitarian,” তাহাতে যদি আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকি, তাহা হইলে কি আমাকে এক মুঠা খাইতে দাও? আমি এইরূপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জানিও, যে-সকল লোক সভায় তর্ক-বিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছার ঐরূপ করে না। আমিও বুঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে,—তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।” হরিপদ বাবু বলিলেন, “ভাল স্বামীজী! সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কিরূপে?” তিনি বলিলেন, “ঐসকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন, কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আর তাহার কতবার উত্তর দিয়াছি।” হরিপদ বাবু বলিলেন, “আচ্ছা স্বামীজী! তাহা হইলে দেখিতেছি, ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।” স্বামীজী উত্তর করিলেন, “নিজে ধর্ম বুঝিবার জন্ত লেখাপড়া আবশ্যক নাই। কিন্তু অত্কে বুঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ‘রামকেষ্ট’ বলিয়া সহি করিতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁহার চেয়ে কে বুঝিয়াছিল।”

হরিপদ বাবুর বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্কুলকায় ও সদাসন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে স্বামীজীর দিকে কটাক্ষ করিয়া ওকথা বলায় তিনিও বিজ্ঞপচ্ছলে উত্তর করিলেন, “ইহাই আমার Famine Insurance Fund (দুর্ভিক্ষ বীমা তহবিল)। যদি পাঁচ-সাত দিন খাইতে

১ বাহাতে অধিক লোকের প্রভুতম হৃথ হয়—তাহা সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য—এই মতবাদ (হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদ) এর সমর্থক।

## স্বামী বিবেকানন্দ

না পাই, তবু এই চর্কিগুলি আমার বাঁচাইয়া রাখিবে, কিন্তু তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর যে ধর্মে মানুষকে সুখী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, dyspepsia (অঙ্গীর্ণতা)-গ্রস্ত রোগবিশেষ বলিয়া জানিও। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। পরজন্মে সুখী হইব বলিয়া ইহজন্মে দুঃখভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই জন্মে এই মুহূর্ত্ত হইতেই সুখী হইতে হইবে, যে ধর্ম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইবে, তাহাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য। শিশু, অজ্ঞানী ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করিয়া থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেহ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নহে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত একরূপ লোক দেখা যায় নাই। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তাহারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান, বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করিয়া দ্বেষ করিয়া থাকে এবং তাহাদের বহুবায়সাধ্য উচ্চশ্রেণীর ইন্দ্রিয়-ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্য লালসিত হইয়া অসুখী হইয়া থাকে। সম্রাট আলেকজান্ডার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া পৃথিবীতে আর জয় করিবার দেশ নাই ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেইজন্য বুদ্ধিমান মনীষীরা অনেক দেখিয়া-শুনিয়া ভোগ-বিচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হইতে পারে।

“বিশ্বাবুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিই ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, সেইজন্য তাহাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই উহা তাহাদের সন্তোষপ্রদ হইবে না—কিছুতেই



## বোম্বাই প্রদেশে

তাহারা উহার অনুষ্ঠান করিয়া স্বার্থ স্থখী হইতে পারিবে না। নিম্ন নিম্ন প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মমত, তাহাদের নিজেকেই ভাবিয়া-চিন্তিয়া, দেখিয়া-ঠেকিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। ধর্ম-গ্রন্থপাঠ, গুরুপদেশ, সাধুদর্শন, সংপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ-বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করে মাত্র।”

লক্ষা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য স্বামীজীর বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন, “পর্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশবিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করিতে হয়, তাহাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষনিবারণের জন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেই জন্য এত লক্ষা খাই।”

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম নাই, ধর্ম অনুভব প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলিতেন, “The test of pudding lies in eating” (খাইলেই পিষ্টকের ভালমন্দ বুঝা যায়), তাহা না হইলে কিছুই চলিবে না। তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, বলিতেন, “ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার স্থাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল। নতুবা নবানুরাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।” হরিপদ বাবু বলিলেন, “কিন্তু ঘরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; আপনি সর্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগদ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে-সকল কাজ ধর্মলাভের প্রধান সহায় বলেন, তাহা যদি আমি আজ হইতে অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শাস্তিতে থাকিতে দিবে না।” উত্তরে তিনি পরমহংসদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলিয়া বলিলেন, “কখন কৌস ছেড়ো না, আর কর্তব্য

## স্বামী বিবেকানন্দ

পালন করিতেছ মনে করিয়া সকল কৰ্ম্ম করিও। কেহ দোষ করিলে দণ্ড দিবে, কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়া কখন রাগ করিও না।” পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া বলিলেন, “এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিশ ইন্স্পেক্টরের অতিথি হইয়াছিলাম; লোকটির বেশ ধৰ্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫ টাকা, কিন্তু দেখিলাম তাঁহার বাসার খরচ মাসে ২১০ শত টাকা হইবে। যখন বেশী জ্ঞানাস্তনা হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আপনার ত আয় অপেক্ষা খরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরূপে?’ তিনি ঈশ্বর হস্ত করিয়া বলিলেন, ‘আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থলে যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী আসেন, তাঁহাদেরই ভিতর সকলেই কিছু আপনার মত নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের কাছে কি আছে না আছে, তন্মাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট হইতে প্রচুর টাকাকড়ি বাহির হয়। বাহাদের চোর সন্দেহ করি, তাহারা টাকাকড়ি ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুসখাস কিছু লই না।’ ”

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের কথাই তিনি আর একবার বলিয়াছিলেন, “অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক পরোয়ানার ভয়ে কিম্বা উৎকট দুষ্কৰ্ম্ম করিয়া লুকাইবার জন্ত সন্ন্যাসীর বেশ করিয়া বেড়ায় সত্য, কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেহ সন্ন্যাসী হইলেই তাহার ঈশ্বরের মত ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই! সে পেট ভরিয়া খাইলে দোষ, বিছানার শুইলে দোষ, এমন কি জুতা বা ছাতা পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহার করিবার যো নাই। কেন, সে ত মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হইলে তাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নাই, ইহাও ভুল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোশাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করিবে,



## বোম্বাই প্রদেশে

কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী ।” হরিপদ বাবু কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে ‘সান্থ’ বলায় তিনি উত্তর করিলেন, “আমরা কি সান্থ? এমন অনেক সান্থ আছেন, যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শ মাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় ।”

‘বিশ্বাসই ধর্মের মূল’ বলায় স্বামীজী দ্বন্দ্ব হস্ত করিয়া বলিলেন, “রাজা হইলে আর খাওয়া পরার কষ্ট থাকে না ; কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন ! বিশ্বাস কি কখনও ছোর করিয়া হয় ? অনুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব !” আর একবার ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হওয়ার বলিয়াছিলেন, “যাহা অভিষ্ট কার্যের সাধনভূত তাহাই ভাল ; আর যাহা তাহার প্রতিরোধক তাহাই মন্দ ; ভাল-মন্দের বিচার আমরা জ্ঞানগা উঁচুনিচুর বিচারের জ্ঞান করিয়া থাকি । যত উপরে উঠিবে, তত দুই এক হইয়া যাইবে । চন্দ্রেতে পাহাড় ও সমতল আছে ; কিন্তু আমরা সব এক দেখি—সেইরূপ ।” স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল যে, যে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভিতর হইতে এমন যোগাইত যে মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইয়া যাইত ।

বাল্যবিবাহের উপর স্বামীজী অত্যন্ত চটা ছিলেন । সর্বদাই লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁধিয়া সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উদ্বোধনী ও সন্তুষ্টচিত্ত হইতে উপদেশ দিতেন । স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখা যায় না । বিলাত হইতে ফিরিবার পর যাহারা স্বামীজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না বিলাত যাইবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন সম্বন্ধে কিরূপ সতর্ক ছিলেন । তাঁহার মত শক্তিমান পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নাই, কোন লোক একবার এ কথা বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,

## স্বামী বিবেকানন্দ

“দেখ, মন বেটা বড় পাগল, চুপ করিয়া কখনই থাকে না; একটু সময় পাইলেই আপনার পথে টানিয়া লইয়া বাইবে। সেজন্ত সকলেরই বাধাবাধি নিয়মের মধ্যে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখিবার জন্ত নিয়মে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁহার খুব দখল আছে, তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আলগা দেন মাত্র। কিন্তু কাহার কতটা দখল হইয়াছে, তাহা একবার ধ্যান করিতে বসিলেই টের পাওয়া যায়। এই বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। সকলেই মনে করে—সে জ্ঞেয় নয়, তবে আদর করিয়া জীকে আধিপত্য করিতে দেয় মাত্র। মনকে বশে রাখিয়াছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিও না।”

বেলগাঁওয়ে ঐহার স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহার জড়-বিজ্ঞান, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও উচ্চাঙ্গের গণিতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিক এসময়ে স্বামীজী ধর্মবিষয়ক জটিল প্রশ্নগুলি প্রায়ই বিজ্ঞানসম্মত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতেন। ধর্মের যে কোন প্রশ্ন উঠিত, তিনি ঠিক তদনুরূপ একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দিতেন। দেখাইতেন—ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য মূলে এক, অর্থাৎ সত্য-নির্ধারণের চেষ্টা।

হরিপদ বাবু বলেন, বাস্তবিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে হিন্দুধর্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে স্বামীজীর মত আর কাহাকেও দেখা যায় নাই।

“ইতঃপূর্বে টাইমস্ সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর পত্রে লিখিয়াছিলেন, জৈধর কি, কোন্ ধর্ম সত্য—প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন।



## বোম্বাই প্রদেশে

সেই পত্রটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সহিত ঠিক মিল হওয়ার আমি উহা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম; এক্ষণে স্বামীজীকে তাহা পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, 'লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।' আমারও ক্রমে সাহস বাড়িতে লাগিল। খ্রীষ্টান মিশনরীদের সহিত 'ঈশ্বর দয়াময় ও ত্রায়বান এককালে দুই-ই হইতে পারেন না' এই তর্কের মীমাংসা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্তাপূরণ স্বামীজীও করিতে পারিবেন না। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'তুমি ত Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ দেখিতেছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুইটি opposite forces—centripetal and centrifugal' কি act (ক্রিয়া) করে না? যদি দুইটি opposite forces (বিরুদ্ধ শক্তি) জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও ত্রায়—দুই opposite (বিরুদ্ধ) হইলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভবে না? All I can say is that you have a very good idea of your God.'<sup>১</sup> আমি ত নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, সত্য is absolute (নিরপেক্ষ)—সমস্ত ধর্ম কখন এককালে সত্য হইতে পারে না। তিনি সে সব প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে সকলই relative truth (আপেক্ষিক সত্য)। Absolute (নিরপেক্ষ) সত্যের ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির অসম্ভব। অতএব সত্য absolute (নিরপেক্ষ) হইলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি, নিত্য সত্যকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া

১। বিরুদ্ধ শক্তি—একটি কেন্দ্রাভিমুখিনী ও অপরটি কেন্দ্রাপসারিণী।

২। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যেতোমার ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার বেশ ভাল ধারণা আছে।

## স্বামী বিবেকানন্দ

সে সকলগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর, যেমন দূর এবং সন্নিহিত স্থান হইতে photograph (আলোক-চিত্র) লইলে একই সূর্য্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয় প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্য্যের—তদ্রূপ। নিত্য সত্যের সম্বন্ধে আপেক্ষিক সত্যসকল ঠিক ঐভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্ম্মই সেই জ্ঞাত নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।”

Infinity (অনন্ত পদার্থ) সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠিলে স্বামীজী বাহা বলিয়াছিলেন, সে কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য—“There can be no two infinities.” (দুটো অনন্ত পদার্থ হতে পারে না)। হরিপদ বাবু সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলিলেন, “আকাশ অনন্তটা বুঝলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা ত বুঝলাম না। যা হোক, একটা পদার্থ অনন্ত একথা বুঝি, কিন্তু দুটো জিনিস অনন্ত হলে কোনটা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখবে যে সময়ও বা আকাশও তাই। আরও অগ্রসর হয়ে বুঝবে সকল পদার্থই অনন্ত—সেই সকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুটা দশটা নয়।”

স্বামীজী বলিতেন, “চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম সবই একত্বের দিকে উর্দ্ধ্বাশে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যত রকম রকম জিনিস দেখতে লাগলো, তাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিলে। পরে বিচার করে ঐ সমস্ত জিনিসগুলো ৬৩টা মূল দ্রব্য হতে উৎপন্ন হয়েছে স্থির করলে। ঐ মূলদ্রব্যগুলোর মধ্যে আবার অনেকগুলো মিশ্রদ্রব্য বলে এখন তার সন্দেহ হয়েছে। আর যখন রসায়নশাস্ত্র শেষ মীমাংসায় পৌঁছবে, তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেরই



## বোম্বাই প্রদেশে

অবস্থাভেদমাত্র বোঝা যাবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তাড়িত বিভিন্ন জিনিস বলে সকলে জানত। এখন প্রমাণ হচ্ছে যে ওগুলো সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলো চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলে। তারপর দেখলে যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে—চেতন প্রাণীর স্থায় গমন-শক্তি নেই মাত্র। তখন খালি দুই শ্রেণী রইলো—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাবে, আমরা যাকে অচেতন বলি, তাদেরও স্বল্পবিস্তর চেতনা আছে। ( ইহার পরে অধ্যাপক জগদীশ বসু তাড়িত প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনত্ব পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। )

“পৃথিবীতে যে উঁচু-নীচু জমি দেখা যায়, তাও সতত সমতল হয়ে একভাবে পরিণত হবার চেষ্টা করছে। বর্ষার জলে পর্বতাদি উঁচু জমিগুলি ধুয়ে গিয়ে গহ্বরসকল পলিতে পূর্ণ হচ্ছে। একটা উষ্ণ জিনিস কোন জায়গায় রাখলে উহা ক্রমে চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যের স্থায় সমান উষ্ণতাব ধারণ করতে চেষ্টা করছে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন-বিকীরণাদি ( conduction, radiation ) উপায় অবলম্বনে সর্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

“গাছের ফলফুল পাতা শেকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখলেও বাস্তবিক উহারে যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করেছে। তিনপল কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলে এক সাদা রং রামধনুকের সাতটা রং-এর মত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখলে একই রং, আবার লাল বা নীল চশমার ভেতর দিয়া দেখলে সমস্ত লাল বা নীল দেখায়।

“এইরূপ যাহা সত্য তাহা এক। মায়ী দ্বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্

## স্বামী বিবেকানন্দ

দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মনুষ্যের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উপস্থিত হলেও মানুষ সেই সত্যটাকে ধরতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না।”

এই সব কথা শুনিয়া হরিপদ বাবু বলিলেন, “স্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল এনে সমান্তরাল রাখলে দেখায় বেন ক্রমে এক জায়গায় মিলে গেছে! উহারই নাম vanishing point—মরীচিকা, রজ্জুতে অহিভ্রম প্রভৃতি দৃষ্টিভ্রম সর্বদাই হচ্ছে। Calespar নামক পাথরের নীচে একটা রেখাকে double refraction (দ্বিগুণ কিরণ-বিবর্তন) এ দুটো দেখায়। একটা পেন্সিল আধ গ্লাস জলে ডুবুলে পেন্সিলের জনমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চক্ষুগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা lens (বীক্ষণকাচ বা কাচপুটক) মাত্র। আমরা কোন জিনিস যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাহাই তদপেক্ষা বড় দেখে, কেন না তাহাদের চোখের লেন্স ভিন্নশক্তি-বিশিষ্ট। অতএব আমরা যাহা স্বচক্ষে দেখি, তাহাই যে সত্য তাহারও ত প্রমাণ নেই! জন ষ্ট্রয়ার্ট মিল বলেছেন, মানুষ সত্য সত্য করে পাগল, কিন্তু বাস্তবিক সত্য (Absolute Truth) বোঝবার ক্ষমতা মানুষের নেই! কারণ ঘটনাক্রমে বাস্তবিক সত্য মানুষের হস্তগত হলে তাই যে বাস্তবিক সত্য এটি সে বুঝবে কি করে? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), absolute (নিরপেক্ষ, নিশ্চয়) বোঝবার ক্ষমতা নেই। অতএব Absolute বা অগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝতে পারবে না।”

স্বামীজী—তোমার বা সচরাচর লোকের absolute (নিরপেক্ষ)



## বোম্বাই প্রদেশে

জ্ঞান না থাকতে পারে, তা বলে কারো নেই, এ কথা কি করে বল ? জ্ঞান এবং অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলে ছ'রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাকে জ্ঞান বল বাস্তবিক উহা মিথ্যাজ্ঞান ! সত্য জ্ঞানের উদয় হলে উহা অন্তর্হিত হয়, তখন সব দেখায় এক। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞান-প্রসূত।

হরিপদ—আপনি যাকে সত্যাজ্ঞান ভাবছেন, তাও ত মিথ্যাজ্ঞান হতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলছেন, তাও ত সত্য হতে পারে ?

স্বামীজী—ঠিক বলেছ, তজ্জন্মই বেদে বিশ্বাস করা চাই। মূনি-ঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়ে ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব করে যা বলে গিয়েছেন, তাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে কোন্টা সত্য কোন্টা অসত্য আমাদের বিচার করে বলবার ক্ষমতা নেই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারব ততক্ষণ কেমন করে বলব কোন্টা সত্য কোন্টা মিথ্যে ! শুধু ছোটো বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হচ্ছে—এইটি বলা যেতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাকো তখন অষ্ঠটাকে ভুল মনে হয়। স্বপ্নে হয়ত কলকাতায় কেনা-বেচা করলে, উঠে দেখে বিছানায় শুয়ে আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখবে না এবং পূর্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলে বুঝতে পারবে। কিন্তু এ সব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হতে না হতেই রামায়ণ-মহাভারতও পড়বার ইচ্ছা করলে চলবে কেন ? ধর্ম অনুভবের জিনিস, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার নয়। হাতেনাতে করতে হবে, তবে এর সত্যাসত্য বুঝতে পারবে। এ কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন-শাস্ত্র), Physics (পদার্থ-শাস্ত্র) প্রভৃতিরও অনুমোদিত। আর হ বোতল Hydrogen (উদজ্ঞান) আর এক বোতল Oxygen

## স্বামী বিবেকানন্দ

(অল্পজ্ঞান) নিয়ে জল কৈ বললে কি জল হবে, না, তাদের একটা শক্ত জালগায় রেখে electric current (তাড়িত প্রবাহ) তার ভিতর চালিয়ে তাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নহে) হলে তবে দেখতে পাবে ও বুঝবে যে জল Hydrogen ও Oxygen নামক গ্যাস হতে উৎপন্ন। অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করতে গেলেও সেইরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণে যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের ত কথাই নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্ম্মফল পিঠে বাঁধা রয়েছে। এক মুহূর্ত্ত আশানবেরাগ্য হল আর বললে কিনা, কৈ আমি ও সব এক দেখছি না!

হরিপদ—স্বামীজী, আপনার ওকথা সত্য হলে যে অদৃষ্টবাদ এসে পড়ে। যদি বহুজন্মের কর্ম্মফল একজন্মে যাবার নয়, তবে আর চেষ্টা আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হবে তখন আমারও হবে।

স্বামীজী—তা নয়। কর্ম্মফল ত অবশ্যই ভোগ করতে হবে, কিন্তু অনেক কারণে ঐ সকল কর্ম্মফল, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হতে পারে। ম্যাজিক লণ্ঠনের ৫০ খানা ছবি ১০ মিনিটেও দেখান যায়—আবার দেখতে দেখতে সমস্ত রাতও কাটান যায়। উহা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

সৃষ্টিরহস্ত সম্বন্ধে স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। “সৃষ্টবস্তুমাত্রই চেতন ও জড়, সুবিধার জ্ঞাত এই দুই ভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্টবস্তুর চেতন ভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণীবিশেষ। কোন কোন ধর্ম্মের মতে ঈশ্বর আপনার মত রূপবিশিষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করেছেন; কেহ বলেন—মানুষ ল্যাজবিহীন বানরবিশেষ। কেহ বলেন—মানুষেরই কেবল বিবেচনা-শক্তি আছে; কেহ বলেন—তাহার কারণ মানুষের



## বোম্বাই প্রদেশে

মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশী—বাহাই হউক, মানুষ প্রাণীবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশমাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নেই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি বোঝবার জ্ঞান একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ-রূপ উপায় অবলম্বন করে এটা কি, ওটা কি অনুসন্ধান করতে লাগলেন; আর অতৃদিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়ায় ও উর্বরা ভূমিতে শরীর-রক্ষার জ্ঞান যৎসামান্য সময়মাত্র ব্যয় করে কোপীন পরে প্রতীপের মিটমিটে আলোর বসে আদা-জল খেয়ে বিচার করতে লাগলেন—এমন জিনিস কি আছে, যা জানলে সব জিনিস জানা যায়! [ তাঁহাদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্লসের বস্তুসত্য মত (ultra materialistic theory) থেকে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমত পর্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। ] দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপস্থিত হচ্ছেন ও এক কথাই এখন বলতে আরম্ভ করেছেন। দুই দলই বলছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্কচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশ মাত্র। কাল ও আকাশ (time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক কাল, বাহার অনুভবে সূর্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়। ভাবিয়া দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য্য অনাদি নহে; এমন সময় ছিল যখন সূর্যের সৃষ্টি হয়নি। আবার এমন সময় আসবে যখন আবার সূর্য্য থাকবে না, ইহা নিশ্চিত। তা হলে অথও সময় একটি অনির্কচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বললে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ সম্বন্ধীয় অল্প সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র বৈ আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নাই। অতএব অনন্ত আকাশও তদ্রূপ সময়ের মত অনির্কচনীয়

## স্বামী বিবেকানন্দ

একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন মৌরুগগৎ ও সৃষ্ট বস্তু কোথা হতে কিরূপে এল? সাধারণতঃ আমরা কৰ্ত্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কৰ্ত্তা আছেন, কিন্তু তা হলে সৃষ্টিকৰ্ত্তারও ত সৃষ্টিকৰ্ত্তা আবশ্যক? তা থাকতে পারে না। অতএব আদিকারণ সৃষ্টিকৰ্ত্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনিৰ্ব্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের ত বহুত্ব সম্ভবে না, তাই ঐ সকল কয়টি অনন্ত পদার্থই এক এবং একই ঐ সকল রূপে প্রকাশিত।

হরিপদ বাবু দেখিলেন, স্বামীজী শুধু দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াই নিরন্ত হন নাই, নাটক নভেলাদিও বিস্তর পড়িয়াছেন। এক দিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী ‘পিকউইক পেপারস্’ হইতে দুই তিন পাতা মুখস্থ বলিলেন। হরিপদ বাবু নিজেও ঐ গ্রন্থখানি অনেকবার পড়িয়াছিলেন, স্মরণ্য বৃত্তিতে পারিলেন, কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া তাঁহার বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ হইল। ভাবিলেন, ‘সন্ন্যাসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মুখস্থ বলিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন।’ কিন্তু জিজ্ঞাসা করার স্বামীজী বলিলেন, “দুইবার পড়িয়াছি। একবার স্কুলে পড়িবার সময় ও আজ পাঁছ-ছয় মাস হইল আর একবার।” হরিপদ বাবু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কেমন করিয়া স্মরণ রহিল? আমাদের কেন থাকে না?” স্বামীজী বলিলেন, “একান্তমনে পড়া চাই, আর খাওয়ার সারভাগ হইতে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করিয়া উহা assimilate (শরীরের অন্তর্ভুক্ত) করা চাই।”

আর একদিন স্বামীজী মধ্যাহ্নে একাকী শয্যা শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছিলেন, হরিপদ বাবু অগ্ৰ ঘরে ছিলেন। হঠাৎ স্বামীজী একপ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, এ হাসির বিশেষ কোন



## বোম্বাই প্রদেশে

কারণ আছে ভাবিয়া হরিপদ বাবু তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বিশেষ কিছুই হয় নাই, স্বামীজী যেমন বই পড়িতেছিলেন তেমনই পড়িতেছেন; তিনি প্রায় ১৫ মিনিট স্বামীজীর পাশে দণ্ডায়মান রহিলেন, তথাপি স্বামীজীর দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল না। খানিক পরে স্বামীজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন ও তিনি অতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন শুনিয়া বলিলেন, “বখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা এক মনে এক প্রাণে সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাঙ্গীপুরের পওহারী বাবা ধ্যানজপ পূজাপাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটাটিও একমনে মাজিতেন, এমনি মাজিতেন যে সোনার মত দেখাইত।”

মিজ্জ বলেন, “স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিজ্ঞপের ভিতর দিয়া বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাষ্টারের কাছে বসার মত ছিল না। খুব রঙ্গরঙ্গ চলিতেছে, বালকের মত হাসিতে হাসিতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে তাঁহার ধীর গম্ভীর প্রশান্ত মুষ্টি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া ভাবিত— ইহার ভিতর এত শক্তি! এই ত দেখিতেছিলাম আমাদেরই মত একজন! আমার বাটীতে কত রকম লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত। কেহ আসিত উপদেশ লইতে, কেহ আসিত পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে, কেহ বিজ্ঞাপরীক্ষা-মানসে, আবার কেহ বা শুধু খোশগল্প শুনিবার জন্ত। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যে যেভাবেই আসুক না কেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন ও তাহার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টির নিকট হইতে কাহারও পরিভ্রাণ পাইবার বা কোন কিছু গোপন রাখিবার সাধ্য ছিল না। তিনি যেন

## স্বামী বিবেকানন্দ

প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন। একটি সম্ভ্রান্ত ধনী-সন্তান পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্ত প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিত ও সম্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ বলিত। স্বামীজী কিন্তু তাহার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, ‘এম. এ.-টা পাশ করে তারপর আমার কাছে সাধু হবার জন্ত এসো। কারণ সম্যাসী হওয়ার চেয়ে এম. এ. পাশ করাটা ঢের সোজা।’ ঐসময়ে আমার বাসায় একটি চন্দনবৃক্ষের তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা জন্মেও ভুলিতে পারিব না।”

এই সময়ে হরিপদ বাবুর একটা বড় অভ্যাস ছিল। তিনি প্রত্যহ স্বাস্থ্যের জন্ত নানাপ্রকার ঔষধ সেবন করিতেন। স্বামীজী সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন বলিলেন, “যখন দেখবে কোন রোগ এত প্রবল হয়েছে যে শয্যাশায়ী করে ফেলেছে, আর উঠবার শক্তি নেই, তখনই ঔষধ খাবে, নতুবা নয়। স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐসকল রোগের হাত থেকে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চেয়ে বেশী লোককে মারেন। মনের অবস্থা যদি সম্পূর্ণ বদলে যায় তাহলে কোন পীড়া থাকে না।” তারপর বলিলেন, “আর দিনরাত পীড়ার কথা ভেবেই বা কি হবে? মনে প্রফুল্লতা আন, ধর্ম্মপথে থাক, সন্ধির চিন্তা কর, আমোদ-আহ্লাদ কর, কিন্তু সাবধান! আমোদ করতে গিয়ে যেন শারীরিক ও মানসিক অবসাদ এনে ফেলো না বা এমন কিছু করো না যাতে চিন্তের অন্ততাপ জন্মে। আর মৃত্যুর কথা বলছ—তা তোমার আমার মত ২৪টা লোক মলেই বা কি আসে যায়? ওতে পৃথিবীটা উটে যাবে না। এমন মনে করো না যে তোমার আমার অভাবে পৃথিবীটা একেবারে অচল হয়ে যাবে বা মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে।” সেই দিন হইতে মিত্রজ্ঞ অকারণ ঔষধসেবনের অভ্যাস ত্যাগ করেন।



## বোম্বাই প্রদেশে

এই সময়ে নানা কারণে হরিপদ বাবুর সহিত তাঁহার উর্দ্ধতন ইংরেজ কর্মচারিগণের মনোমালিণ্য চলিতেছিল। একটু কড়া কথা বলিলেই তিনি চট্টা আশুন হইতেন, কিন্তু যুখে তাহাদের কিছু বলিতে পারিতেন না, চাকরির মায়্যাও ত্যাগ করিতে পারিতেন না; কারণ চাকরিটি ভাল, উপার্জন যথেষ্ট ছিল। সুতরাং অন্তরের ক্রোধ বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিয়া তিনি দিবারাত্র সাহেবদিগের নিন্দা করিতেন। স্বামীজী একদিন তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, “দেখ, তুমি টাকার জন্য চাকরি করিতে আসিয়াছ এবং যে কাজ কর তাহার জন্য উপযুক্ত বেতনও পাও। তবে কেন দিনরাত এইসব তুচ্ছ বিষয় লইয়া তোলাপাড়া কর, আর ‘কি বন্ধনেই পড়িয়াছি’ বলিয়া আক্ষেপ কর? কেহ তোমাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, তুমি ইচ্ছা করিলেই কার্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পার। তবে কেন দিনরাত মনিবের নিন্দা ও সমালোচনা কর? যদি ভাব যে তোমার আর গতি নাই, তবে তাহাদের দোষ না দিয়া নিজের দোষ দাও। তুমি কি মনে কর তুমি কাজ কর বা না কর তাহাতে তাহাদের কিছু আসে যায়? তুমি ছাড়িয়া দিলে এখনই শত শত লোক ঐ পদের প্রার্থী হইবে। তবে কেন মনের তাপ বাড়াও? তোমার বাহ্য কৰ্তব্য তাহা নীরবে সম্পাদন করিয়া যাও।” এইরূপে স্বামীজী মিত্রজকে মনের অবস্থার পরিবর্তন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন—“আপ্‌ ভাল ত জগৎ ভাল। আমরা নিজেদের ভিতরে যেমন, বাহিরে ঠিক সেই রকম দেখি। আজ থেকে মন্দটি দেখা একেবারে ত্যাগ কর, দেখিবে তোমার উপর অন্তলোকের পূর্বভাবও কেমন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতেছে। আমাদের ভিতরকার ছবিই আমরা জগতে প্রকাশ রহিয়াছে দেখি।”

ইতঃপূর্বে হরিপদ বাবু ভগবদ্গীতা অনেকবার পড়িবার চেষ্টা

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার প্রকৃত মৰ্ম বুঝিতে না পারিয়া উহার মৰ্য্যে বুঝিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু স্বামীজীর মুখে গীতার দুই-একটি স্থলের ব্যাখ্যা শুনিয়া গীতা-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার পূৰ্ব্বধারণা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি বলেন, “সেই হইতে বুঝিলাম গীতা কি অদ্ভুত গ্রন্থ !—প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায় গীতার শিক্ষা কি প্রয়োজনে আসিতে পারে। কিন্তু স্বামীজীর উপদেশে আমি শুধু গীতা নহে, কার্লাইলের রচনাবলী ও জুলস্‌ভার্ণের বৈজ্ঞানিকরহস্তপূর্ণ উপন্যাস-গুলিরও মৰ্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।”

আপনার মত বজায় রাখিতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জেদ দেখা যায়। ধৰ্ম্মমত সম্বন্ধে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলিতেন। গল্পটি এইরূপ—

কোন দেশে এক রাজা ছিলেন। আর একজন রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া তিনি একটি মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন ও রাজ্যরক্ষার জন্ত কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা সকলকে ভিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ্যের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন, “রাজ্যের চতুর্দিকে একটি গভীর খাল কাটিয়া তাহার ধারে বৃহৎ ও উচ্চ মন্দির প্রাচীর নির্মাণ করা দরকার।” ইহা শুনিয়া স্তম্ভর বলিল, “হাঁ, ঠিক বটে, তবে প্রাচীরটা কাষ্ঠনির্মিত হইলেই ভাল হয়।” চৰ্ম্মকার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “না, কাষ্ঠ অপেক্ষা চৰ্ম্ম অধিক মজবুত, সুতরাং প্রাচীরটা চৰ্ম্মেরই হউক।” কামার ইহা শুনিয়া হাসিয়া কহিল, “চামড়া আর কত মজবুত হইবে? তার চেয়ে লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ করে গুলিগোলা আসতে পারবে না।” উকীল-মোক্তারেরা বলিলেন, “মহারাজ, ওসব কিছুই করিতে হইবে



## বোম্বাই প্রদেশে

না। শত্রুপক্ষকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হউক যে, এইরূপ ভাবে বলপূর্বক পরের সম্পত্তি লইবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। এ কার্য সম্পূর্ণ অত্যাচার ও আইনবিরুদ্ধ।”

তখন পুরোহিত মহাশয়েরা বলিলেন, “তোমরা সকলেই বাতুলের মত প্রলাপ বকিতেছ যে হে! দেবতার সন্তোষ অগ্রে না করিলে কিছুতেই কিছু হইবে না। মহারাজ, হোম যাগ করুন, স্বস্ত্যয়ন করুন, তুলসী দিন, দেখিবেন কাহারও সাধ্য নাই—আপনার একটি প্রদ্বার কোশাগ্র স্পর্শ করে।” এইরূপে রাজ্যরক্ষার পরিবর্তে সকলেই নিজ নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য মহা কোলাহল, তর্ক ও পরিশেষে আত্ম-কলহে ব্যাপ্ত হইল। গল্পটি শেষ করিয়া স্বামীজী বলিলেন, “অধিকাংশ লোকই এইরূপ। আমি যা বুঝি আর কেউ তেমন বুঝে না—এই ভাবটা প্রায় সকলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।”

পূর্বে বলিয়াছি—পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দক গ্রহণ করিবেন না বা নিজের নিকট কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সুতরাং অপরের নিকট হইতে যাক্কা করা দূরে থাকুক, সাধিয়া দিলেও লইতেন না। কেবল নিতান্ত ভক্ত বন্ধুদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের মনে ক্রেশ দিতে অনিচ্ছুক হইয়া কখন কখন একখানি কাপড়, একছোড়া খড়ম, একখানি রেলওয়ে টিকিট বা ঐরূপ কোন সামান্য শ্রদ্ধার দান গ্রহণ করিতেন। কোলাপুরের রাণী তাঁহাকে কোন একটি বহুমূল্য উপহার গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে রাণী তাঁহাকে একছোড়া গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন—দরকার ছিল বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিয়া পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করত

## স্বামী বিবেকানন্দ

রাণী-প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধান করিলেন ও বলিলেন, “সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।” হরিপদ বাবুও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মত হইলে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া অবশেষে তাঁহার মারাঠি জুতার পরিবর্তে একছোড়া জুতা ও একগাছি বেতের ছড়ি তাঁহার সহিত দিয়াছিলেন।

একদিন স্বামীজী হরিপদ বাবুকে বলিলেন, “তোমার সহিত অরণ্যে তাঁবু খাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু চিকাগোতে ধর্মসভা হইবে, যদি তথায় বাইবার সুবিধা হয় ত যাইব।” এই কথা শ্রবণ করিয়া হরিপদ বাবু আনন্দের আবেগে লাফাইয়া উঠিলেন ও তৎক্ষণাৎ চাঁদা তুলিবার জ্ঞপ্তি বাহির হইবার উত্তোগ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “এখন নয়, বৎস! এখনও সময় হয় নাই। রামেশ্বর দর্শন শেষ না হইলে অত্র কিছুতেই হাত দিতে পারিতেছি না।”

স্বামীজী রামেশ্বর যাত্রার উত্তোগ করিতেছেন দেখিয়া হরিপদ বাবু বাটীর মধ্যে গিয়া গৃহিণীকে এই সংবাদ দিলেন। কিছুদিন পূর্ব হইতে হরিপদ বাবুর গৃহিণী মন্ত্র লইবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন, কিন্তু হরিপদ বাবু বলিয়াছিলেন, “যাকে তাকে গুরু করিও না, এমন লোককে গুরু করিবে যেন তাঁহাকে দেখিয়া আমারও ভক্তি হয়। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহা হইলে মন্ত্র লইব, নতুবা নহে।” তিনিও তাহাতে স্বীকৃত হন। কিন্তু এরূপ মনোমত গুরু না পাওয়াতে তাঁহাদের মনের ইচ্ছা এতাবৎকাল পূর্ণ হয় নাই। স্বামীজীকে দেখিয়া অবশি হরিপদ বাবুর মনে তাঁহাকেই গুরুরূপে লাভ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহা হইলে তুমি শিষ্য হইতে ইচ্ছা কর কি?” তিনিও সাগ্রহে বলিলেন, “উনি কি গুরু হইবেন? হইলে ত আপনাদের



## বোম্বাই প্রদেশে

কৃতার্থ মনে করি।” হরিপদবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “আমি যেমন করিয়া পারি স্বামীজীকে রাজী করাইব। ওঃ কি লোক! এ সুবিধা ছাড়িয়া দিলে আর কি জীবনে এমন লোকের দেখা পাইব?” এই বলিয়া বহির্দ্বারটীতে আসিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী, আমার একটা প্রার্থনা পূরণ করিবেন?” স্বামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে তিনি সজ্ঞক তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। স্বামীজী প্রথমে রাজী হইলেন না, বলিলেন, “গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের সব ভার ঘাড়ে লইতে হয়; বিশেষ আমি সন্ন্যাসী। আমি কোথায় মায়াপাশ কাটাইবার চেষ্টা করিব—না আরও বেশী ফাঁদে পা দিবার কথা বলিতেছ। তা ছাড়া দীক্ষার পূর্বে গুরুশিষ্যে অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া দরকার ইত্যাদি।” কিন্তু হরিপদ বাবু স্বামীজীর কথায় ভুলিলেন না। তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া শাস্তনয়নে কহিলেন, “স্বামীজী, যদি আপনি আজ আমাদের অতীষ্ট পূর্ণ না করেন, তবে আমরা চিরদিনের জন্ত জীবন্মৃত হইয়া থাকিব।”

স্বামীজী তাঁহার দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তাঁহাদের উভয়কে দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষার পর হরিপদ বাবু স্বামীজীর একখানি ফটো তুলিয়া লইবার জন্ত বলিলেন। স্বামীজী প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, কিন্তু অনেক বাদামুবাদের পর ও হরিপদ বাবুর অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া শেষে উহাতে সন্মত হন।

২৭শে অক্টোবর স্বামীজী হরিপদ বাবুর গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। মিত্রজ একখানি রেলওয়ে টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে বসাইয়া চরণগুলি গ্রহণপূর্বক বলিলেন, “স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাহাকেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, আজ আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলাম।”

## দাক্ষিণাত্যে

বেলগাঁ হইতে মরমাগোয়া নামক সমুদ্রতটবর্তী পর্তুগীজ উপনিবেশের মধ্য দিয়া স্বামীজী মহীশূররাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালোর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উচ্চপদস্থ ও শিক্ষিত লোকদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছায় কয়েক দিবস তিনি প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। কিন্তু শীঘ্র তাঁহার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তিনি অবিলম্বে মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্ত্রীর কে. শেবাঙ্গি আয়ারের নিকট পরিচিত হইলেন। অল্পক্ষণ আলাপেই বুদ্ধিমান শেবাঙ্গি আয়ারের বৃত্তিতে বাকী রহিল না যে, এই বুঝা সন্ন্যাসীর মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ও ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে, যাহা কালে এ দেশের ইতিহাসে স্থায়ী রেখাপাত করিবে। স্বামীজী এই অমাত্যপ্রবরের বাটীতে প্রায় একমাসকাল থাকিয়া মহীশূর রাজ্যের অনেক গণ্যমান্য, সুশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি যেখানেই যাইতে লাগিলেন, শুধু হিন্দু নহে, অত্যাশ্চর্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিও সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। মিঃ আবদুল রহমান সাহেব নামে মহীশূররাজ্যের একজন মুসলমান সভাসদ স্বামীজীর নিকট কোরানের কয়েক স্থলের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার যে যে সন্দেহ ছিল, তাহা মিটাইয়া লইলেন। রহমান সাহেব হিন্দু ফকিরের মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, স্বামীজী বহুদিন পূর্বেই কোরানের অর্থ ও আধ্যাত্মিক ভাব নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। শেবাঙ্গি আয়ার এই পণ্ডিত সাধুকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত



## দাক্ষিণাত্যে

হইলেন। তিনি বলিতেন, “একুপ অদ্ভুত ক্ষমতাবান্ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা অনেকেই ধর্মসম্বন্ধে অনেক বই পড়িয়াছি, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইয়াছে? আমি ত আমাদের মধ্যে এমন কাহাকেও জানি না, যিনি শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ-অনুধাবনে এই যুবক সন্ন্যাসীর সমকক্ষ। ইনি এক অত্যাশ্চর্য্য পুরুষ। বোধ হয় ইনি ধর্মতত্ত্ববেত্তা হইয়াই জননী-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, নতুবা একুপ অল্প বয়সে বেদ-বেদান্তাদি সমগ্র শাস্ত্রে একুপ অসাধারণ অধিকার কি করিয়া জন্মিল?”

এই তরুণ আচার্য্যকে দেখিয়া মহীশূর-রাজ প্রীত হইবেন মনে করিয়া স্তার শেবাঙ্গি আমার স্বামীজীকে মহীশূরে লইয়া গিয়া মহারাজের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। গৈরিকবসনধারী স্বামীজী যখন মহারাজ শ্রীচামরাজেন্দ্র উদীরারের সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার রাজ-সুলভ ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন—স্বামীজীর বিদ্যাবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মবিষয়ে সুক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, কথাবার্তা ও চালচলন সবই যেন তাঁহার হৃদয় হরণ করিল। তিনি স্বামীজীর বাসের জন্য রাজপ্রাসাদে কতকগুলি কক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং প্রায়ই ধর্ম ব্যতীত অত্যাশ্রয় বহু গুরুতর বিষয়েও স্বামীজীর মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং প্রত্যহ বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন। ক্রমে মহারাজের সহিত স্বামীজীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। একদিন মহারাজ সপার্বদ সভাগৃহে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী, আমার পার্বদদিগকে আপনার কেমন লাগিতেছে?” স্বামীজী উত্তর করিলেন, “মহারাজ, আপনি স্বয়ং অতি মহানুভব ব্যক্তি কিন্তু হৃর্ভাগ্যবশতঃ আপনি সদাসর্বদা পার্বদমণ্ডলী-বেষ্টিত থাকেন। আর মহারাজ, পার্বদেরা সর্বদা সর্বত্র একরূপ।” রাজা এই নির্ভীক উত্তর

## স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সভার অত্যাশ্চর্য লোকেরা প্রথমে একটু কৌতুক বোধ করিয়া পরক্ষণেই স্বামীজীর উপর বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন, উত্তম সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ স্পষ্টবক্তা হইয়া থাকেন, কাহারও মুখ চাহিয়া কথা বলেন না। মহারাজ স্বামীজীকে আরও কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন, তিনিও ঐরূপ চমৎকার উত্তর দিতে লাগিলেন, এমন কি দেওয়ানজীর প্রতিও ঈষৎ কটাক্ষপাত করিতে বিরত হইলেন না। মহারাজ অবশেষে নূতন প্রশঙ্গের অবতারণা করিলেন। দরবার শেষ হইলে তিনি স্বামীজীকে এক নিভৃত কক্ষে আহ্বান করিয়া অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন ও সর্বশেষে বলিলেন, “স্বামীজী, আপনি যেরূপ স্পষ্টবাদী তাহাতে আমার ভয় হয় হয় পাছে আপনার জীবনে কোন আশঙ্কা ঘটে। হয়ত কেহ বিষপ্রয়োগে আপনাকে হত্যা করিতে পারে—অত্যাশ্চর্য অনেক সাধুর জীবন এইরূপে নষ্ট হইয়াছে।” স্বামীজী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, “কি! আপনি কি ভাবেন, প্রকৃত সন্ন্যাসী প্রাণভয়ে সত্য বলিতে কুণ্ঠিত বা ভীত হয়? মনে করুন আপনারই পুত্র যদি আমাকে দ্বিভ্রাসা করে—আপনি কিরূপ লোক? আমি কি বলিব আপনি সর্বগুণাধার, আপনার মধ্যে যে-যে গুণ নাই, ভয়ে বলিব, সে গুণ আছে? মিথ্যা বলিব? মহারাজ! তোষামোদ চাটুকারদিগের ব্যবসায়, সন্ন্যাসীর ব্যবসায় সত্যকথন।” মহারাজের সম্মুখে ঐরূপ বলিলেও তিনি কতবার মহারাজের অসাক্ষাতে তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবই ছিল এইরূপ—যাহার যে দোষ বা দুর্বলতা থাকিত, তাহার সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া বলিতেন; কিন্তু অপরের নিকট তাহার বিষয়ে উল্লেখকালে কখনও তাহার গুণ ভিন্ন দোষ কীর্তন করিতেন না।



## দাক্ষিণাত্যে

মহীশূর-রাজসভায় স্বামীজীর সহিত একজন বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ারদেশবাসী সঙ্গীতজ্ঞের ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হয়। সেই ব্যক্তি ও সভাস্থ অগ্ণাত সকলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ সঙ্গীতে তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত হইরাছিলেন। আর একদিন রাজপ্রাসাদে বৈজ্ঞানিক আলোক-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একজন প্রসিদ্ধ তড়িৎশিল্পীর (electrician) সহিত তড়িৎ বিষয়ে স্বামীজীর অনেক কথাবার্তা ও আলোচনা হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও সে ব্যক্তি তড়িৎ বিষয়ে নিজে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়াও স্বামীজীর নিকট থই পায় নাই।

একদিন রাজবাটীর বৃহৎ দালানে প্রধান অমাত্যের সভাপতিত্বে বেদান্ত বিষয়ে একটি বৃহৎ পণ্ডিতসভা আহূত হইল। পণ্ডিতেরা অনেকে অনেক কথা বলিলেন, অনেক যুক্তি-তর্ক দ্বারা বিভিন্ন মতবাদস্থাপনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মোটের উপর কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য হইল না। অবশেষে স্বামীজী কিঞ্চিৎ বলিবার জন্ম আহূত হইলেন। তিনি আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে পাঞ্জি-পুঁথি ছাড়িয়া তাঁহার নিজের প্রাণের ভাবায় বেদান্তশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটন করিলেন ও অগ্ণাত দার্শনিক মতের সহিত মিলাইয়া ও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া কার্যক্ষেত্রে বেদান্তের উপযোগিতা নির্দেশ করিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও দৃষ্টির প্রসার দেখিয়া চিত্তার্পিতবৎ বসিয়া রহিলেন। সকলেই বুঝিল, দর্শন তাঁহার নিকট কতকগুলি বাক্য ও ভাবের সমষ্টিমাত্র নহে—প্রকৃত প্রাণের বস্তু। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে নতমুখে সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

প্রধান অমাত্য স্বামীজীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন তাঁহাকে

## স্বামী বিবেকানন্দ

কোন উপহার গ্রহণ করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার একজন সেক্রেটারীকে স্বামীজীর সহিত বাজারের সর্দাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দোকানে গিয়া তাঁহার যে জিনিস অভিক্রটি হয়, তাহা কিনিয়া আনিতে বলিলেন। স্বামীজী অমাত্যের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া লোকটির সহিত বাজারে গেলেন। সেক্রেটারী মনে করিলেন, যখন দেওয়ানজীর আদেশ ও স্বামীজীর উপহার তখন কি জানি কত টাকা ব্যয় হয়, এই ভাবিয়া তাঁহার চেক-বইখানি সঙ্গে লইয়া বাজারে গেলেন, মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিলেন যে, আবশ্যক হইলে এক সহস্র মুদ্রাও খরচ করিবেন। দোকানে গিয়া স্বামীজী বালকের ছায় এ-দ্রব্য ও-দ্রব্য করিয়া বহু দ্রব্য দেখিলেন ও প্রশংসা করিলেন। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বলিলেন, “বন্ধু, যদি আমি আমার অভিলষিত কোন দ্রব্য গ্রহণ করিলেই দেওয়ানজী সন্তুষ্ট হন, তবে এক কাজ করুন, এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট চুরট আনিয়া আমায় দিন।” সে ব্যক্তি ত তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক। তিনি বাহা বাহা মনে করিয়াছিলেন তাহার একটাও ত খাটিল না। তিনি জীবনে প্রথম দেখিলেন যে এত বড় একটা সুবোগ হাতে পাইয়াও লোকে তাহা ত্যাগ করিতে পারে। দোকান হইতে বাহির হইয়া স্বামীজী তাঁহার এক টাকা মূল্যের চুরটটি ধরাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন ও অনতিবিলম্বে প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ানজী প্রথমে তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিয়া যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তারপর হাসিয়া উঠিলেন। বৃত্তিতে পারিলেন, প্রকৃত সন্ন্যাসীরা এইরূপই হইয়া থাকেন।

একদিন মহারাজ স্বামীজী ও প্রধান অমাত্যকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া



## দাক্ষিণাত্যে

বলিলেন, “স্বামীজী, আমার দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইতে পারে?” স্বামীজী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া অলসভাবায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি ভারতের অবস্থার প্রতি মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বর্ষট্যিক কাল বহুতা করিলেন। দেখাইলেন, ভারতের বলিতে আছে শুধু তাহার দর্শন ও অধ্যাত্মবিজ্ঞা; কিন্তু ভারতের নাই, ভারতের অভাব—বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও ভিতর হইতে আমূল সংস্কার। মহারাজ নয়মুদ্রের ছাত্র শ্রবণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী আরও বলিলেন—তাঁহার মনে হয় ভারতের বাঁহা কিছু আছে, তাহা পাশ্চাত্য জগৎকে দান করাই হইবে ভারতের কার্য্য এবং তিনি স্বয়ং পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট বেদান্তধর্ম্ম-প্রচারের জন্ত গমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “আমি চাই যে তাহারা আমাদের আর্থিক উন্নতি-বিষয়ে সাহায্য করিবে।” হৃদয়ের আবেগে তিনি ক্রমশঃ অনেক কথা বলিয়া ফেলিলেন। মহারাজ তাঁহার বাগ্মিতার মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাশ্চাত্য দেশে গমনের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কি জন্ত জানি না—বোধ হয় রামেশ্বর-দর্শন অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া স্বামীজী মহারাজের নিকট এই অর্থসাহায্যগ্রহণে অসম্মত হইলেন। সেইদিন হইতে রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর ধারণা হইল—“এই মহাপুরুষ ভারতের উদ্ধারের জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।”

যত দিন বাইতে লাগিল, ততই মহারাজ স্বামীজীর গুণে উত্তরোত্তর অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তারপর যেদিন স্বামীজী বিদায়-গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন, সেদিন মহারাজের আন্তরিক বেদনা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তিনি স্বামীজীকে আরও কিছুকাল তাঁহার নিকট

## স্বামী বিবেকানন্দ

বাস করিতে অনুরোধ করিলেন, বলিলেন, “স্বামীজী, আমি আমার নিকট আপনার একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন রাখিতে চাই। যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে ফনোগ্রাফে আপনার কণ্ঠস্বরের একটা রেকর্ড তুলিয়া লই। আপনার প্রাণোন্মাদিনী ভাবায় ফনোগ্রাফে ২৪ কথা বলুন, যেন চিরদিন আপনার কথা আমাদের কানে বাজিতে থাকে।” স্বামীজী সন্মত হইলে রেকর্ড তোলা হইল। আশ্চর্য্য পর্য্যন্ত মহেশ্বরের রাজপ্রাসাদে সে রেকর্ড সম্বন্ধে রক্ষিত আছে, তবে বহুদিন হইতে তাহা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ মহেশ্বররাজ স্বামীজীর গুণগ্রামের এতদূর অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, এমন কি তাঁহার পাদপূজার পর্য্যন্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী উহাতে সন্মত হন নাই।

কিয়দিন পরে স্বামীজী বলিলেন, আর তিনি থাকিতে পারিতেছেন না। একথা শুনিয়া মহারাজ স্বামীজীর সহিত বিবিধ মূল্যবান উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, স্বামীজী ঐ সকল প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আমি সামান্ত সন্ন্যাসী। বহুমূল্য উপহার লইয়া কোথায় রাখিব, কি করিব?” কিন্তু মহারাজ কিছুতেই ছাড়িলেন না। অবশেষে স্বামীজী বলিলেন, “রাজন, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, পরিব্রাজক-অবস্থায় অর্থ স্পর্শ বা কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিব না।” মহারাজ তথাপি পুনঃ পুনঃ উপহারগ্রহণের জন্ত নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অগত্যা স্বামীজী তাঁহাকে নিরাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন, “আচ্ছা, যদি নিতান্তই না ছাড়েন, তবে আমাকে ধাতু-সম্পর্কবিহীন একটা হাঁকা দিন, ওটা আমার বেশ কাজে লাগিতে পারে।” মহারাজ তখন তাঁহাকে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত একটি সুন্দর রোজউভ্-নির্ম্মিত হাঁকা দান



## দাক্ষিণাত্যে

করিলেন। মহীশূর হইতে প্রস্থানকালে মহারাজ স্বয়ং স্বামীজীর চরণদুগল ধারণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং প্রধান অমাত্য তাঁহার সঙ্গে একতারা নোট দিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বামীজী উহা লইতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “যদি তুমি আমার কিছু দিতে ইচ্ছা কর, তবে কোচিনের একখানি টিকিট কিনিয়া দাও। আমি রানেশ্বর চলিয়াছি; ২৪ দিন কোচিনে থাকিতেও পারি।” অমাত্যের অগত্যা তাঁহাকে কোচিন পর্য্যন্ত একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলেন ও কোচিন রাজ্যের দেওয়ান শঙ্করায়ার নিকট তাঁহার একখানি পরিচয়পত্র দিলেন।

কোচিনে তিনি অল্প কয়েকদিন কাটাইয়া কেরলের (মালাবার) অন্তর্গত ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এখানকার চিত্রবৎ মনোরম শোভা-সন্দর্শনে তিনি অতিশয় পুলকিত হইলেন ও রাজধানী ত্রিবাঙ্গুরে ত্রিবাঙ্গুর মহারাজের ভ্রাতৃপুত্রের শিক্ষক অধ্যাপক সুন্দররমণ আয়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে মাল্যাজের সুবিখ্যাত পণ্ডিত মিঃ রঙ্গচারীয়ার মহারাজের কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

ত্রিবাঙ্গুরের এস. কে. নায়ার লিখিতেছেন—“রঙ্গচারীয়ার ও সুন্দররমণ উভয়েরই সংস্কৃত ও ইংরেজীতে অগাধ-পাণ্ডিত্য; ইঁহারা স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া অতিশয় প্রীত ও উপকৃত হইলেন। বাস্তবিক স্বামীজীর সহিত বাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার

---

১ ইনি এ সময়ে মাল্যাজ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক মহারাজের ভ্রাতৃপুত্র ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যের প্রধান রাজকুমার মার্ত্তণ্ডার্য্যার শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্ত প্রেরিত হইয়া ছিলেন। রাজকুমার তাঁহার সাহায্যে বি. এ. পাশ করিয়া এম. এ. পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। একস্থানে একসঙ্গে বহু ব্যক্তির বহু প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার তাঁহার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। স্পেন্সার হউক, কালিদাস হউক, সেক্সপীয়র হউক, ডারউইনের বিবর্তনবাদ হউক, ইহুদীদিগের ইতিহাস হউক, আর্য্যসভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কথা হউক, অথবা বেদ-বেদান্ত, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র হউক—কোন বিষয়ে তাঁহাকে পশ্চাৎপদ দেখা যাইত না। যে-কোন প্রশ্ন হউক তাহার ঠিক উত্তরটি তাঁহার মুখে লাগিয়া আছে। তাঁহার মুখাবয়বে সরলতা ও মহত্ব স্পষ্ট লেখা ছিল এবং নির্মল হৃদয়, তপস্বীপুত্র জীবন, উদার বুদ্ধি, উন্মুক্ত চিত্ত, অসঙ্কীর্ণ দৃষ্টি ও সর্বভূতে সহানুভূতি—এইগুলি তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল।”

এখানেও তিনি সমগ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে বহুবিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও পতিত জাতিদিগের উদ্ধার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে সুন্দররমণের পুত্র লিখিয়াছেন—“তিনি রাষ্ট্র-গমনে আমাদিগের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। যদি তাঁহার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে রাজাই মনে করিতাম। তাঁহার কথাবার্তা, ভাব সবই বিশ্বময়জনক। ভারতের সমুদয় ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলি যেন তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি সমগ্র ভারতকে এক অথও প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত পদার্থরূপে দেখিতেন। বাস্তবিক তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন। জিব্রাল্টরের যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সে-ই অনুভব করিয়াছে যে ভারতের কল্যাণের জন্ত এক মহান আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।”

আমরা এখানে সুন্দররমণের স্বরচিত কৃতান্তটি ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম।



## দাক্ষিণাত্যে

“১৮৯২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ত্রিবাঙ্করে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতের অনেক স্থান পর্যটন করিয়া এইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত একজন মুসলমান অনুচর ছিল। তাঁহারও বেশভূষা এইরূপ যে দেখিয়া মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইত। আমার দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্র তাঁহাকে মুসলমান মনে করিয়া সেই ভাবে আমাকে থবর দিল। আমি তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া তাঁহার বথার্থ পরিচয় প্রাপ্তির পর তাঁহাকে সসন্ত্রমে অভিবাदन করিলাম। তিনি সর্বপ্রথমই আমাকে মুসলমান চাকরটির আহ্বারের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি কোচিনরাঙ্কের একজন পিয়ন, তত্রত্য দেওয়ান মহোদয়ের সেক্রেটারী ডিভাগাপট্টম কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ ডবলিউ. রামাইয়া বি. এ. কর্তৃক স্বামীজীকে এখানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তাঁহার সহিত প্রেরিত হইয়াছিল। স্বামীজী নিজেই জ্ঞাত কোন প্রকার পরিচয়পত্র গ্রহণ বা সুবিধামত বন্দোবস্ত করিবার জ্ঞাত পূর্ব হইতে এখানে কোনরূপ সংবাদ প্রেরণ করেন নাই। শুনিলাম, দুই দিন হইতে তিনি দুই ব্যতীত অন্য কোন খাজ গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু অগ্রে মুসলমান অনুচরটির আহ্বারের ব্যবস্থা না হইলে স্বয়ং আহ্বার করিতে সম্মত হইলেন না।

“২১৪ মিনিট কথাবার্তায় বুঝিলাম, স্বামীজী একজন বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ। জিজ্ঞাসা করিলাম, সাধারণতঃ তিনি কিরূপ খাজ-ভোজনে অভ্যস্ত। তিনি উত্তর করিলেন, ‘বাহা আপনার অভিরুচি; আমরা সন্ন্যাসী, বাহা পাই তাহাই খাই।’ তিনি বাঙ্গালী জানিতে পারিয়া আমি বলিলাম, ‘বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেক মহৎ ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন সর্বশ্রেষ্ঠ।’ ইহার উত্তরে

## স্বামী বিবেকানন্দ

আমি প্রথম তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ও তদীয় আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শ্রবণ করিলাম। তিনি কেশব বাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় বালক বলিয়া উল্লেখ করাতে আমি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তাহার পর শুনিলাম শুধু কেশব বাবু নহেন, কিছুদিন পূর্ব্বেকার অনেক খ্যাতিনামা বাঙ্গালীই এই মহাপুরুষের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং কেশব বাবু স্বয়ং শেষ জীবনে তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক জগতের অনেক নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম্মমতের বহুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এমন কি অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র হইতেন এবং তাঁহাকে দেবতার স্থায় পূজা করিতেন। বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব্বে পরিচালক মিঃ জি. এইচ. টনি মহোদয় পরমহংসদেবের চরিত্র, প্রতিভা, উদারভাব এবং দৈবীশক্তির উল্লেখ করিয়া একটি সুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

“ইতোমধ্যে স্বামীজীর আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইল, তিনি প্রায় দুই দিন পর পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন। তাঁহার আকৃতি, কঠিন, চক্ষুর দিব্যোজ্যোতিঃ, উচ্চভাব এবং অদ্ভুত বচনবিশ্বাস আমাকে এতদূর মুগ্ধ করিল যে, আমি সেদিন আর রাজপুত্র মার্ত্তণ্ড বর্ম্মাকে পড়াইতে গেলাম না। আহাৰ্য্যান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আমি স্বামীজীকে লইয়া সন্ধ্যার সময় ত্রিবাঙ্গম কলেজের রসায়ন-অধ্যাপক দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাতিনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রঙ্গাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া আমরা ত্রিবাঙ্গম ক্লাবে গেলাম। কিঞ্চিৎ পরে রঙ্গাচার্য্য উপস্থিত হইলে, আমি স্বামীজীকে তাঁহার সহিত, অধ্যাপক সুন্দররাম পিলে এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম। এই সময়কার একটি



## দাক্ষিণাত্যে

ঘটনার কথা আমার বেশ মনে আছে। নারায়ণ মেনন নামে আমার এক বন্ধু (ইনি বর্তমানে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একজন দেওয়ান-পেশকার) ক্লাব হইতে বিদায়গ্রহণ-কালে একজন ব্রাহ্মণ দেওয়ান-পেশকারকে প্রণাম করিলে, শেষোক্ত ব্যক্তি খুঁদ্রকে প্রত্যভিবাदन করিবার প্রচলিত রীত্যনুসারে দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বাম হস্ত কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি চতুর্দিকে; তিনি এই ঘটনাটি লক্ষ্য করিলেন। তারপর কত লোক আসিল—চলিয়া গেল। সর্বশেষ আমরা পাঁচজন মাত্র রহিলাম—স্বামীজী, উক্ত দেওয়ান-পেশকার, তাঁহার ভ্রাতা, অধ্যাপক রঙ্গাচার্য ও আমি। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর আমরাও স্ব স্ব গৃহে যাইবার জন্ত উঠিলাম। দেওয়ান-পেশকার স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু স্বামীজী প্রতিপ্রণাম না করিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীদিগের নিয়মমত শুধু নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে পেশকার মহাশয়ের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। কিন্তু স্বামীজী এদিকে অতি শান্তস্বভাব এবং স্নিগ্ধ ও মধুর ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলেও বিশেষ প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধি ছিলেন এবং প্রয়োজন হইলে কাহাকে কিরূপ উত্তর দিয়া নীরব করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। দেওয়ান-পেশকারের উত্তরে বলিলেন, ‘আপনি যদি নারায়ণ মেননকে প্রত্যভিবাदन করিবার সময়ে আপনাদিগের প্রচলিত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন, তবে আমি সন্ন্যাসীর রীতি অনুযায়ী প্রত্যভিবাदन করাতে আপনার ক্রোধের উদয় হওয়া কি সম্ভব?’ এই উত্তরে আশানুরূপ ফল ফলিল। পরদিন পেশকার মহাশয়ের ভ্রাতা আমাদিগের নিকট আগমন করিয়া পূর্বরাত্রির ঘটনার জন্ত স্বামীজীর নিকট ক্রটি স্বীকার করিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

“ঐ দিন সন্ধ্যায় ক্লাবে অল্পক্ষণ থাকিলেও স্বামীজীকে দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি সকলেরই সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্যকে তাঁহার সহিত আলাপের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বুঝিলেন। বাস্তবিক অগাধ পাণ্ডিত্য, ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা, ভাবায় অদ্ভুত অধিকার, প্রয়োজনমত বিপুল বিদ্যাবুদ্ধিকে আয়ত্ত্বাধীনে আনিয়া কোন বিষয় হইতে নূতন শিক্ষা লাভ করা বা কাহারও যুক্তির ভ্রম-প্রমাদ প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা এবং প্রকৃতি ও মনুষ্যকৃত শিল্পের মধ্যে যাহা কিছু উত্তম ও সুন্দর তাহার প্রতি অনুরক্তি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত উক্ত অধ্যাপকের সোসাদৃশ্য ছিল।

“পরদিন স্বামীজী রাজকুমার মার্ত্তণ্ড বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি আমার শিক্ষাধীনে থাকিয়া এম. এ. পড়িতেছিলেন। এক্ষণে আমার নিকট হইতে এই নবাগত অতিথির অসাধারণ জ্ঞান ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমি স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম ও আমার সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। স্বামীজী ভ্রমণকালে অনেক দেশীয় রাজত্ব-বর্গের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন শুনিয়া রাজকুমারের মনে ঐ-সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিবার কোতূহল উদ্বোধিত হইয়া উঠিল। স্বামীজী বলিলেন, তাঁহার সহিত যে-সকল দেশীয় রাজার সাক্ষাৎ হইয়াছে তন্মধ্যে বরোদার গাইকোয়ারের কার্য্যদক্ষতা, স্বদেশপ্রীতি ও রাজকার্য্য-পরিচালনে বিচক্ষণতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই প্রসঙ্গে তিনি খেতড়ির ক্ষুদ্র রাজপুত রাজার গুণগ্রামেরও বহু প্রশংসা করিলেন এবং শেষে বলিলেন যে, তিনি যতই দক্ষিণের দিকে অগ্রসর



## দাক্ষিণাত্যে

হইয়াছেন ততই রাজাদিগের চরিত্র ও শক্তির অবনতি লক্ষ্য করিয়াছেন। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীজী তাঁহার পিতৃব্য ত্রিবাঙ্গুররাজকে দেখিয়াছেন কি না। স্বামীজী বলিলেন, 'না।' তারপর মহীশূর-মহারাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা পর স্বামীজী রাজকুমারের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ২৪টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অত্যাশ্চর্য্য লোকের ত্রায় রাজকুমারও স্বামীজীর আকৃতি-প্রকৃতিতে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ফটোগ্রাফ তুলিবার সখ ছিল। সুতরাং স্বামীজীর একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফ লইলেন। পরে উহা মাদ্রাজ মিউজিয়মের চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রেরিত হয়।

“তিনি সর্ব্বশুদ্ধ নয় দিবস আমার বাটীতে ছিলেন। এই নয়দিনই তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। সকল কথা আমার এখন স্মরণ নাই, তবে মৎস্ত-মাংসাদি-ভক্ষণ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হইলেও মোটের উপর ঐ নয় দিবসের স্মৃতি চিরদিন আমার মনে জাগরুক আছে ও আজীবন থাকিবে। বিজ্ঞানের স্পর্শকার উল্লেখ করিয়া তিনি একদিন বলিলেন যে ধর্ম্মের যেমন গোঁড়ামি আছে বিজ্ঞানেরও তেমনি গোঁড়ামি দেখিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তই অনুমানসূচক এবং সমজাতীয় ঘটনা-সমূহের মধ্যে সুসামঞ্জস্য-বিধানের অসমর্থ। অথচ অনেক বৈজ্ঞানিকই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার জগতের সমুদয় রহস্যই ভেদ করিয়াছেন।

১ ইহার দুই দিন পরে রাজ-দেওয়ান শব্দর সুব্বিয়ার মহোদয়ের সাহায্যে ত্রিবাঙ্গুর মহারাজের সহিত অন্তর্দর্শনের জন্য স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহারাজ তাঁহাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া দেওয়ানজীকে তাঁহার থাকিবার ও রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট ভ্রমণ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

অনেকে আবার অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে শুধু তাঁহাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। বুঝা যায় যে, ভারতে চিন্তাসমাধানের যে-সকল বিজ্ঞানসম্মত উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব তাহার কোন সংবাদই রাখে না এবং সেই জন্য অন্তঃপ্রকৃতির অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে কোন প্রকার মীমাংসা করিতেও সমর্থ হয় না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যেখানে স্তব্ধ ও নিরস্ত, ভারতীয় মনোবিজ্ঞান সেখানে অপূর্ণ আলোক প্রদান করিয়াছে—দেখাইয়াছে, ঐসকল উচ্চ অনুভূতি ও অবস্থাকে কি করিয়া চেষ্টার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারা যায়। আর একটি বিষয় সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছিলেন—উহা লৌকিক ও অলৌকিক জগতের বিশেষত্ব। তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বন্ধনের মধ্যে বাস করে। এই উভয়কে অতিক্রম না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ বা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয় না। জাতিভেদের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ যতদিন নিঃস্বার্থ কৰ্ম্ম করিবেন ও মুক্তহস্তে জ্ঞান বিতরণ করিবেন ততদিন তাঁহার বিনাশ নাই। তাঁহার কথাগুলি আজও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—‘ব্রাহ্মণ ভারত-বর্ষে পূর্বে অনেক মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করিবেন।’ জীলোকদিগের বিবাহ ও সমাজে তাঁহাদিগের স্থান লইয়া কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নিয়ম প্রচলন করিবার চেষ্টা তিনি আদৌ অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন, ‘জীলোক ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার করা সর্বোপযোগী আবশ্যক। প্রাচীন ঋষিদিগের প্রবর্তিত শিক্ষা দ্বারা তাহার কার্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে পারিলে আগনারাই বৃদ্ধিতে পারিবে সমাজের কোন্‌খানে তাহাদের স্থান



## দাক্ষিণাত্যে

নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, কি কি কার্যে তাঁহাদের দৃষ্টদৃষ্টি করা সম্ভব এবং কোন্টা রক্ষা বা বর্জন করা আবশ্যক।' আমি সহস্রাব্দী যুদ্ধে তাঁহার মত জানিতে চাহিয়াছিলাম। তত্বতঃ তিনি বলিয়াছিলেন, 'বেশ্য-প্রচার দ্বারা পাশ্চাত্য দেশসমূহের সামাজিক অবস্থা আরও উন্নত করা সরকার। যাহারা প্রাচীন আচার-বিচারের সম্মান করিতে চাহেন তাঁহারা উহা করুন, কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে-কল হিন্দু কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ত উক্ত আচারাদি নিয়ম-পালনে অক্ষম হইবেন, তাঁহাবিগকে যুগা প্রদর্শন করিবারও কোন সম্ভব কারণ দেখা যায় না।'

"স্বামীজী আমার আলায়ে উপস্থিত হইবার দুই-তিন দিন পরে আমি ত্রিবাঙ্গমে আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রেরণ করিলাম। ইনি এখনও জীবিত আছেন এবং আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, প্রগাঢ় জ্ঞান, বিজ্ঞাবত্তা, পবিত্র জীবন এবং অকপট ঈশ্বর-প্ৰীতির জন্ত আমি ইহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতাম এবং এখনও করিয়া থাকি। ইহার নাম শ্রীযুক্ত রাম রাও। ইনি ত্রিবাঙ্গুরের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাবিভাগের পরিচালক। স্বামীজীর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও তীব্র ঈশ্বরানুরাগ-দর্শনে রাম রাও সাতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে একদিন নিজ আবাসে ভিক্ষাগ্ৰহণের জন্ত আকিঞ্চন করিতে লাগিলেন। স্বামীজীও অহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ভিক্ষাস্তে উভয়ে একত্রে আমার বাটাতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বামীজী পূর্ববৎ আমাদের সহিত বিবিধ শিক্ষাপ্রদ ও মনোহর আলাপ করিতে লাগিলেন। আমার আজও পর্যন্ত পরিস্কার স্মরণ আছে যে, রাম রাও তাঁহাকে একবার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ যুদ্ধে দুই-চারি কথা জিজ্ঞাসা করাতে স্বামীজী একটি অতি সুন্দর গল্পের

## স্বামী বিবেকানন্দ

অবতারণা করিলেন। গল্পটি অনেকাংশে ‘কৃষ্ণকর্ণামৃতম্’-র চরিত্রা বিখ্যাত কবি লীলাগুপ্তের উপাখ্যানের অনুরূপ। গ্রন্থের নায়ক শেখ অবস্থায় বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া তখনকার এক শ্রেষ্ঠিকৃত্যর প্রণয়ে পড়িয়া নির্যাতন ভোগ করিলে ক্ষোভে অনুতাপে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া অবশেষে ত্রীকৃষ্ণধ্যানে মগ্ন হইয়াছিল। এই ঘটনাটি স্বামীজী এমনই চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, আজ একুশ বৎসর পরেও আমি যেন তাঁহার কথাগুলি অবিকল সেইভাবে গুনিতে পারিতেছি বলিয়া মনে হইতেছে। কুম্ভকোণমের ভূতপূর্ব অদ্বুত শক্তিশালী সঙ্গীতজ্ঞ শরৎ শাস্ত্রীয়ারের অমর বংশীধ্বনির ত্রায় তাঁহার স্মৃধুর কণ্ঠধ্বনি এখনও যেন আমার কর্ণে লাগিয়া আছে।

“ঐ দিন বা তৎপর দিবস তিনি আমার মাদ্রাজের তদানীন্তন সহকারী একাউন্ট্যান্ট জেনারেল বাবু মন্থনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসা অনুসন্ধান করিবার জন্ত বলিলেন। মন্থ বাবু ঐসময়ে ত্রিবাঙ্গমের রেলিডেণ্টের কোষাগারে এক তহবিল-তহররূপ তদন্তে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের সন্ধান পাওয়ার পর হইতে স্বামীজী প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া একেবারে আহালাদি শেষ করিয়া আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। একদিন আমি ঐ জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, ‘দেখুন, আমাদের বাঙ্গালী জাতটা এক জামগায় দল বাঁধিয়া থাকিতে বড় পছন্দ করে। তাহা ছাড়া মন্থের উপর আমার দুইটি দাবী আছে। প্রথমতঃ সে আমাদের সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ত্রায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র; দ্বিতীয়তঃ সে আমার সহাধ্যায়ী। তাহার উপর আর একটা কথা যে, আপনাদের এই দক্ষিণদেশে আসা অবধি আমি বরাবর এ-দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; সুতরাং



## দাক্ষিণাত্যে

বহুদিন মাছ-মাংসের সম্পর্কে আমি নাই, সে জন্তুও মন্থণের ওখানে খাওয়াটা আমার একটু ভাল লাগিতেছে।' আমি মৎস্যভক্ষণের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিলাম। তৎক্ষণে স্বামীজী বলিলেন, 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা মাংস ভক্ষণ করিতেন, এমন কি যজ্ঞাদির সময়ে বা অতিথিকে মধুপর্ক দিতে হইলে তখন গোবধ করা হইত।' তিনি আরও বলিলেন, 'বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে মাংসভোজন প্রথা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে হিন্দুশাস্ত্রে আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ-ভোজনের প্রশংসা আছে বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটা কতদূর পালিত হইত তাহা বিচার্য্য বিষয়। আর এটাও ঠিক যে, আমিষ-ভোজন প্রথার অনাদর হওয়াতেই এদেশের লোকের শক্তিসামর্থ্য এত হীন ও জাতীয় অবনতি এত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। বলিতে গেলে প্রাচীন হিন্দুজাতি ও সম্মিলিত হিন্দুরাজ্যসমূহের স্বাধীনতা লোপের এক প্রধান কারণ এই মাংস-ভক্ষণ প্রথার উচ্ছেদসাধন। আমি তাঁহার কথাবার্তা হইতে এইটুকু বুঝিলাম যে, তাঁহার মতে যদি হিন্দুজাতিটাকে জগতের অগ্রাগ্র জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাদের আবার মাংসানী হইতে হইবে। আমি একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, স্মৃতরাং এ বিষয়ে তাঁহার সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারিলাম না। বরং 'অহিংসা পরম ধর্ম'র পক্ষ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র ও সাধারণ যুক্তির সাহায্যে তাঁহার সহিত অনেক তর্ক করিলাম। এ-সম্বন্ধে তাঁহার মতটা জানিতাম বলিয়া পরে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থানকালে মাংসাদি-ভোজনের কথা শুনিয়া আমি তেমন আশ্চর্য্য বোধ করি নাই, এবং বেশ বুঝিতে পারি ঐ বিষয় লইয়া তখন তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা নিন্দা ও আন্দোলন হইয়াছিল তাহা তিনি কিরূপ নীরব অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

“একদিন সন্ধ্যার সময় স্বামীজী দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। সেদিনও পুনরায় ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। দেওয়ান সাহেব আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, ‘প্রাচীনকালে যজ্ঞ বা অন্য কোন সময়েই প্রাণিবধ-প্রথা প্রচলিত ছিল না।’ ইহাতে কিয়ৎক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলিল; শেষে দেওয়ানজীর জামাতা মিঃ এ. রামিয়ার স্বামীজীর কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন, ‘যজ্ঞে পশুবধ ও মাংস-ভোজনের বৃত্তান্ত সত্য বটে, শাস্ত্রে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।’ ঐ দিন ‘ভক্তি’ সম্বন্ধেও দেওয়ানজীর সহিত স্বামীজীর কিঞ্চিৎ কথাবার্তা হইয়াছিল। কেমন করিয়া কথাটা উঠিল ও এ-সম্বন্ধে কি কি কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা এক্ষণে আমার কিছুই স্মরণ নাই। দেওয়ান শঙ্কর সুবিয়ার সে-সময়কার একজন অতিশয় বিদ্বান পুরুষ ছিলেন এবং এত অধিক বয়সেও (তখন তাঁহার বয়স ৫৮) খুব পড়াশুনা করিতেন ও নানাবিধ পুস্তকপাঠে প্রত্যহ আপনার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেন। কিন্তু সেদিন স্বামীজীর সহিত তাঁহার কথাবার্তা ভেমন জন্মে নাই, আর বেশীক্ষণ আলাপ করিবার মত অবকাশও তাঁহার ছিল না, সুতরাং আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। বিদায়কালে দেওয়ানজী স্বামীজীকে বলিলেন, রাজ্যমধ্যে ভ্রমণকালে তাঁহার যখন যে-বিষয়ে প্রয়োজন হইবে তাহা স্থানীয় রাজকর্মচারীকে জানাইবামাত্র সিদ্ধ হইবে ইত্যাদি। কিন্তু স্বামীজীর কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয় নাই বা তিনি কিছু প্রার্থনাও করেন নাই।

“ইতোমধ্যে একদিন হুজুর আফিসের পেন্ডার শ্রীযুক্ত পেরুমল পীলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ ও অন্তর্গত স্থানে যে-সকল বিবিধ ধর্ম ও ধর্মমত প্রচলিত



## দাক্ষিণাত্যে

আছে ঐ সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান কতটা তাহাই নির্ণয় করা। সুতরাং তিনি আসিয়াই অদ্বৈত বেদান্তের উপর গোটাকতক খোঁচা বসাইলেন, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামীজীর ত্রায় শূঙ্ক ও আচার্য্যশ্রেণীর লোকদিগের জ্ঞানের গভীরতার পরিমাণ-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা অপেক্ষা তিলার্দ্ধকাল নষ্ট না করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে যতটা উচ্চভাব আদায় করিয়া লইতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করা অধিক বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই উপলক্ষে আমি স্বামীজীর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিলাম। ১৮৯৭ সালে মাদ্রাজের কার্ণান ক্যাসলে তাঁহার নয় দিবস অবস্থানকালে আর একবার এটি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা এই—কোন আত্মাভিমानी ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিবামাত্র তিনি এক নিমিষে তাহার দোড় বুঝিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বুদ্ধি ও বিচারানুরূপ উপদেশ দিতে পারিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা এত অধিক এবং কৌশল একরূপ চমৎকার ছিল যে, সে ব্যক্তি বুঝিতেও পারিত না তিনি কখন তাহাকে তাহার উপযুক্ত সমভূমিতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। এদিনও পেঙ্কারের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী 'ললিতবিস্তর' হইতে বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য-বিষয়ে কতকগুলি শ্লোক স্মললিতকণ্ঠে এমন মধুরভাবে আবৃত্তি করিলেন যে, আগন্তুক ভক্তলোকটির হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল এবং তিনি প্রশ্ন-কর্তার আসন ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই শ্রবণোৎসুক শ্রোতার পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। স্বামীজী সেই সুযোগে তাঁহার চিত্তে বুদ্ধের বৈরাগ্য, সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সর্বজ্ঞাতি ও সর্বশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের একটি স্থায়ী চিত্র অঙ্কিত করিয়া ছিলেন। প্রশ্নটি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিল, উহা শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকর্তার পূর্বভাবের অনেক পরিবর্তন হইল। তিনি তাহা মুক্তকণ্ঠে

## স্বামী বিবেকানন্দ

স্বীকারও করিলেন এবং প্রস্থানকালে বলিয়া গেলেন, 'স্বামীজীর ছাত্র অদ্বিতীয় পুরুষ আর কখনও আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, এবং আজিকার এই কথাবার্তা এ জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না।'

“ইহার পর আরও কয়েক দিন ধরিয়া বহু বিষয়ের আলোচনা হইল এবং আমি তত্ত্ব বিষয়ে স্বামীজীর অভিমত জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলাম। এখন সব কথা মনে নাই, তবে ছুটি বিষয় মোটামুটি বেশ স্মরণ আছে। একবার আমি তাঁহাকে সাধারণের সমক্ষে একটি বক্তৃতা দিবার জন্ত বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তৎক্ষণে বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার কখনও অভ্যাস হয় নাই, সুতরাং উহাতে তিনি হাশ্বাস্পদ ও অকৃতকার্য হইবেন। আমি তাঁহাকে প্রীতিসা করিলাম, 'তাই যদি হয় তবে আপনি চিকাগোর বিরাট ধর্মসভায় মহীশূরাধিপের অনুরোধ রক্ষার্থ হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে কেমন করিয়া সাহস করিতেছেন?' স্বামীজী ইহার যে উত্তরটি দিয়াছিলেন তাহা তখন আমার মনে পুত হয় নাই। ভাবিয়াছিলাম বুঝি কথাটা কাটাইয়া দিবার জন্ত যাহোক একটা জবাব দিলেন, কারণ তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি সর্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের ইচ্ছা হয় যে আমি তাঁহার কার্যসাধনের উপায় হইব এবং আমার মুখ দিয়াই তাঁহার বাণী জগতে ঘোষিত হইবে তাহা হইলে তিনি আমার তত্বপূর্ণাঙ্গী শক্তি নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন।' আমি বলিলাম, 'আমি ঈশ্বরের ওরূপ কিছু করা সম্ভব বা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি না।' ঐরূপ বলিবার কারণও ছিল। আমি তৎকালে সাধারণভাবে হিন্দুধর্মের তত্ত্বগুলিতে যথেষ্ট বিশ্বাসবান হইলেও মূল শাস্ত্র গ্রন্থসমূহ তখনও পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করি নাই। সুতরাং তাহাদের প্রতিপাদিত বিষয়গুলিতে এতাদৃশ অন্তর্দৃষ্টি-লাভ বা সে সম্বন্ধে এরূপ



## দাক্ষিণাত্যে

প্রত্যক্ষ অনুভূতি হয় নাই যে, তদ্বারা স্বামীজীর বাক্যের প্রকৃত মর্মগ্রহণে সমর্থ হই। আমার কথা শুনিয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ যেন প্রচণ্ড গদাহস্তে আমার উপর পড়িলেন। আমি বিশ্বের গুঢ় উদ্দেশ্য-সাধনে বিধাতার ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করিতে উত্তত হইয়াছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, ‘ছিঃ-ছিঃ, তোমার এ কি বুদ্ধি! যাহার শক্তির আদি অন্ত নাই, তুমি তাঁহাকে সীমার মধ্যে আনিতে চাও? তুমি বহিরাচার ও বাক্যে গোঁড়ামি দেখাইলে কি হইবে? অন্তরে যে এখনও নাস্তিক রহিয়াছ, নতুবা এখনও তাঁহার শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই কেন?’

“আর একবার ভারতবাসীদের জাতি ও বর্ণভেদ লইয়া তাঁহার সহিত আমার মতভেদ হয়। তিনি বলিলেন, ‘কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ দেখিলেই বুঝিতে হইবে উহাতে দ্রাবিড়-রক্ত মিশ্রিত হইয়াছে’; আমি বলিলাম, ‘তাহার অর্থ কি? মনুষ্যের বর্ণের তারতম্য জলবায়ু, আহার, কৰ্ম ইত্যাদি নানা বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে।’ স্বামীজী ইহার উত্তরে অনেক প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন অত্যাশ্চর্য মনুষ্যজাতির ত্রায় ব্রাহ্মণও একটি মিশ্রিত জাতি। তাহাদের শোণিতগত বিশুদ্ধতার কথা নিতান্ত কাল্পনিক। আমি সি. এল. ব্রেস ও আরও অনেক হোমরা-চোমরা লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া নিজ বাক্যের পোষকতা করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না।

“এইবার আমার বক্তব্য শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিব, তবে এইখানে একটা কথা বলা বিশেষ দরকার। তিনি যে-কয়দিন আমাদের নিকট ছিলেন, সে-কয়দিন প্রত্যেকের হৃদয় তাঁহার নিকট বাঁধা পড়িয়াছিল। তিনি আমাদের প্রত্যেকের নিকট নিরবচ্ছিন্ন মধুরতা, কোমলতা ও সৌন্দর্যের আকর ছিলেন। আমার পুত্রেরা প্রায় সদাসর্বদাই তাঁহার সংসর্গে

## স্বামী বিবেকানন্দ

থাকিত; তাহাদের একজন এখনও কথায় কথায় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে এবং তাঁহার আগমন ও অদ্ভুত চরিত্রের বিষয় অতি স্নন্দন মনে করিয়া রাখিয়াছে। স্বামীজী গুটিকতক তামিল শব্দ শিখিয়াছিলেন এবং আমাদের বাটার পাচক ব্রাহ্মণের সহিত তামিল ভাষায় কথোপকথন করিতে বড় আমোদ পাইতেন। আমাদের মনে হইত না যে, একজন বাহিরের লোক আমাদের পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ অন্ধকার হইয়া গেল।

“তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর আমাদের ত্যাগ করিয়া গেলেন। প্রস্থানের অব্যবহিত পূর্বে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। পণ্ডিত বঙ্কিম্বর শাস্ত্রী নামে সংস্কৃত-ব্যাকরণরূপ দ্রুহ শাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ এক ভদ্রলোক ত্রিবাঙ্কুরের প্রধান রাজকুমারের বৃত্তিভোগী ছিলেন এবং বিদ্যা, বিনয় ও ধর্ম্মশীলতার জ্ঞাত সকলের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল। রাজকুমার আমার অনুরোধে তাঁহাকে আমার পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষার জ্ঞাত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজী যতদিন আমাদের গৃহে রহিলেন তাহার মধ্যে তিনি একবারও আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন নাই। শুনিয়াছিলেন বটে যে উত্তর ভারত হইতে একজন মহাপণ্ডিত সাধু আমার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ দেখা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। স্বামীজী ও মন্থথ বাবু যখন গাড়ীতে উঠিবার জ্ঞাত সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন ঠিক সেই সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে পুনঃ পুনঃ বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, যত অল্প সময়ের জ্ঞাতই হউক একবার যেন স্বামীজীর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যদর্শনে আমি স্বামীজীর নিকট তাঁহার অভিপ্রায় নিবেদন করিলাম। তৎপ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ



## দাক্ষিণাত্যে

পণ্ডিতজীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। মোটের উপর ৭।৮ মিনিট কথাবার্তা হইল। আমি সে সময় সংস্কৃত জানিতাম না, সুতরাং কি কথাবার্তা হইল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পণ্ডিতজী বলিলেন, ‘ব্যাকরণ শাস্ত্রেরই একটা মহা জটিল ও তর্কযোগ্য বিষয়ে প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল এবং ঐ অল্প সময়ের আলাপেই স্বামীজী সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষার তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।’

“এই ভাবে নয় দিনের অবসান হইল। এই নয় দিনের ঘটনাবলী আমার স্মৃতি-পথে ‘নয় দিনের আশ্চর্য্য’রূপে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আছে; এ জীবনে আর সে স্মৃতি মুছিবার নয়। স্বামীজীর মহৎ চরিত্র ও অমূল্যবিক্রম জীবন ইতিহাসে এক নূতন যুগের সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এই পবিত্র ভূমিতে যে-সকল অমরকীর্তি আধ্যাত্মিকশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ দিব্য জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সহিত একাসনে স্থান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অতীত দিনের এইসকল ব্যক্তিগত স্মৃতি যদিও নিতান্ত সামান্য ও সেই মহনীয় আচার্য্যের চরিত্রমহিমার সম্যক তাৎপর্য্য-প্রদানে অতীব অকিঞ্চিৎকর, তথাপি যিনি তাঁহার সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নরসমাজের হৃদয়কে এমন বাঁধনে বাঁধিয়াছিলেন ও এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় স্মরণ করাও অল্প আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় নহে।”

স্বামীজী এখান হইতে রামেশ্বর অভিমুখে গমন করিলেন। পথে মাহারায় রামনাদরাজ ভাস্কর সেতুপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুশিক্ষিত ভারতীয় রাজগুরুবৃন্দের অগ্রতম, ভক্তশ্রেষ্ঠ রামনাদপতি স্বামীজীর একজন বিশেষ অনুরাগী ভক্ত হইয়া উঠিলেন ও পরিশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিলেন। মহীশূর-রাজের ছাত্র ইঁহার নিকটও স্বামীজী সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও কৃষিবিষয়ক উন্নতি-সাধন সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেন এবং ভারতের বর্তমান সমস্যাগুলির সমাধান ও তাহার ভবিষ্যৎ মহৎ সম্ভাবনার পথ নির্দেশ করিয়া দেন। রামনাদ-রাজ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন যে, এতদিনে সত্যই ভারতে একজন প্রকৃত কৰ্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে। স্বামীজী সেই কৰ্ম্মবীর—দেশজননীর সেই স্নসন্তান। স্বামীজীর কথাবার্তার উপর তাঁহার এতদূর শ্রদ্ধা জন্মিল যে, তিনি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চিকাগো মহাসভায় যাইবার জন্ত বলিলেন ও সেজন্ত যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেও প্রতীশ্রুত হইলেন। কারণ, তাঁহার মনে হইল, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক আলোকের প্রতি প্রতীচ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার একুপ সুযোগ আর সহসা হইবে না। কিন্তু স্বামীজী তখন রামেশ্বর দর্শনের জন্ত বিশেষ ব্যগ্র, সুতরাং এ-সম্বন্ধে তিনি কি স্থির করেন পরে তাহা মহারাজের কর্ণগোচর করিবেন বলিয়া শীঘ্র ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর স্বামীজী রামেশ্বর দর্শন করিলেন। তাঁহার বহুকালের মনোবাসনা এতদিনে পূর্ণ হইল। রামেশ্বরের মন্দির অতি প্রকাণ্ড—দৈর্ঘ্যে চারি শত হস্ত, প্রস্থে এক শত হস্তের উপর এবং সিংহদ্বারটি প্রায় এক শত ফুট উচ্চ। মন্দিরের প্রাঙ্গণ বেষ্টিত করিয়া যে বারাণ্ডাগুলি আছে তাহাদের দৈর্ঘ্য মোটের উপর চারি সহস্র ফুট হইবে। দরজার উপর ও ছাদে কোন কোন প্রস্তরখণ্ড দৈর্ঘ্যে প্রায় চল্লিশ ফুট হইবে।

রামেশ্বর-দর্শন শেষ হইলে স্বামীজীর মনে, কতাকুমারী-দর্শনের অভিলাষ হইল। কতাকুমারী ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে। এখানে এক দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। স্বামীজী ভিক্ষা করিতে করিতে কুমারিকা অন্তরীপের মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দেবীদর্শন সমাপ্ত হইলে মন্দির-



## দাক্ষিণাত্যে

চত্বরে উপবিষ্ট হইয়া ভারতের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর চিন্তার নিমগ্ন হইলেন। সে চিন্তা বহুক্ষণ চলিয়াছিল। তৎসময়ে তিনি পরে চিকাগো হইতে মঠের ভ্রাতাগণকে লিখিয়াছিলেন—“কুমারিকা অন্তরীপে না কুমারীর মন্দিরে—ভারতবর্ষের শেখ পাথরটুকরার উপর বসে ভাবতে লাগলাম—এই যে আমরা এতজন সম্মানী আছি, ঘুরে ঘুরে দেখাছি, লোককে দর্শন (metaphysics) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না—গুরুদেব বলতেন না? এই যে গদীবগুনো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি, আর ছুপা দিয়ে বলিয়েছি” ইত্যাদি।

এই ভাবে দণ্ডের পর দণ্ড কাটিয়া গেল—তথাপি চিন্তার বিরাম নাই।\*

---

১ শুনা যায়, কুমারিকা অন্তরীপে স্বামীজী মন্থননাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কুমারী কন্ঠাকে কুমারীপূজা করিয়াছিলেন, হুতরাং তিনি সম্ভবতঃ এই স্থানে মন্থন বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলেন।

## প্রব্রজ্যাকালের অত্যাশ্চর্য কাহিনী

এ পর্য্যন্ত স্বামীজীর প্রব্রজ্যাকালের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি পাঠক যেন মনে করিবেন না তাহাই সম্পূর্ণ। সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনের কত ঘটনা চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যায়, কে তাহার সংবাদ রাখে! কত অরণ্যের নির্জন পথ, কত কণ্টকময় বৃক্ষতল, কত কঠিন পাষণশয্যা যে কত কাল হইতে কত সাধু-সন্ন্যাসী ও পরিত্রাণকের জীবনের কত কাহিনী বন্ধে ধারণ করিয়া আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? স্বামীজীর জীবনেও এইরূপ হইয়াছিল। আমরা তাঁহার জীবনের যে যে অংশ তাঁহার বা অত্যাশ্চর্য লোকের নিকট অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাই একত্রে গ্রথিত করিয়া পাঠকদিগের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়াছি, কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই সব শেষ হয় নাই। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার কিছু কিছু অপরের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহার সম্বন্ধে স্বামীজী, কি কারণ বশতঃ জানি না, কখনও কোন কথা নিজমুখে প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। আবার এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যে সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত কিছু না বলিয়া কিছু কিছু আভাস ইঙ্গিত দিয়াছেন মাত্র। স্বামীজী-চরিত্র সম্যক বুঝিতে হইলে ঐসকল ঘটনা বাদ দেওয়া চলে না। আমরা সেইজন্ত এই স্থানে তাহাদের কতক কতক লিপিবদ্ধ করিলাম।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গাজীপুরের অপর পারে তাড়িঘাট ষ্টেশনে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল—

স্বামীজী যখন ট্রেন হইতে তাড়িঘাট জংসনে অবতরণ করিলেন,



## প্রজ্যাকালের অন্ত্য কাহিনী

তখন মধ্যাহ্নকাল। নিদাঘ সূর্যের প্রচণ্ড তেজে নব্বমর উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বালুকারাশি অগ্নিতুল্য ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে উষ্ণ ঘূর্ণিবাত্যা বহিতেছে। স্বামীজীর হস্তে একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ও কবল এবং পরিধানে গেরুরা আলখান্না। সঙ্গে আর কিছু নাই—এমন কি একটি জলপাত্র পর্য্যন্ত নহে। চৌকিদার তাঁহাকে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ছায়ায় বসিতে দিল না, বাহির করিয়া দিল। তিনি অগত্যা কবলখানি উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর পাতিলেন ও বিশ্রামাগারের বাহিরে একটি খুঁটি হেলান দিয়া সেই কবলের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আশেপাশে অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মধ্যে উত্তর ভারতের একজন মধ্যবয়সী বেনে একটু দূরে স্বামীজীর ঠিক সম্মুখে ষ্টেশনের ছাউনীর নীচে একটা সতরঞ্চির উপর বসিয়াছিল এবং স্বামীজীর বিস্তৃত বদন ও বর্ধাক্ত কলেবর দেখিয়া নানারূপ বিজ্ঞপ ও তামাশা করিতেছিল। ঐ ব্যক্তি ও তাহার কয়েকজন সহচর গাড়ীতে স্বামীজীর সহিত একত্রে আসিয়াছে ও স্বামীজীকে যথেষ্ট বিরক্ত করিয়াছে। স্বামীজী তৃষ্ণার্ত হইয়া কয়েকটা ষ্টেশনে পানীয় জল সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে একটিও পয়সা না থাকাতে পানিপাঁড়েদিগের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত হইলেন। কারণ তাহার বাহাদিগের নিকট পয়সা পাইতেছিল সর্ব্বাণ্ডে তাহাদের জল সরবরাহ করিতে লাগিল এবং ইতোমধ্যে ট্রেনও ছাড়িয়া দিতে লাগিল। বেনেটি এদিকে পয়সা খরচ করিয়া এক লোটা ঠাণ্ডা পানি বোগাড় করিল ও তদ্বারা আপন তৃষ্ণা দূর করিতে করিতে দ্রুত অবজ্ঞাভরে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া বলিল, “ওহে, দেখছো কেমন ঠাণ্ডা জল! তুমি ত সম্যাসী হয়ে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছ। সঙ্গে এমন একটি পয়সা নেই যে জল কিনে খাও। তা দেখ মজা! তার চেয়ে যদি আমার মত পয়সা

## স্বামী বিবেকানন্দ

রোজগারের চেষ্টা করতে তবে আর এ হৃদিশা ভোগ করতে হত না।” সে ব্যক্তি এই প্রকার বাক্যবাণে স্বামীজীকে বিদ্ধ করিতে লাগিল অথচ তাঁহাকে এক বিন্দু জ্বল দিয়া সাহায্য করিল না। তাহার মতে যাহারা অর্থোপার্জনের জন্ত পরিশ্রম না করিয়া সন্ন্যাসী হয় তাহাদের উপবাস করাই উচিত। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে ব্যক্তি ট্রেন হইতে নামিয়াও পূর্ববৎ স্বামীজীকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল ও নিজে প্লাট-ফর্মের ছায়ায় বসিয়া রোদ্রক্লিষ্ট স্বামীজীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, “দেখহে, পরসার ক্ষমতা দেখ—তুমি ত পরসার-কড়ি গ্রাহ কর না, তার ফলও দেখ—আর আমি পরসার-কড়ি রোজগার করি, তার ফলও দেখ—এ সব পুরী, কচুরী, পেঁড়া, মিঠাই কি আর বিনা পরস্যায় হয়?” স্বামীজী বাড়নিষ্পত্তি না করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া নিজ চিন্তায় মগ্ন রহিলেন।

ইত্যবসরে আর একটি লোক, ঐখানেই তাহার বাড়ী, দক্ষিণ হস্তে একটি পুটলী ও লোটা এবং বাম হস্তে এক কুঁজা জ্বল ও একটা সতরঞ্চি লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং ষ্টেশনের চারিদিকে বারকতক ঘুরিয়া অবশেষে স্বামীজীর নিকট আসিয়া বলিল, “বাবাজী, আপনি রোদ্রে বসিয়া আছেন কেন? ভিতরে চলুন, আমি আপনার জন্ত কিঞ্চিৎ খাণ্ডদ্রব্য আনিয়াছি—দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।” এই বলিয়া লোকটি তাঁহাকে লুচি ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া জ্বল ও পান খাইতে দিল এবং সঙ্গে আনীত হাঁকা-কলিকায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খাওয়াইল। তাঁহার সমুদয় অভাব এইরূপ আকস্মিকভাবে দূর হইতে দেখিয়া স্বামীজী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ব্যক্তি কে, কোথা হইতে আসিল ও কেমন করিয়া তাঁহার কথা জানিল। তাহাতে সে উত্তর করিল, “আমি একজন হালুইকর। এখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে



## প্রব্রজ্যাকালের অগাধ কাহিনী

আমার এক মিষ্টানের দোকান আছে। আমি আহারাতির পর ঘুমাইতে-ছিলাম, এমন সময়ে স্বপ্নে দেখিলাম একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিতেছেন, ‘আমার সাধু ষ্টেশনে পড়িয়া অনাহারে কষ্ট পাইতেছেন। কাল হইতে তাঁহার খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। তুই শীঘ্র গিয়া তাঁহার সেবা কর।’ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মনের খেয়াল ভাবিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু আরও দুইবার ঐ প্রকার স্বপ্ন দেখায় আর কালবিগল্য না করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ পুরী তরকারী প্রস্তুত করিয়া সকালের প্রস্তুত মিঠাই, কিঞ্চিৎ জল, পান ও তামাক লইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে দৌড়াইয়া আসিলাম।” স্বামীজী প্রশ্ন করিলেন, “আমিই যে সেই সাধু তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে?” সে ব্যক্তি বলিল, “আমারও প্রথমে ঐ সন্দেহ হইয়াছিল, সেই জন্ত এখানে আসিয়াই সর্বাপ্রণে চারিদিক ঘুরিয়া দেখিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় সাধুর দর্শন না পাওয়ার বুঝিতেছি ঐ সাধু আপনি ব্যতীত আর কেহ নহেন।”

শ্লেষপ্রিয় বেনিয়াটি এতক্ষণ ধরিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে-ছিল। শেষে সে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অমূল্য হৃদয়ে স্বামীজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রাজপুতানায় আর একটি ঘটনা ঘটয়াছিল। সেটি বড় কৌতুককর। স্বামীজী যে কামরায় আসিতেছিলেন সেই কামরাতে দুইজন ইংরেজ ছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীকে নিরক্ষর সাধু বিবেচনায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ ঠাট্টা-বিজ্ঞপ ও হাসাহাসি করিতেছিলেন। কিয়দূর গিয়া ট্রেন একটা ষ্টেশনে থামিলে স্বামীজী ষ্টেশন-মাষ্টারের নিকট ইংরেজীতে এক গ্লাস খাবার জল চাহিলেন। সাহেবদ্বয় যখন দেখিল যে, তিনি ইংরেজী জানেন ও তাহারা বাহা

## স্বামী বিবেকানন্দ

বলাবলি করিতেছিল সব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন ঈশ্বর অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি তাহাদের কথা বুঝিতে পারিয়াও কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই কেন? তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, “বন্ধুগণ, মূর্খলোকের সংসর্গে আসা আমার জীবনে এই প্রথম নয়, আমি চের বেকুফ দেখিয়াছি।” সাহেবদর ইহাতে প্রথমে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহার সুগঠিত অবয়ব ও দৃঢ় তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া নিবৃত্ত হইল ও ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

আর একবার ইহাপেক্ষা আরও একটা কোতুকাবহ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল।

একজন কৃতবিশ্ব থিয়োসফিষ্ট স্বামীজীর সহিত এক কামরায় আসিতেছিলেন। সম্মুখে সন্ন্যাসী দেখিয়া তাঁহার জ্ঞানলিপ্সা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং তিনি স্বামীজীকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি হিমালয় গিয়াছেন কি না ও সেখানে যে সব বড় বড় মহাত্মা আছেন তাঁহাদের দর্শন পাইয়াছেন কি না? স্বামীজী সকল কথায় ঘাড় নাড়িয়া ‘হাঁ’ বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাতে সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐসকল মহাত্মারা দেখিতে বিশালকার, দীর্ঘজটা ও অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন অমর পুরুষ কি না।” স্বামীজী বলিলেন, “হাঁ নিশ্চয়ই, যিনি যত বড় মহাত্মা তাঁহার দেহ তত বড়, জটা তত দীর্ঘ ও শক্তি সেইরূপ অদ্ভুত।” লোকটি এইরূপ বাহা কিছু বলিতে লাগিলেন তিনি ক্রমাগত সায় দিয়া যাইতে লাগিলেন ও মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। তারপর তিনি কল্পনাসাহায্যে সেই সকল মহাত্মাদের নানারূপ বিচিত্র শক্তির কথা সেই লোকটির নিকট



## প্রবক্তাকালের অগাধ কাহিনী

সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। লোকটি হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিলেন ও শেষে দ্বিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, তাঁহার বর্তমান কল্পের (cycle) স্থিতিকাল সম্বন্ধে কি আপনাকে কিছু বলিয়াছিলেন?” তিনি উত্তর করিলেন, “বলিয়াছিলেন বৈ কি! এ সম্বন্ধে যে অনেক কথা হইয়াছিল। তাঁহার বলিলেন, ‘এ কল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে, নীত্ৰই সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। আর মহাত্মারা মানবজাতির উদ্ধারের জন্ত এই এই কার্য করিবেন।’” এই বলিয়া মহাত্মারা যে যে কার্য করিবেন তাহার একটা সুদীর্ঘ তালিকা দিলেন। সেই অতিবিশ্বাসী ভদ্রলোকটি স্বামীজীর প্রত্যেক কথা বেদবাক্যের ভ্রাম্য বিবেচনা করিয়া অসন্ধিচিন্তে শুনিয়া বাইতে লাগিলেন এবং এতগুলি নূতন সংবাদ দেওয়ার জন্ত তাঁহার উপর অত্যন্ত খুশী হইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে বলিলেন। স্বামীজীও তাহাতে অসম্মত হইলেন না। কারণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিলেও তাঁহার সমস্ত দিন আহার হয় নাই। তাহার উপর বকিয়া বকিয়া ক্ষুধা পাইয়াছিল। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও কোনরূপ দ্রব্যসঞ্চয় বা অর্থগ্রহণ করাইতে পারেন নাই। এ অবস্থায় বিনা বাক্যব্যয়ে ভদ্রলোকটির প্রদত্ত আহাৰ্য্য-দ্রব্যাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি হইল না।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে স্বামীজী লোকটিকে অনেকক্ষণ মনোবোগ সহকারে দেখিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, তাহার অন্তঃকরণটি উন্নত বটে, কিন্তু অলৌকিক ঘটনার প্রতি তাহার আস্থা কিছু বেশী। একটা কিছু অলৌকিক হইলে হয়! সে আর তাহা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাহার চক্ষুস্মীলনে প্রবৃত্ত হইলেন ও শেষে বেশ একটু কড়া করিয়া বলিলেন, “তোমরা হচ্ছ

## স্বামী বিবেকানন্দ

পণ্ডিত-মুখের দল! এদিকে লেখাপড়া ও সুশিক্ষার খুব বড়াই কর, অথচ বিনা বিচারে কতকগুলো যাচ্ছেতাই গাঁজাখুরি গল্পও গলাধঃকরণ করতে ছাড় না।”

লোকটি লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। তাহার ভাব দেখিয়া তিনি দয়ার্জ হইলেন ও তাহার মস্তিষ্ক হইতে কুসংস্কাররাশি দূর করিয়া প্রকৃত ধর্মের ভাব প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমাকে দেখিয়া ত বাপু বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার তো একটু বিবেচনা-শক্তি খাটান দরকার! ধর্মের সঙ্গে অলৌকিক ব্যাপারের বা সিদ্ধির যে নিত্য সম্পর্ক আছে, এটা কেমন করিয়া তোমার মাথায় ঢুকিল? কিন্তু ইহা দেখিতেছ না, ঐসব সিদ্ধির ব্যবহার যাহারা করে তাহারা কত বড় কামনার দাস! অহঙ্কারের ঢেঁকি! ষথার্থ ধর্ম মানে চরিত্র—সেইটাই প্রকৃত শক্তি। চরিত্রবান পুরুষেরই রিপুদমন ও বাসনাঙ্কুর হইয়াছে। আর যাহারা সিদ্ধি সিদ্ধি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ও একটা অলৌকিক শক্তি চায় তাহারা জীবন-সমস্যা-সমাধানের পথে একটুও অগ্রসর হয় নাই, খালি দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপব্যবহার করিতেছে ও স্বার্থপন্থে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এই পাগলামি করিয়াই দেশটা উচ্ছন্ন গেছে। তার চাইতে বরং পার যদি জীবনের আসল সত্যের দিকে লক্ষ্য স্থাপন কর; যাহাতে মানুষ হইতে পার এমন বিবেচনা বুদ্ধি লোকহিতৈষণা নিজেদের মধ্যে জাগাইয়া তোল। বুখা শক্তি-কন্ডির লোভে ছুটিও না—ওসব আলেয়া। এখন আমরা এমন ধর্ম চাই যাহাতে আমাদের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে, জাতীয় সম্মানবোধ জন্মায়, আর পতিত দরিদ্রদের তুলিবার ক্ষমতা ও বল ফিরিয়া আসে।



## প্রজ্ঞাকালের অত্যাচার কাহিনী

দেশের শত শত লোক অনাহারে আছে, লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে সুশিক্ষার অভাবে জন্তু-জানোয়ারের সামিল হইতেছে—এখন এই দেখিবে, না কোথায় আকাশের কোণ হইতে হিমালয়ের চূড়ার উপর কোন্ কল্পাস্তরের মহাত্মা খসিয়া পড়িতেছেন তাহাই দেখিতে ছুটিবে! বেশ করিয়া বুঝ বাপু! যদি ভগবানকে চাও, আগে মানুষের সেবা কর। যদি শক্তি চাও, আগে লোকসেবায় দেহক্ষয় কর।”

স্বামীজীর কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটির চৈতন্য হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও ওসব কাল্পনিক কথা বিশ্বাস করিবেন না।

গিরিশ বাবুকে স্বামীজী এই সময়ের একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন, এখানে তাহা বর্ণিত হইল। স্বামীজী বলিয়াছিলেন—“আমি একবার কোন স্থানে যাইবার জন্য এক রেলষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেখানে যাওয়া হইল না। অগত্যা সেই ষ্টেশনেই কয়েক দিন থাকিতে হইল। সেই সময়ে অনেক লোক দলে দলে আমার নিকট আসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিল। তিন দিন অনবরত লোকসমাগম; আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কি না তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহারাজ, আপনি তিন দিন ত অনবরত কথাবার্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমার ব্যথা লাগিয়াছে।’ আমি ভাবিলাম বুঝি নারায়ণ স্বয়ং দীনের বেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তুমি আমাকে কিছু আহার করিতে দিবে?’ সে ব্যক্তি জ্ঞতি কাতরভাবে বলিল, ‘আমার প্রাণ চাহিতেছে, কিন্তু কিরূপে আমার প্রস্তুত-করা রুটি দিব! যদি বলেন,

## স্বামী বিবেকানন্দ

আমি আটা ডাল আনি, রুটি ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।’ সে-সময়ে আমি সন্ন্যাসীর নিয়মানুসারে অগ্নি স্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম, ‘তোমার প্রস্তুত-করা রুটি আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব।’ শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত। সে খেতড়ির রাজ্যের প্রজা, রাজা যদি শোনে যে সে চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত রুটি দিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং চাই কি তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিতেও পারেন। আমি তাহাকে বলিলাম, ‘তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দেবেন না।’ এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু তথাপি সে বলবতী দয়াপ্রভাবে ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভোজ্যবস্তু আনিয়া দিল। সে-সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রের সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কি না সন্দেহ! তাহার দয়া দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। ভাবিলাম, ‘এইরূপ কত শত উচ্চচেতা ব্যক্তি পর্ণকুটীরে বাস করে, কিন্তু আমাদের চক্ষে তাহারা চিরদিন ঘৃণ্য, হীন।’”

তাহাকে উপরোক্ত মুচির প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়া ষ্টেশনের কয়েকজন ভদ্রশ্রেণীর লোক বলিয়াছিল, “আপনি যে এই নীচ ব্যক্তির স্পৃষ্ট ভোজ্যবস্তু আহার করিলেন, এটা কি ভাল হইল?” তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “তোমরা ত এতগুলি লোক আছ তিন দিন ধরিয়া আমার কত বকাইলে, কিন্তু আমি কিছু খাইলাম কি না তাহার কি খোঁজ লইয়াছ? অথচ নিজেরা ভদ্র, আর ও-ব্যক্তি নীচ বলিয়া বড়াই করিতেছ! ও যে মনুষ্যই দেখাইয়াছে তাহাতে ও নীচ কিসে?”

খেতড়িরাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার পর স্বামীজী এই



## প্রব্রজ্যাকালের অগাধ কাহিনী

ব্যক্তির দয়ার কথা মহারাজের কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। মহারাজ কয়েকদিন পরেই লোকটিকে ডাকাইলেন। সে অতিশয় ভীত হইয়া কম্পিতকলেবরে রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল, না জানি অদৃষ্টে কি নির্ঘাতন-ভোগ আছে। কিন্তু রাজা তাহাকে যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেন ও সেইদিন হইতে তাহার দুঃখ দূর হইল।

আর একবার পদব্রজে বহু পথ পর্যটন করিয়া তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িল। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল ও তিনি চলচ্ছক্তি-রহিত হইয়া একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। জগৎ প্রথর রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহার সর্ব শরীর যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল ও সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইল। সহসা তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত আলোকরাশির তায় তাঁহার দৌর্বল্য ও অবসাদের মাঝখানে একটা প্রবল চিন্তা জাগিয়া উঠিল। “ইহা কি সত্য নহে যে আত্মার মধ্যে জীবের সমগ্র শক্তি নিহিত আছে? তবে আমি দেহেন্দ্রিয়ের শাস্তিতে এত কাতর হইতেছি কেন? এ দৌর্বল্য কোথা হইতে আসিল?”—এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সহসা তাঁহার শরীর ও মন বিপুল শক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি আবার চলিতে লাগিলেন ও ক্রমে ক্রমে বহু পথ অতিক্রম করিলেন। মনের এই অদম্য তেজ, জড়ের উপর চৈতন্যের এই প্রভাব বহুবার তাঁহার জীবনে লক্ষিত হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

“আমি কতবার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়াছি। কতদিন অনাহারে যাপন করিয়া পথ চলিতে অক্ষম হইয়াছি, গাছের তলায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছি—প্রাণ যায় যায় হইয়াছে—কথা বলিবার

## স্বামী বিবেকানন্দ

বা চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শেষে হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে ‘আমার আবার মৃত্যুভয় কি? আমার জন্মও নাই, মরণও নাই; ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণাও নাই। সোহং সোহং। প্রকৃতি আমায় নষ্ট করিতে পারে না, প্রকৃতি ত আমার দাসী। হে মহেশ্বর, তোমার শক্তি প্রকাশ কর, হতরাজ্য পুনর্জয় কর, উত্তীর্ণত জাগ্রত ইত্যাদি।’ অমনি আমার দেহে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে, বাহ্যে বল আসিয়াছে, হৃদয়ে সাহস দেখা দিয়াছে, মনে তেজ বাড়িয়াছে, আর তাই আজও আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি। এইরূপে বখনই আমার জীবনাকাশে চারিদিক হইতে মেঘ ঘিরিয়া আসিয়াছে, তখনই সেই মেঘের পশ্চাতে আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইয়াছি; অমনি সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক সকলই স্বপন, পর্বতপ্রমাণ বিপদ হউক না কেন, ভয় পাইও না—দেখিবে বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। আঘাত কর, দেখিবে ইহা অন্তর্হিত হইয়াছে; পদাঘাত কর, দেখিবে চূর্ণ হইয়াছে।’

আর একবার কচ্ছদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক মরুভূমির মধ্যে গিয়া পড়েন। সূর্য্যদেব মস্তকোপরি অনলবর্ষণ করিতেছেন, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, অথচ নিকটে মনুগ্রবাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও অবশেষে সম্মুখে নির্মলবারিশোভিত একটি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। গ্রামের ছোট ছোট কুটীরগুলি দেখা যাইতেছে, আশে-পাশে ফলভরে অবনত কত শ্রামল সুন্দর বৃক্ষলতা, তাঁহার মনে এতক্ষণ পরে আশার সঞ্চার হইল। যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন—আর দুই-চারি পা যাইলেই আকণ্ঠ বারি পান করিবেন ও সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ার



## প্রব্রজ্যাকালের অগ্ন্যাত্ত কাহিনী

বসিয়া মৃহমন্দ সমীরণ সেবন করিয়া প্রাণ জুড়াইবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই যেন গ্রামখানি সরিয়া বাইতে লাগিল। ঐ যে একটুখানি ব্যবধান তাহা কিছুতেই শেষ হইল না। আগেও যতদূর ছিল এখনও যেন ততদূর রহিয়াছে এরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন হঠাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। বুঝিলেন, মিথ্যা গ্রাম—মিথ্যা বৃক্ষাবলীশোভিত কুটার—মিথ্যা বারিপূর্ণ হ্রদ—সবই মরীচিকা! তিনি হতাশ হইয়া বালুকারণির উপর বসিয়া পড়িলেন ও আকুলনয়নে উর্দ্ধে অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল ‘ওঃ কি ভ্রম! জীবনও বুঝি এইরূপ! মায়ার ছলনা এইরূপ! হা সত্য, তুমি কোথায়! হা ঈশ্বর, তুমি কোথায়! একবার দেখাও তোমরা কোথায়।’ অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তানিবিষ্ট থাকিয়া তিনি পুনরায় উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। আবার পূর্ববৎ সেই বৃক্ষ-লতা-হ্রদ-শোভিত গ্রামখানি নয়ন-সম্মুখে ভাগিয়া উঠিল, কিন্তু আর তিনি ভুলিলেন না। সত্যভ্রমে মরীচিকার পশ্চাতে আর ধাবিত হইলেন না। পাশ্চাত্য দেশে একটি বক্তৃতা করিবার সময় এই ঘটনা স্মরণ করিয়া তিনি মায়াকে মরীচিকার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন।

আর একবার একজন শিষ্যের সাক্ষাতে অগ্নমনস্কভাবে বলিয়াছিলেন—“ওঃ, কি সব কষ্টের মধ্যে দিয়াই দিন গিয়াছে! একবার উপবৃত্তপরি তিন দিন থাইতে না পাইয়া রাস্তার উপর মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম সর্কাস বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। জলে ভিজিয়া শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইতেছিল। তখন উঠিয়া আস্তে আস্তে আবার পথ হাঁটি ও এক আশ্রমে পৌছিয়া কিছু মুখে দিই, তবে প্রাণ বাচে।”

এইরূপে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজীকে বহুবার বহু বিপদের

## স্বামী বিবেকানন্দ

সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; বহু কষ্ট, অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া গম্ভ্য-পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অনেকসময় একখানি গীতা ও পরমহংস-দেবের একখানি ফটো ব্যতীত আর কিছু সম্বল না লইয়া তিনি পথ চলিয়াছেন। মধ্যভারতে সম্ভবতঃ খাণ্ডোয়া ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে যাইবার সময়ে তাঁহাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন—যাহারা নিতান্ত অসভ্য ও অতিথি-সৎকার-বিমুখ, এক মুষ্টি ভিক্ষা চাহিলে দেয় নাই, আশ্রয় মাগিলে তাড়াইয়া দিয়াছে। অনেক দিন এমন ঘটনা ঘটে, কয়েক দিবস নিরন্তর উপবাসের পর কোনরূপে জীবনধারণোপযোগী দুটি সামান্য কিছু আহার করিয়া শরীরটা রাখিতে হইয়াছে। এই সময়েই তিনি এক মেথর-পরিবারের মধ্যে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন এবং এই অবহেলিত নীচজাতীয়দিগের হৃদয়ের মহত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনা ও এইরূপ অশ্রান্ত কয়েকটি ঘটনায় তিনি উপেক্ষিত জাতিসমূহের মধ্যে মহত্বের অঙ্কুর লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উন্নতিবিধানের জন্ত এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। তিনি ধরণীর ধূলিবাণির মধ্যে বহুমূল্য মণিমাণিক্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন—দরিদ্রের আশ্রয়-কন্ডার অন্তরালে পরদ্রুখে হুঃখী, সমবেদনায় স্নিগ্ধবারি-সিক্ত কোমল মানব-হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রাণ তাহাদের হৃৎকের বোঝা দূর করিবার জন্ত আকুল হইয়াছিল। তাই তিনি ভারতের কোটি কোটি পতিত সন্তানকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করিতে ছুটিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রমণের পরিসর যতই বাড়িতে লাগিল, যতই তিনি নূতন নূতন ক্ষেত্রে নূতন নূতন অবস্থার সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন, ততই মাতৃভূমির প্রকৃত অভাব তাঁহার চক্ষে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি



## প্রজ্ঞাকালের অত্যাচার কাহিনী

ইহার গরিমা উপলব্ধি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহার দুর্বলতাও দেখিতে পাইলেন। সে দুর্বলতা প্রধানতঃ দেশবাসীর দেশাত্মবোধের অভাব—জাতির জাতীয়ত্বহানি—স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ। তিনি বুঝিলেন, এই দারুণ অনিষ্ট-নিবারণের একমাত্র উপায় ঋষিদিগের নিদিষ্ট শিক্ষা-দীক্ষার পুনঃ প্রবর্তন। তিনি বলিয়াছিলেন—“ধর্ম এই দুর্দশার কারণ নহে, ধর্মের অভাবই ইহার কারণ। কর্মজীবনে পরিণত হইলেই ধর্মের শক্তি বৃদ্ধি পায়।”

কিন্তু দেশের দুঃখ-দুর্দশা সর্বদা স্মৃতিপথে উদ্ভিত থাকিলেও স্বাধীনতা অস্তরে চিরদিনই সত্যকাম সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বিবিধ দেশের ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, ত্যাগই প্রকৃতপক্ষে সর্ববিধ সামাজিক উন্নতির ভিত্তিভূমি। তাই দেখিতে পাওয়া যায় পাশ্চাত্যদেশের মঠাধ্যক্ষগণ এক সময়ে পাশ্চাত্যজগতের রাজনীতি-পরিচালনা ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষা সাধনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাই ভারতের ইতিহাসেও দেখিতে পাই চিরকাল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি ঋষি, শ্রীকৃষ্ণ জনকাদি যোগী এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, রামদাস, নানক প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের এত প্রভাব! দৃষ্টির প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একথা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না যে, ভারতের বর্তমান অবনতি-শ্রোত রোধ করিয়া তাহাকে উন্নতির পথে চালিত করিতে হইলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার অনাবিল প্রবাহে সমুদয় দেশ প্লাবিত করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি ত্যাগের আদর্শকে আরও উচ্চ করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং নিজে সন্ন্যাসীর শিরোমণি হইয়াও দেশের ও সমাজের কল্যাণচিন্তায় মুহূর্তমাত্র বিরত হইলেন না। অপরূপ সন্ন্যাসীরাও তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন এবং তিনিও প্রকৃত বৈরাগ্যবান

## স্বামী বিবেকানন্দ

সন্ন্যাসী দেখিলেই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের রক্ষক বিবেচনার চিরদিন তাঁহাদের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। হিমালয়ে ভ্রমণকালে একদিন তিনি এক শীতার্ভ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং দেখিবারাত্রই তাঁহাকে একজন সর্বত্যাগী মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সন্ন্যাসিপ্রবর শীতে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া স্বামীজী যাইতে যাইতে নিজের কম্বলখানি দ্বারা তাহার গাত্র আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন ও 'নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

অনেক সময়ে অনেক সন্ন্যাসী তাঁহার সমপ্রাণতার অভিভূত হইয়া তাঁহার নিকট তাঁহাদিগের পূর্ব ইতিবৃত্ত এমন কি দোষ বা কলঙ্কের কাহিনীও প্রকাশ করিয়া ফেলিত ও পূর্বকৃত পাপের ভগ্ন বিষম আত্মগ্লানি অনুভব করিত। হৃদীকেশে এরূপ একটি সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার প্রশান্ত মুক্তি ও পবিত্র আচার-ব্যবহার দেখিয়া তিনি বুঝিলেন এ ব্যক্তি প্রকৃতই জ্ঞানপথের পথিক। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পাইল যে, এই ব্যক্তিই একসময়ে গাজীপুরে পওহারী বাবার জিনিসপত্র চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময়ে পওহারী বাবা তাহা টের পাওয়াতে সে উহা ফেলিয়া দিয়া দোড়াইতে আরম্ভ করিলে পওহারী বাবা বহুদূর পর্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অবশেষে তাহাকে ধরিয়া ফেলেন ও জিনিসগুলি তাহার হাতে দিয়া ছাড়েন। স্বামীজী পূর্বেই এই গল্পটি শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সৌম্যমুষ্টি সাধুটিকে স্বমুখে সেই পূর্ব ঘটনা বিবৃত করিতে দেখিয়া মহাপুরুষ-সংসর্গে তাঁহার জীবনের কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা



## প্রব্রজ্যাকালের অন্যান্য কাহিনী

চিন্তা করিয়া পুলকে পূর্ণ হইলেন। সাধু বলিলেন, “তিনি (পণ্ডহারী বাবা) যখন আমার নারায়ণজ্ঞানে অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্বস্ব দান করিলেন, তখন আমি নিজের ভ্রম ও হীনতা বুঝিতে পারিলাম এবং তদবধি ঐহিক অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমার্থের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম।”

সাধুর বাক্যশ্রবণে স্বামীজী এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, এমন কি তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিবারও অভিলাষ তাঁহার মনে উদ্ভিত হইয়াছিল, কারণ প্রকৃতই এই ব্যক্তির অন্তরে তখন সাধুতা বিরাজ করিতেছিল। যে হৃদয় এক সময়ে পরজব্যবহারে লোলুপ ছিল তাহা এক্ষণে সাধুসংসর্গের নির্মল সলিলে প্রক্ষালিত। সেখানে আর কোন কলুষ নাই—কোন মালিন্য নাই। গভীর রাত্রি পর্যন্ত স্বামীজীর সহিত তাঁহার কথাবার্তা হইল। স্বামীজী বুঝিলেন, লোকটির বস্তুলাভ হইয়াছে। তার পর তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁহার কথা প্রায়ই স্মরণ করিতেন এবং আজীবন তাহা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। এমন কি পরে আমেরিকায় প্রচারকালে বোধ হয় এই ঘটনা মনে রাখিয়াই তিনি একবার বলিয়াছিলেন, “পাপীদিগের মধ্যেও সাধুতার বীজ নিহিত আছে।”

আর একবার এক তিব্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীকে বলিয়াছিল, “মহারাজ, কলিযুগ আ গিয়া।” স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?” তাহাতে সে উত্তর করিল, “দেখুন, পূর্বে আমাদের মধ্যে কেমন নিঃস্বার্থ ভাব ছিল, একাধিক পুরুষ একজন স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত! কিন্তু এক্ষণে প্রত্যেক পুরুষ একটি করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।” যদিও তাহার অদ্বুত বুদ্ধি ও তর্কপ্রণালী দেখিয়া স্বামীজী মনে মনে হাস্য করিলেন; তথাপি তাহার সরল বিশ্বাস ও অকপটতার তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইল না। সেইদিন

## স্বামী বিবেকানন্দ

হইতে তাঁহার মনে হইল, প্রত্যেক জিনিসেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু না কিছু বলিবার আছে। এই ঘটনা ও ভারতের অত্যাশ্চর্য বহু প্রদেশের বহুধা বিভিন্ন আচার-পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তির প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি একটা জিনিসকে বহু ভাবে বহু দিক হইতে দেখিতে ও বিচার করিতে শিখিয়াছিলেন।

এই তাঁহার প্রবাসভ্রমণের কাহিনী। তিনি প্রত্নতত্ত্ব উঠিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিতেন ও মধ্যাহ্নে কোন বৃক্ষতলে বা নদীতীরে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সন্ধ্যার সময় ভ্রমণে বহির্গত হইতেন।



## মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বামীজী কতাকুমারিকা হইতে পণ্ডিচেরী নামক ফরাসী উপনিবেশে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিচেরীতে তাঁহার সহিত একজন ভয়ানক গোঁড়া ব্রাহ্মণের তর্ক হয়। সে ব্যক্তি তাঁহার উদার ও উন্নত ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার উপর বিষম চটিয়া গেল ও তিনি সমুদ্রলঙ্ঘনপূর্বক বিদেশীয়দিগের নিকট হিন্দুধর্ম-প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছেন শুনিয়া বলিল, “আমাদের এ সনাতন ধর্মের সংস্কারের কোন আবশ্যিকতা নাই, স্লেচ্ছরা উহার কি বুঝিবে? উহাদের সংস্পর্শে শুধু জাতিনাশ হইবে মাত্র।” এইরূপ বলিয়া তুফল তর্ক ছুড়িয়া দিল। স্বামীজীও তাহাকে যত বুঝাইবার চেষ্টা করেন সেও তত তাহার প্রতিবাদ করে এবং অবশেষে তিনি যে কথা বলিতে লাগিলেন সেই কথাতেই সে ঘাড় বাঁকাইয়া কেবল বলিতে লাগিল—‘কদাপি ন’—‘কদাপি ন’।

পণ্ডিচেরীতে তাঁহার সহিত পুনরায় মন্থন বাবুর সাক্ষাৎ হয়। মন্থন বাবু তাঁহাকে মাদ্রাজে আপন বাসায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং স্বামীজী তাহাতে সম্মত হইলে উভয়ে একত্রে মাদ্রাজ পৌঁছিলেন। প্রথম দিনেই মাদ্রাজে স্বামীজীকে লইয়া একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বিজ্ঞাতের শ্রায় সমস্ত শহরে রটিয়া গেল ‘এক অদ্ভুত ইংরেজী-জানা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।’

বাস্তবিক মাদ্রাজেই স্বামীজী সর্বপ্রথম জনসমাজের নিকট বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং মাদ্রাজবাসী যুবকেরাই সর্বপ্রথম তাঁহার উন্নতভাব সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার অনুবর্তী হইয়াছিল ও অর্থ

## স্বামী বিবেকানন্দ

সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে গমনের পথ সূগম করিয়াছিল।  
এ হিসাবে বঙ্গদেশ চিরদিন মালদ্বীপের নিকট ঋণী থাকিবে।

এখানেও পূর্ববৎ দলে দলে লোকসমাগম হইতে লাগিল এবং সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, মনস্তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব আলোচিত হইতে লাগিল। মন্থ বাবুর বাটীতে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “স্বামীজী, হিন্দুদের বেদান্তধর্ম থাকাতেও তাহারা মূর্তিপূজক কেন?” তিনি প্রশ্নকর্তার দিকে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, “কারণ, আমাদের যে হিমালয় রহিয়াছে।” লোকটি প্রথমে উত্তর শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তারপর যখন তিনি বুঝাইলেন, ভারতের চতুর্দিক যে মহান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বেষ্টিত তাহাতে কোন লোক তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া অর্চনা না করিয়া থাকিতে পারে না, তখন উত্তরটা তাহার বোধগম্য হইল। সেদিন তিনি বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব-মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ ও সেই সম্বন্ধবশতঃ প্রতি দেশে প্রতি জাতির মানসিক গঠন ও অভিব্যক্তি কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যে ঘেরূপ লোক তাহাকে ঠিক সেই ভাবে উপদেশও দিতে লাগিলেন; যে ভক্তিপ্রবণ তাহার নিকট ভাব ভক্তি অবতার-তত্ত্বের উপদেশ দিতেন ও নিজের অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেন; আবার যে বিচারপরায়ণ তাহার সহিত বিচার ও কূটতত্ত্বস্বামীমাংসার কুশাগ্রবুদ্ধির পরিচয় দিতেন।

মালদ্বীপবাসীরা তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া বিশ্বয়ে অভিভূত হইল। বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি যে সাধনবলে বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত এক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে—তাহা তাহারা এই প্রথম অনুভব করিল, এবং প্রতিদিন স্বামীজীর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইতে লাগিল।



## মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

একদিন কালিদাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, মেঘদূত ও বায়রন—অন্যদিন হেলেন ও ট্রয়বাসী, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ—এইভাবে দিন দিন কত প্রসঙ্গই চলিতে লাগিল।

তাঁহার গুণাবলীও তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কলনিনাদী কণ্ঠধ্বনি—সেই কণ্ঠের পীযুষপূর্ণ সঙ্গীত, বিপুল আত্মশক্তি, স্মৃতিশ্রদ্ধা বৃদ্ধি, অজস্র তর্কযুক্তি, অদ্ব্যুত বাগ্মিতা ও শুভ্র-স্বচ্ছ হস্ত-পরিহাস—কোনটির কথা বলিব? তাঁহাকে দেখিবার জন্ত মন্থন বাবুর গৃহে দিন দিন জনতা বৃদ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার তেজও যেমন ছিল, বিনয়ও সেইরূপ ছিল। পণ্ডিতেরা ঔদ্ধত্যবশতঃ তাঁহাকে অপমানিত করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ করযোড়ে ‘আমি অতি মুখ’ বলিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন, আবার কখনও প্রবল ঝটিকার মত তাঁহাদের সকল যুক্তিতর্ক ছিন্নভিন্ন করিয়া কোথায় উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার অভিমান ছিল না, বা তিনি বিদ্বেষভাব-প্রণোদিত হইয়া কখনও কাহাকে কোন কথা বলিতেন না; তবে প্রয়োজন হইলে স্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন বা তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। মাদ্রাজে একদিন এক পণ্ডিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দনা ত্যাগ করার কোন প্রত্যবায় আছে কি না?” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ত্যাগের হেতু কি?” পণ্ডিত বলিলেন, “সময়াভাব।” তৎক্ষণে তিনি বলিয়াছিলেন, “কি! সময়াভাব? প্রাচীনকালের সেই মহামহা-আর্য্যঋষিগণ—ঐহাদের সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিতে গেলে তোমার জীবন ফুরাইয়া যায়—তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনার সময় পাইতেন, আর তুমি সময় পাও না?” সেইদিনই একজন সাহেবী গোছের হিন্দু বৈদিক ঋষিদের উপদেশ-গুলিকে অর্থহীন বাজে জিনিস বলিয়া ঈষৎ অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া-

## স্বামী বিবেকানন্দ

ছিলেন। তদর্শনে স্বামীজীর চক্ষু দিয়া অগ্নিশূলিঙ্গ নিঃসৃত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, “দেখ, ‘অন্নবিষ্ঠা ভরস্করী’ বলিয়া একটা কথা আছে। তোমার হইয়াছে তাই। নতুবা, তুমি কি বলিয়া সেই প্রাচীন মনস্বীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছ ও তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তোমার ধমনীতে প্রবাহিত সেইসকল পূর্বপুরুষের রক্তের অসম্মান করিতেছ? তুমি কি তাঁহাদের উপদেশের কিছু জ্ঞান? তুমি কি বেদ কখনও দেখিয়াছ বা তাহার একটি ছত্রও পাঠ করিয়াছ? তবে বুঝা কেন বাক্যব্যয় কর? ঋষিরা বাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও জগতের সম্মুখে হিমালয়ের স্থায় অটলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। জগৎকে ডাকিয়া বলিতেছে—‘এস, যদি পার আমাদিগকে উন্টাইয়া দাও।’ যদি কারও সাহস থাকে আশ্রুক, দেখুক, পরীক্ষা করুক; সে সত্য উন্টাইবার নয়। তোমার মত কতগুলো গোঁড়া ও একদেশ-দর্শী লোকই এ জগৎটাকে এত ঘৃণ্য করে তুলেছে।”

দিবারাত্র লোকজনের সহিত কথাবার্তা কহিয়া ক্লাস্তিবোধ হইলে স্বামীজী ক্লাস্তিদূরীকরণার্থ মধ্য মধ্য অপরাহ্নকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। সেখানে জনমধ্যে আকটিনিমজ্জিত অর্দ্ধাশনে মৃত-প্রায় ধীরসন্তানগণকে তাহাদিগের গর্ভধারিণীর সহিত জনমধ্য হইতে মৎস্ত শিকার করিতে দেখিয়া হৃৎথে তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত এবং তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিতেন, “হা ভগবান! এই সকল হতভাগ্যগণকে কেন সৃজন করিয়াছ? উহাদের কষ্ট যে চোখে দেখা যায় না! কতদিন প্রভু, কতদিন ধরিয়া উহারা এরূপ কষ্ট ভোগ করিবে!” তাঁহার সঙ্গের যুবকবৃন্দও তাঁহার হৃদয়বেদনা অনুভব করিয়া মনে মনে ব্যথিত হইত। স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে ভারতের



## মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

পতিতজাতিদিগের উন্নতিবিধানের জন্ত সকলকেই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, “যদি অবনত ভারতকে আবার উন্নত দেখিতে চাও তবে এইসকল হতভাগ্যদিগকে বুকে তুলিয়া লও। বেদবেদান্তাদি রত্নরাশি তাহাদিগের মধ্যে অকাতরে বিতরণ কর ও সমাজের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দাও।”

তিনি ধর্মসম্বন্ধে গুপ্ততত্ত্ব বা রহস্যবিজ্ঞা ইত্যাদি সহ্য করিতে পারিতেন না। ধর্মের পথ ত সরল উদ্দাম উন্মুক্ত! ইহার মধ্যে আবার লুকোচুরি কি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। বলিতেন, “গুপ্তবিজ্ঞা অলৌকিক রহস্য—এসকল দিকে ছুটিও না। শক্তিলভ হইবে, সিদ্ধিলাভ হইবে, এসব মনে ভাবিও না। এমন কি নিজের মুক্তি পর্য্যন্ত চাহিও না। শুধু পরের মুক্তি খোঁজ, ধর্মের উদ্ধার কিসে হইবে অনুসন্ধান কর, ভারতীয় ভাব কি করিয়া সমুদয় জগতে ছড়াইয়া পড়িতে পারে ভাবিয়া উপায় উদ্ভাবন কর।”

একদিন তাঁহার সম্মানার্থ একটি বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে মাদ্রাজের প্রায় সমস্ত অগ্রণী ও বিদ্বান ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেদিন স্বামীজীর প্রতিভাদর্শনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন স্বামীজীকে অপ্রতিভ করিবার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র দল গড়িলেন ও তাঁহার প্রতি কথা কাটিবার উপক্রম করিলেন। তিনি নিজেই অদ্বৈতবাদী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, “আপনি বলিতেছেন, আপনি ও ঈশ্বর এক। তবে ত আপনার ধর্মার্থ, পাপপুণ্য এসব দায়িত্ব কাটিয়া গেল। এখন আপনি যদি কুকার্য করেন তবে আপনাকে ঠেকায় কে?” স্বামীজী বলিলেন, “যদি আমি ঠিক ঠিক বিশ্বাস করিতাম ঈশ্বর ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই—তাহা হইলে আমা দ্বারা কোন কুকার্য হওয়া সম্ভবপরই নহে।”

## স্বামী বিবেকানন্দ

রামনাথের রাজসভায়ও একজন তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল যে, সাধারণ জীবের পক্ষে বাস্তবের অগোচর ব্রহ্মকে জানা কি করিয়া সম্ভব? তাহাতে তিনি জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি সেই বাক্য-মনের অগোচরকে জানিয়াছি।”

ট্রান্সিকেন লিটারেরি সোসাইটির (সাহিত্য সভার) কয়েকটি অধিবেশনে স্বামীজী উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহার সংস্কারপ্ররাসী সভ্যগণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন তাহারা ঠিক উল্টা দিক হইতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে—অর্থাৎ মারো কাটো লোটো এই ভাব। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, “সংস্কার খুব ভাল জিনিস বটে এবং তিনি নিজেও সংস্কারের পক্ষপাতী; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের আদর্শটাকে একেবারে উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থানে পরের আদর্শ বসাইবার চেষ্টা করিলে কিছু হইবে না। তাহাতে হিতে বিপরীত হইবে। আসল সংস্কারটা হইবে ভিতর হইতে—বাহির হইতে নয়। সব বজ্রাঘ্ন রাখিয়া—সব ছাঁটিয়া ফেলিয়া নয়।”

একদিন তাঁহার নিকট সিঙ্গারাভেলু মুদালীয়ার নামে খ্রীষ্টান কলেজের একজন বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক দেখা করিতে আসিলেন। এ ব্যক্তি ঈশ্বর মানিতেন না। তিনি তর্ক করিবার মানসে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে স্বামীজীর শিষ্য হইয়া গেলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন ও ‘কিডি’ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি পরে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, “Caeser said, ‘I came, I saw, I conquered. But Kidi came, he saw, but—was conquered.’” অর্থাৎ কিডি জয় করিতে আসিয়া নিজে বিজিত হইয়া গেল। ইহার পরে ইনি স্বামীজীর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন ও তাঁহারই পরামর্শে ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিলে তাহার অবৈতনিক কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। শেষ



## মাস্ত্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

জীবনে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জনে সাধু-সন্ন্যাসীর মত থাকিতেন ও সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ভি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহোদয় বলেন যে, তিনি কতিপয় সহাধ্যায়ীকে লইয়া তামাসা দেখাইবার জন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—গুটিকতক প্রশ্ন দ্বারা স্বামীজীকে পরীক্ষা করিবেন। প্রশ্নগুলির সপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা যাহা বলিবার ছিল তাঁহারা পূর্ব হইতেই সেগুলি বিশেষভাবে আলোচনা ও আশ্রিত করিয়া গিয়াছিলেন। মিঃ আয়ার এই সময়ে খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্র ছিলেন ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁহার বেশ একটু টান হইল। এমন কি, এক সময়ে তিনি ঐ ধর্ম অবলম্বন করিতেও উত্তম হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন স্বামীজী অর্দ্ধনিম্নলিত নেত্রে একটি হুক লইয়া ধূমপান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গিগণ প্রথমতঃ তাঁহার তেজোদীপ্ত কাস্তির্দর্শনে স্তম্ভ হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত সাহস প্রদর্শন-পূর্বক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, জৈবের স্বরূপ কি?” স্বামীজী শুনিয়াও যেন শুনিতে পান নাই এই ভাবে আপনমনে পূর্ববৎ ধূমপান করিতে লাগিলেন। একটু পরে তিনি হুকটি রাখিয়া চক্ষু চাহিলেন ও প্রশ্ন-কর্তার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা বাপু, শক্তি (energy) জ্বিনিসটা কি বলিতে পার?” বুঝকটি তাঁহার বিজ্ঞানের বুলি হইতে ছু-চারটা বাঁধা বুলি ঝাড়িলেন, কিন্তু স্বামীজী সেগুলি সব খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তারপর সকলে উত্তর দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্বামীজী আবার তাহাদিগের যুক্তির দোষ প্রদর্শন করিলেন। শেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদে ক্ষান্ত হইল। তখন স্বামীজী উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, “এ কি হইল? তোমরা

## স্বামী বিবেকানন্দ

এই শক্তি কথাটা (energy) বুঝাইতে পারিলে না? প্রতিদিন এই কথাটি ব্যবহার করিয়া থাক, অথচ ইহা কি বলিতে পারিতেছ না—আর আমায় বলিতেছ কি না। ‘ঈশ্বর কি’ তাহা তোমাদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে।” তাহার পর তিনি ঈশ্বর ও শক্তি এই দুইটি কথা একন্বয়ে গাঁথিয়া একরূপ একটি গভীর চিন্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন যে, যুবকবৃন্দ তাঁহার জ্ঞানের তুলনায় আপনাদিগকে নিতান্ত শিশু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহার আরও দুই-চারিটি প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু স্বামীজীর উত্তর শুনিয়া একেবারে দমিয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে যুবকেরা চলিয়া গেল, কিন্তু মিঃ আয়ার স্বামীজীর কথাবার্তা শুনিয়া এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া রহিলেন ও স্বামীজী সমুদ্রতীরে সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলে তাঁহার অনুগমন করিলেন। পূর্ব্বেও নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলিতে লাগিল এবং অবশেষে হিন্দুদের দৈহিক অধোগতি ও শারীরিক শক্তির অপচয় সম্বন্ধে কথা উঠিল। স্বামীজী আয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোকরা, তুমি কুস্তি লড়িতে পার?” আয়ার ঘাড় নাড়িয়া ‘হাঁ’ বলিলে তিনি কোতুকচ্ছলে বলিলেন, “এস দেখি, একটু লড়ি।” আয়ার তাঁহার মাংসপেশীর দৃঢ়তা ও ব্যায়াম-কৌশল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সেই দিন হইতে তাঁহাকে ‘পালওয়ান স্বামী’ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীজীর হৃদয় ধনী দরিদ্র সকলের জন্ত কিরূপ উন্মুক্ত থাকিত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যায়—

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে একজন পাচক ছিল, সে স্বামীজীর বিজ্ঞা-বুদ্ধি বা দার্শনিক জ্ঞানের বিশেষ ধার ধারিতে না পারিলেও তাঁহার সাতিশয় অনুরাগী ছিল। একরূপ অনুরাগের কারণও ছিল। একদিন স্বামীজী দেখিলেন, পাচক-ঠাকুরটি এক দৃষ্টে তাঁহার মহীশূরাজপ্রদত্ত



## মান্দ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

হ'কাটির দিকে চাহিয়া আছে। তাহার নয়নের সতৃষ্ণভাব দেখিয়া স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কি হ'কাটি চাও?” লোকটি মনে করিল বুঝি তাহার শ্রবণশক্তির ভ্রম হইয়াছে। সেইজন্য চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিল যে, তাহার শুনিবার ভুল হয় নাই—সত্যই স্বামীজী হ'কাটি দিতে চাহিতেছেন; তথাপি স্বামীজীর কথায় তাহার বিশ্বাস হইল না! এ কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা। একটা জলজীবন্ত মহারাজের দেওয়া হ'কা—সেটি স্বামীজী তাহাকে দিবেন? না না, স্বামীজী বোধ হয় রহস্য করিতেছেন! কিন্তু যখন সে সত্যই দেখিল স্বামীজী নিজে হ'কাটি তাহার হাতের মধ্যে দিতেছেন তখন তাহার বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সীমা রহিল না। বাহারা তাঁহার ঘটনাটি শুনিতে পাইল তাহারা বুঝিল এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেও স্বামীজী কম ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। কারণ, হ'কাটি বাস্তবিক তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল।

পরের প্রীত্যর্থ এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবিসর্জন স্বামীজীর জীবনে বিরল ছিল না। তাঁহার ব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য দেখিয়া যদি কেহ প্রশংসা করিত তবে সে জিনিসটি তাহারই হইয়া যাইত। আমেরিকায় একবার একজন যুবক তাঁহার ভারত-ভ্রমণের নিত্য-সঙ্গী যষ্টিখণ্ডটি দেখিয়া উহা লইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। এই যষ্টিখণ্ডটির সহিত বহু তীর্থের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি তৎক্ষণাৎ উহা যুবকটিকে দান করিলেন—তাঁহার কথাই ছিল—“তোমার প্রাণ যাহা চায় সে ত তোমারই।”

মান্দ্রাজে স্বামীজীর বহু ভক্ত জুটিল। আলোয়ারে যাহা হইয়াছিল এখানে তাহাই বৃহদাকারে হইতে লাগিল। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য নানা স্থান হইতে নানাবিধ লোক প্রত্যহ মন্থ বাবুর বাটীতে

## স্বামী বিবেকানন্দ

আসিতে লাগিল—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, পণ্ডিত, মুর্থ, ধনী, মামী, জ্ঞানী, পদস্থ কাহারও অভাব ছিল না।

তঁাহার একজন উচ্চশিক্ষিত মাদ্রাজী শিষ্য এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “স্বামীজীর জ্ঞানের প্রসার দেখিয়া আমি স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইলাম। ঋগ্বেদ হইতে রঘুবংশ, প্রাচীন বেদান্তদর্শনের উচ্চতম দার্শনিক চিন্তা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কান্ত ও হেগেল পর্য্যন্ত—এক কথায় প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় সাহিত্য—এমন কি শিল্পকলা, সঙ্গীতবিজ্ঞা, নীতিবিজ্ঞা—প্রাচীন যোগবিজ্ঞা হইতে আধুনিক বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সমুদয়ই যেন তঁাহার নখদর্পণে ছিল। তঁাহার এই অগাধ বিজ্ঞা দেখিয়াই আমি একেবারে স্তম্ভিত হই এবং তঁাহার দাস হইয়া যাই।”

তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত মাদ্রাজ তঁাহার প্রশংসাস্রবণিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিঃ কে. ব্যাসরাও বি. এ. নামে একজন মাদ্রাজী লিখিয়াছেন, “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট—মুণ্ডিতমস্তক, মনোহর-রূপসম্পন্ন, গৈরিকবসনধারী, ইংরেজী ও সংস্কৃত অনর্গল বলিতে অভ্যস্ত, প্রত্যেক প্রশ্নের চোকা চোকা জবাব দিবার অদ্বুতশক্তিসম্পন্ন, সঙ্গীত-বিজ্ঞায় একরূপ অভ্যস্ত যে, গলা হইতে অতি সহজভাবে পুরা সুর বাহির হইয়া যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরাঙ্গার সঙ্গে তঁাহাকে মিলাইয়া দিতেছে, কিন্তু এদিকে একজন নিঃস্বল পরিব্রাজক মাত্র। বলিষ্ঠ, সাহসী, উজ্জল, পরিহাস-রসিক পুরুষ তথাকথিত মহাত্মাগণের পদানুসরণে প্রতিষ্ঠিত অলৌকিক ক্রিয়াক্ষমতা সপ্তদায়সমূহের উপর বিজ্ঞাতীয়-ঘৃণাসম্পন্ন ... কয়েকজন নির্দিষ্ট-সংখ্যক ব্যক্তির হৃদয়ে অবিনাশী বিশ্বাসের আগুন জ্বালাইয়াছিলেন।”

ইতঃপূর্বে স্বামীজী তঁাহার পাশ্চাত্যদেশে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তঁাহার মাদ্রাজী শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—“এখন হিন্দুধর্মকে



## মাস্ত্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

সমুদয় জগদ্বাসীর নিকট প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঋষি-দিগের এই ধর্মকে আর সন্ধীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে বাধিয়া রাখিলে চলিবে না, জগৎময় ইহা ছড়াইতে হইবে। সনাতন ধর্মের প্রাচীন দুর্গ জীর্ণ হইয়াছে, শুধু বৈদেশিক আক্রমণ হঠতে ইহাকে কোনরকমে রক্ষা করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিলে হইবে না। ইহার পুনঃসংস্কার করিয়া জগতের সমক্ষে বাহির করিতে হইবে ও পূর্ণ উত্তমের সহিত ইহার মহিমা চতুর্দিকে প্রচার করিতে হইবে।” তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভক্তগণ শুধু যে আনন্দিত হইল তাহা নহে, তাহারা অতিশয় উৎসাহের সহিত চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিল ও অনতিবিলম্বে পাঁচশত টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল। কিন্তু সত্যই যখন অর্থ সংগৃহীত হইল তখন স্বামীজী বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “আমি কি নিজেদের খেলাল-তৃপ্তির জন্ত এসব করিতেছি, না ইহার মধ্যে বিধাতার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে?” তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে জগজ্জননীর চরণে প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “মাগো! তোর কি ইচ্ছা বল। তুই ত প্রকৃত কর্ত্তা। আমি তোর হাতে কলের পুতুলমাত্র। তোর মনে কি আছে খুলে বল।” সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া স্বদূর প্রवासগমনের পূর্বে তিনি ভাবিতে লাগিলেন—সত্যই কি ইহা জগদম্বার অভিপ্রায়, না তাঁহার নিজের অভিলাষ? যদি জগদম্বার অভিপ্রায় হয় তবে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা কেন? অর্থ ত আপনিই আসিবে। এই কথা মনে উদ্ভিত হইবামাত্র তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৎসগণ! আমি অন্ধকারে বাঁপ দিবার পূর্বে মার উদ্দেশ্য জানিতে চাহি। যদি আমার গমন তাঁহার অভিপ্রেত হয় তবে তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিব। তাঁর ইচ্ছা হইলে

## স্বামী বিবেকানন্দ

অর্থ আপনি আসিবে, চেষ্টা করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে হইবে না। অতএব তোমরা এই সব অর্থ লইয়া দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ কর।” শিষ্যগণ বিষয়ে অভিভূত হইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। স্বামীজীরও স্বল্প হইতে যেন একটা বিষম বোঝা নামিয়া গেল।

তিনি পুনরায় লোকশিক্ষা দিতে লাগিলেন ও নিরুজ্জনে ধ্যানস্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ জগজ্জননীর চরণে হৃদয়ের কাতর প্রার্থনা জানানাইতে লাগিলেন। কখনও কখনও তিনি হৃদয়ের ভাব অন্তরে নিরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেন। তখন ভাবাবেশে তাঁহার সর্বশরীর ঘন ঘন কম্পিত হইত ও এক অপার্থিব আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সন্ন্যাসী ও তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিক তখন মায়ের আহ্বান শুনিবার জ্ঞান যেন ক্ষুদ্র শিশুটির স্থায় অবস্থান করিতেন।

এইসময় হায়দ্রাবাদের অধিবাসীরা তাঁহাদিগের মাদ্রাজী বন্ধুদিগের নিকট স্বামীজীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হায়দ্রাবাদে লইয়া যাইবার জ্ঞাত্ত্ব ওৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই আকস্মিক আহ্বানে স্বামীজী জগজ্জননীর গূঢ় উদ্দেশ্য দেখিতে পাইলেন ও হায়দ্রাবাদগমনে সম্মত হইলেন। বস্তুতঃ তাঁহার যশোরাশি দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। তিনি সাধারণের অপরিচিত সামান্য ভিক্ষুক সন্ন্যাসী হইতে ক্রমশঃ সর্বজনাদৃত স্বামী বিবেকানন্দরূপে সর্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। মন্থন বাবু হায়দ্রাবাদে রাজ-ইঞ্জিনিয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিলেন যে, ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৩) স্বামীজী হায়দ্রাবাদে পৌছিয়া তাঁহার অতিথি হইবেন। তৎপূর্বদিন হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের যাবতীয় হিন্দু মিলিত হইয়া স্বামীজীর অভ্যর্থনার জ্ঞাত্ত্ব একটি সাধারণ জনসভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিলেন। স্মরণ্য



## মাস্ত্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না যে, স্বামীজী হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে পদার্পণ করিবামাত্র দেখিলেন প্রায় পাঁচশত লোক তাঁহাকে নামাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে হায়দ্রাবাদের মহা সম্ভ্রান্ত আমীর, ওমরাহ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, রাজপারিষদ, উকীল, পণ্ডিত, ধনী বণিকাদি বিস্তর লোক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে, যথা—রাজা শ্রীনিবাস রাও বাহাদুর, মহারাজা রম্ভারাও বাহাদুর, পণ্ডিত রতনলাল, কাপ্তেন রথুনাথ, সামন্তলউল্মা সৈয়দ আলি বেলগ্রামী, নবাব ইসাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব ছুলা খাঁ বাহাদুর, নবাব ইমাদ নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দর নেওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর, মিঃ এইচ. দোরাবজী, মিঃ এফ. এম. মণ্ডন, রায় হকুমচাঁদ এম্. এ., এল্. এল্. ডি., চতুর্ভূজ ও মতিলাল শেঠ ব্যাঙ্কার্স, বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও তৎপুত্র কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়। কালীচরণ বাবু কলিকাতায় থাকিতে স্বামীজীকে জানিতেন, এক্ষণে তিনি এইসকল ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও পুষ্পমাল্য স্বামীজীর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল।

একজন স্বচক্ষে সেদিনকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন—  
“স্বামীজী তখন একজন বেশ বলিষ্ঠ যুবক—পরমহংসের বেশে কমণ্ডলু হস্তে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে নামিলেন। তাঁহাকে মধুসূদন বাবুর বাঙ্গলোয় লইয়া যাওয়া হইল এবং অনেক ভদ্রলোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তথায় গেলেন। বাহারা ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই, তাঁহার বাঙ্গলোতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। একজন স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত এত লোকসমাগম হায়দ্রাবাদে কখনও দেখি নাই। তাঁহাকে বহুসম্মানসূচক রাজোচিত অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।”

## স্বামী বিবেকানন্দ

১১ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সেকেন্দ্রাবাদের এক শত হিন্দু অধিবাসী দুগ্ধ, ফলমূল ও মিষ্টান্ন উপহার লইয়া স্বামীজীর সকাশে উপস্থিত হইলেন ও মহাব্ব কলেজে একটি বক্তৃতা দিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী সম্মত হইয়া ১৩ই তারিখে বক্তৃতার দিন নির্দ্ধারিত করিলেন। তারপর কালীচরণ বাবু তাঁহাকে গোলকুণ্ডা দুর্গ দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া দেখেন হায়দ্রাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ওমরাহ হায়দ্রাবাদাধিপতির শ্রালক নবাব বাহাদুর সার খুরশেদ জা. আমীরি-ই-কাবির কে. সি. এস. আই. মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া স্বামীজীর জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। স্বামীজী আসিবামাত্র তিনি নিবেদন করিলেন—নবাব সাহেব পরদিন প্রাতঃকালে রাজপ্রাসাদে স্বামীজীর দর্শন প্রার্থনা করিয়াছেন। তদনুসারে পর দিবস স্বামীজী কালীচরণ বাবুকে সঙ্গে লইয়া নবাব সাহেবের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। নবাবের এডিকং বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। নবাব সাহেবও স্বামীজীকে পরম সমাদরে স্বীয় আসনের পার্শ্বে বসাইলেন ও দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। তিনি সকল ধর্মের মধ্যে সার বস্তু গ্রহণ করিতেন এবং মুসলমান হইলেও হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমুদয় হিন্দু তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিয়াছিলেন।

নবাব সাহেব স্বামীজীর সহিত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিলেন। তিনি নিজে নিঃশূণতত্ত্বমাত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া হিন্দুধর্মে যে সগুণ বা পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের ধারণাও দেখিতে পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। স্বামীজী তদন্তরে ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশপ্রণালীর আলোচনা করিয়া দেখাইলেন, সগুণ ঈশ্বরের ধারণা শুধু যে মনুষ্যবুদ্ধির পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা নহে, কিন্তু মানব



## মাস্ত্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

ঈশ্বরসম্বন্ধে ইহা হইতে উচ্চতর ধারণায় অসমর্থ। দেহাদিভাব দূর না হইলে নিঃশূণ ধারণা মানুষের ঠিক ঠিক হইতেই পারে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যিনি নিঃশূণ তিনিই সমুপ। এইরূপে তিনি দেখাইলেন যে, মানুষজাতির ধর্মবুদ্ধি মনুষ্যপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যানুসন্ধিৎসা হইতে উদ্ভূত। সব ধর্মই এক হিসাবে সত্য, কারণ বিভিন্ন ধর্মপ্রণালী বিভিন্ন আদর্শলাভেরই উপায় মাত্র, আর প্রত্যেক আদর্শই সম্পূর্ণভাবে লাভ হইলে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ হয়। তিনি আরও বলিলেন, মানুষই সৃষ্টজীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ মানুষের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি দ্বারাই বিশ্বের সমস্ত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মানুষ স্বয়ং সর্ববিধ ক্ষুদ্রত্বের গুণী ছাড়াইয়া আপনাকে দেবত্বে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, চক্ষুধ্বংস উজ্জ্বলাভা ধারণ করিল এবং তাঁহার সর্ব অবয়বে একটা বিশেষ শক্তির আবির্ভাব লক্ষিত হইল। তিনি যেন অমরলোকবাসী দেবতার স্থায় মনুষ্য-অনুভূতির প্রতি বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞাতসারে সনাতনধর্মপ্রচারের জ্ঞাত পাশ্চাত্যদেশে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অসামান্য বাগ্মিতা-দর্শনে নবাব সাহেব মুগ্ধ হইয়া হঠাৎ বলিলেন, “স্বামীজী, আমি আপনার কার্যের সহায়তার জন্ত এক সহস্র রূদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি।” কিন্তু স্বামীজী ধন্যবাদের সহিত ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, “নবাব সাহেব, সে সময় এখনও আসে নাই। যখন উপর হইতে আদেশ আসিবে তখন আমি আপনাকে জানাইব।”

নবাব সাহেবের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বামীজী মক্কা-মসজিদ, মারমিনার, ফলকনামা, বসীরবাগ, নিজামের প্রাসাদাবলী ও অত্যন্ত দ্রষ্টব্যস্থান দেখিতে গমন করিলেন। ১৩ই তারিখ প্রাতঃকালে তিনি

## স্বামী বিবেকানন্দ

হায়দ্রাবাদের প্রধান অমাত্য সার আশমান জা, কে. সি. এস. আই., পেশ্কার মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ও মহারাজ শিউরাজ বাহাদুর—এই তিন জনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহার আমেরিকাগমনকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

অপরাত্নে মহাবুব কলেজে তিনি ‘আমার পাশ্চাত্যদেশে গমনোদ্দেশ্য’ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। পণ্ডিত রতনপাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক খেতাপ ভদ্রলোক এই বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বশুদ্ধ একসহস্র শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। স্বামীজীকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলেন। তিনি এ দিন তাঁহার সর্ব্বোচ্চ ভাবভূমিতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষায় অধিকার, বিজ্ঞাবত্তা, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ও বাগ্মিত্য সকলেই একবাক্যে ধন্ত ধন্ত করিয়াছিল। তিনি হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্বের উল্লেখ করিলেন। হিন্দুজগতের গৌরবের দিনে তাহাদের শিক্ষা ও সাধনা কতটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহা দেখাইলেন, এবং বৈদিক যুগ ও তৎপরবর্ত্তী যুগের উন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—এই উদ্দেশ্য মাতৃভূমির লুপ্তগৌরব-উদ্ধার ব্যতীত আর কিছুই নহে। সভায় তিনি সুস্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিলেন যে, এই সংকল্পসিদ্ধির জন্ত তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারকের বেশে দূরতম পাশ্চাত্যদেশে যাইতে হইবে এবং বেদবেদান্তের অতুলনীয় মহিমা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বাক্যে চমৎকৃত হইলেন।

পরদিবস মতিলাল শেঠ প্রমুখ বেগমবাজারের বিখ্যাত ধনী মহাজনেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পাশ্চাত্যদেশে গমনাগমনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে অঙ্গীকার করিলেন। থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি



## মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে

ও সংস্কৃত ধর্মমণ্ডলসভার কয়েকজন সভ্যও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বামীজী পুণা হইতে একখানি তার পাইলেন, উহাতে পুণার হিন্দু সভাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে পুণায় বাইবার জন্ত বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে স্বামীজী জানাইলেন, “এখন আমি বাইতে অক্ষম, তবে স্নযোগ পাইলেই আনন্দের সহিত আপনাদের ওখানে বাইব।” পরদিবস তিনি হিন্দুমন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ, বাবা সফরউদ্দীনের বিখ্যাত সমাধিস্থান ও স্ত্রার সালারজঙ্গের প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলেন।

হায়দ্রাবাদে স্বামীজীর সহিত এক অদ্ভুত সিদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি শূণ্য হইতে ইচ্ছামত নানাবিধ ফল, ফুল বাহির করিয়া দর্শকবৃন্দের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিতেন। স্বামীজীকে তিনি এইসব সিদ্ধাই দেখাইয়াছিলেন। তিনি যখন স্বামীজীর নিকট গমন করেন তখন তাঁহার প্রবল জ্বর। তিনি স্বামীজীকে তাঁহার মাথায় হাত দিতে বলেন। স্বামীজী ঐরূপ করাতে তাঁহার জ্বরত্যাগ হইল। তখন তিনি স্বামীজীকে পূর্বোক্ত আশ্চর্য ক্ষমতাসকল দেখাইলেন। মানুষের মনের শক্তি কতদূর, সেই সম্বন্ধে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বক্তৃতার সময়ে স্বামীজী এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিলেন। তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্ত রেলওয়ে স্টেশনে এক সহস্রের অধিক লোক সমাগত হইয়াছিল। কালী বাবু লিখিয়াছেন—“তাঁহার ধর্মপ্রীতি, সরলতা, অদ্ভুত আত্মসংযম এবং গভীর ধ্যানপরায়ণতা হায়দ্রাবাদবাসীদের চিত্তে যে স্মৃতির রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল তাহা ইহজীবনে অগণীত হইবার নহে।”

## সঙ্কলনরূপণ ও আমেরিকাযাত্রা

হায়দ্রাবাদ হইতে মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলে স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্যেরা তাঁহাকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং মার্চ ও এপ্রিল এই দুই মাস ধরিয়া তাঁহার আমেরিকাযাত্রার ব্যয়নির্বাহার্থ চাঁদা তুলিতে লাগিলেন। এই যুবকদের নেতা হইলেন আলাসিঙ্গা পেরুমল নামে স্বামীজীর একজন নিতান্ত অনুগত শিষ্য। ইনি নিজে মাদ্রাজের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া চাঁদা আদায় করিতে লাগিলেন এবং মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, রামনাদ প্রভৃতি স্থানেও লোক পাঠাইয়া স্বামীজীর ভক্ত, বন্ধু ও শিষ্যগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিকট অর্থভিক্ষা করা হইত, কারণ স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “আমার যাওয়া যদি মার অভিপ্রেত হয় তবে সাধারণলোকদের নিকটই ভিক্ষা পাওয়া উচিত, কারণ আমি যে আমেরিকা যাইতেছি—সে শুধু ভারতের দরিদ্র বা সাধারণ নরনারীর জন্ত।” এ সময়ে আমেরিকাযাত্রার সঙ্কলন তাঁহার মনে দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছিল, কারণ ধর্মমহাসভার ছায় একটা বিরাট সভার অধিবেশনে হিন্দুধর্মের মহিমাপ্রচারের যেরূপ সুযোগ উপস্থিত হইবে, ঐরূপ সুযোগ সচরাচর উপস্থিত হয় না, এটি তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি শিষ্যদিগের উত্তমে বাধা দিলেন না, কিন্তু তথাপি পরিস্কারভাবে দৈব আদেশলাভের জন্ত তাঁহার চিত্ত বিষম ব্যগ্র হইয়া উঠিল। একদিন তাঁহার মনে হইল, আচ্ছা খ্রীশ্রীমা তো ঠাকুরেরই অংশস্বরূপিণী। তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিলে হয় না? তিনি যেরূপ বলিবেন সেইরূপ করিব। কিন্তু উক্ত পত্র লিখিবার পূর্বে



## সকল নিকরপণ ও আমেরিকাবাত্রা

সহসা এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাঁহার সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল, তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, ঠাকুরের আদেশ—তিনি বিদেশ গমন করেন। ঘটনাটি এইরূপ—একদিন রাত্রে তিনি শয়ন করিয়া আছেন—বেশ একটু তন্দ্রাভাব আসিয়াছে; এমন সময়ে দেখিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমুদ্রতীর হইতে বরাবর জলের উপর দিয়া অপর পারের দিকে যাইতে লাগিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইতে ইঙ্গিত করিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ও মনোমধ্যে যেন একটা পরম শান্তির ভাব অনুভূত হইতে লাগিল। কে যেন তখনও তাঁহার কাণে বলিতেছিল—“যাও!” এই স্বপ্নদর্শনের পর হইতে তাঁহার মনে আর দ্বিধা বা ইতস্ততঃ ভাব রহিল না। কিন্তু তথাপি তিনি শ্রীশ্রীমাকে একখানা পত্র লিখিলেন। এ পত্রে আর তাঁহার মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন না, শুধু তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া লিখিলেন, “মহাবীর যেমন রামনাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের উপর লাফ দিয়াছিলেন, আমিও তেমনি ঠাকুরের নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে চলিলাম।”

বহুদিন পরে স্নেহাস্পদ নরেন্দ্রনাথের সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মনের অবস্থা যে কিরূপ হইল তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে শুধু যে ঠাকুরের প্রধান শিষ্য বলিয়াই স্নেহ করিতেন তাহা নহে, তিনি জানিতেন লীলাসংবরণের পর ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য করিতেছেন; কারণ ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের পর তাঁহার একদিন এইরূপ অদ্ভুত দর্শন হইয়াছিল—যেন ঠাকুর নরেন্দ্রের শরীরে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি প্রায়ই নরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিতেন ও ভাবিতেন—না জানি বাছা বনে জঙ্গলে অনাহারে অনিদ্রায় কত কষ্টই পাইতেছে! এক্ষণে নরেন্দ্রের পত্র পাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। একবার তাঁহার মনে হইল

## স্বামী বিবেকানন্দ

নরেন্দ্রকে বিদেশ গমন করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু জগৎকাল পরেই মনে হইল, না—ভবিষ্যতে ইহা হইতে অনেক সফল ফলিবে, আর ঠাকুর যখন আছেন তখন উহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন তিনি ঠিক নরেন্দ্রের স্থায় স্বপ্ন দেখিলেন—ঠাকুর যেন তরঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিতেছেন। অমনি তাঁহার চিন্তাকুল হৃদয় স্থির হইল, তিনি মনে মনে নিরতিশয় স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন, এমন কি নরেন্দ্রকে জগতের শেষ পর্য্যন্ত যাইতে দিতেও আর তাঁহার ভয় রহিল না। তিনি নরেন্দ্রকে এই অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত জানাইয়া একখানি আশীর্বাদী পত্র প্রেরণ করিলেন, তৎসঙ্গে অনেক উপদেশও দিলেন।

স্বামীজী এই পত্র পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। আনন্দবেগ-প্রশমনার্থ তিনি কিয়ৎক্ষণ নিজ কক্ষে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সমুদ্রতীরে চলিয়া গেলেন ও নির্জনে চিন্তা করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পকে বজ্রবৎ সূক্ষ্ম করিলেন। তাঁহার মনে কেবলই উদয় হইতে লাগিল—“আঃ, এতক্ষণে সব ঠিক হল। মারও ইচ্ছা আমি যাই।” ভ্রমণান্তে যখন তিনি মন্মথ বাবুর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন তখন তাঁহার মুখশ্রীতে দিব্যরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেন একটা নিষ্মল শাস্তির ভাব সেখানে ঢলঢল করিতেছে। শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার মুখে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, —“হ্যাঁ, আমি এখন পশ্চাত্যদেশে বাইবার জন্ত প্রস্তুত। প্রাণপণে আমাদের কাছে লাগিতে হইবে—খ্রীষ্টীয়ার আদেশ পাইয়াছি।”

শিষ্যেরা তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে বাহির হইল এবং অনতিবিলম্বে প্রচুর অর্থ আনিয়া তাঁহার



## সঙ্কল্পনিরূপণ ও আমেরিকাযাত্রা

চরণে সমর্পণ করিল। দুই-এক দিনের মধ্যেই তাঁহার সমুদ্রযাত্রার সকল বন্দোবস্ত ঠিকঠাক হইয়া গেল—এমন সময়ে খেতড়ি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সব সঙ্কল্প উল্টাইয়া দিলেন।

স্বামীজী যখন খেতড়িতে ছিলেন তাহার পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। পাঠকের অরণ থাকিতে পারে খেতড়িতে মহারাজ তাঁহার নিকট পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্বামীজীও তাঁহাকে পুত্রলাভ হইবে বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যই সে আশীর্বাদ ফলিয়াছে—কিছুকাল পূর্বে খেতড়িরাজের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মহারাজের আনন্দের আর সীমা নাই। তিনি প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডাকিয়া কহিলেন, “জগমোহন, এ উৎসবে স্বামীজীর আসা চাই। তিনি না থাকিলে এ উৎসব-আনন্দ সবই বুখা। তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর।” জগমোহনজী তদনুসারে এক্ষণে মালদ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও অনুসন্ধানে স্বামীজী মগধ বাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশে যে ভৃত্য ছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী কোথায়?” সে বলিল, “তিনি সমুদ্রে গিয়াছেন।” জগমোহন নৈরাশ্র-ব্যঞ্জক স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, “কি! তিনি কি তা হলে পশ্চিমদেশে যাত্রা করিয়াছেন? কি বল হে!” কিন্তু সেই সময়ে পশ্চাতের একটি ঘরে তিনি একটা গেরুয়া আলখাল্লা দেখিতে পাইয়া স্থির করিলেন, “না, স্বামীজী কখনই যান নাই।” জগমোহন মালদ্বীপী ভাষা না জানায় ভৃত্যটির কথা ভুল বুঝিয়াছিলেন। সে বলিয়াছিল, “স্বামীজী সমুদ্রে গিয়াছেন” অর্থাৎ সমুদ্রতটে ভ্রমণের জন্ত গিয়াছেন—তিনি ভাবিয়াছিলেন স্বামীজী সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন। যাহা হউক, স্বল্পকাল মধ্যেই একখানি গাড়ী আসিয়া দ্বারদেশে থামিল ও স্বামীজী তাহা হইতে অবতরণ করিলেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

জগমোহন স্বামীজীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তারপর কুশলজিজ্ঞাসাদি হইল। জগমোহন কালবিলম্ব না করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার আগমনোদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। স্বামীজী সব কথা শুনিয়া বলিলেন, “দেখ জগমোহন, আমি ৩১শে মে আমেরিকা যাত্রা করিব—ঠিক হইয়াছে, এখন তাহারই জন্ত গোছগাছ করিতে হইতেছে—এ অবস্থায় মহারাজের সহিত দেখা করিবার আর সময় কৈ?” কিন্তু জগমোহন শুনিলেন না, বলিলেন—“স্বামীজী, আপনি অন্ততঃ এক দিনের জন্তও থেতড়ি চলুন।” আপনি যদি না যান মহারাজের মনে নিদারুণ কষ্ট হইবে। আর আপনি যে ও-দেশে যাইবার জন্ত গোছগাছ বন্দোবস্তের কথা বলিতেছেন ও-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মহারাজ নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। আপনি শুধু আমার সঙ্গে চলুন।” জগমোহনজীর আগ্রহাতিশয্যে স্বামীজী অগত্যা থেতড়ি গমনে সন্মত হইলেন। স্থির হইল তিনি আর এদিকে ফিরিবেন না, বরাবর বোম্বাই হইতেই জাহাজে উঠিবেন। অনন্তর তিনি জগমোহনকে সঙ্গে লইয়া থেতড়ি যাত্রা করিলেন। মালদাজীরা তাঁহাকে অতি দ্রুত অস্তরে বিদায় দিল।

যখন তাঁহারা থেতড়িতে উপনীত হইলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাজপ্রাসাদ শত শত উজ্জ্বল দীপাবলীতে আলোকিত ও চতুর্দিকে নানাবিধ উৎসবের চিহ্ন বিद्यমান। আজ ৩৪ দিন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, অনেক নিমন্ত্রিত রাজা ও রাজ-অমাত্য স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সর্বত্র অপূর্ণ শোভায় শোভিত, নৃত্যগীতবাগ্মে মুখরিত এবং আনন্দশ্রোতে ভাসমান।<sup>১</sup>

১ থেতড়িতে যাইবার সময় পথে আবুরোড স্টেশনে বহুকাল পরে স্বামীজীর সহিত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সাক্ষাৎ হয়—তাঁহারা তখন পরিত্রাজকভাবে



## সঙ্কল্পনিরূপণ ও আমেরিকাবাত্রা

স্বামীজী ও জগমোহনলাল শর্কট হইতে প্রাসাদের সিংহদ্বারে অবতরণ করিবামাত্র রক্ষীরা অস্ত্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। মহারাজ সে সময়ে পত্রপুপ, কল ও নগ্নমুক্তা-শোভিত সুদৃশ্য রাজতরণীতে বহু রাজ-অতিথি, কুটুম্ব ও অমাত্যাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া জলবিহার করিতেছিলেন। গুরুর আগমনসংবাদ বিজ্ঞাপিত হইবামাত্র তিনি সসম্মানে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। অত্যাশ্চর্য্য সকলেও দণ্ডায়মান হইয়া অবনত মস্তকে স্বামীজীকে অভিবাদন করিলেন। স্বামীজী স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিয়া রাজাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। গায়কেরা স্বস্তিগান করিতে লাগিল। স্বামীজীর জ্ঞাত একটি বিশেষ আসন নির্দিষ্ট ছিল। তিনি তাহাতে উপবিষ্ট হইলে মহারাজ অভ্যাগত ব্যক্তিবৃন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সনাতনধর্ম্মপ্রচারার্থ তাঁহার শীঘ্র পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে গমনের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন। সভাস্থ সকলেই এতচ্ছুবণে তাঁহাকে বহু ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বামীজীর আশীর্বাদগ্রহণের জ্ঞাত শিশু রাজকুমারকে সভামধ্যে আনয়ন করা হইল এবং তিনি তাঁহার মস্তকে হস্তরক্ষা করিয়া কল্যাণবাক্য উচ্চারণ করিলে চতুর্দিকে আনন্দের কলরোল উত্থিত হইল। অনন্তর স্বামীজী মহারাজা ও অভ্যাগত রাজত্ববৃন্দের সহিত কথোপকথনে নিবিষ্ট হইলেন। সেদিন সমগ্র খেতড়িরাষ্ট্রে রাজগুরুর উপস্থিতিনিবন্ধন যে আনন্দশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

ভ্রমণ করিতেছেন। ইহাদের নিকটে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কিছু বুঝতে পারি বা না পারি, দরিদ্র পতিত অজ্ঞ নরনারীর অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করে হৃদয়টা খুব বেড়ে বাচ্ছে।”

## স্বামী বিবেকানন্দ

কিয়দিন পরে স্বামীজী বোম্বাই গিয়া সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করিবার জন্ত মহারাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ অনেক দিন পরে স্বামীজীর দর্শনলাভ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে পুনরায় এত শীঘ্র গমনোত্তর দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, “স্বামীজী মহারাজ, আপনাকে বিদায় দিতে আমার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমি বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে চাহি না। তবে আমি জয়পুর পর্য্যন্ত আপনার অনুগমন করিব।” স্বামীজী নিবেদন করিলে মহারাজ পুনরায় বলিলেন, “অতিথিকে বিদায় দিতে হইলে অন্ততঃ রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ত যাওয়া উচিত।” স্বামীজী আর কি করিবেন। মহারাজ ও জগমোহনলাল রাজকীয় গো-যানে জয়পুর পর্য্যন্ত স্বামীজী-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ জগমোহনজীকে স্বামীজীর সহিত বোম্বাই পর্য্যন্ত বাইতে আদেশ দিয়া তাঁহার নিকট স্বামীজীর প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন ও তাঁহার সমুদ্র-যাত্রার জন্ত বাহা বাহা আবশ্যক তৎসমুদায়ের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া দিলেন। জয়পুর হইতে স্বামীজী ট্রেনে উঠিলেন। তাঁহাকে একখানি প্রথমশ্রেণীর গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া মহারাজ প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আবুরোড ষ্টেশনে নামিয়া স্বামীজী রাত্রিটা একজন রেলকর্মচারীর বাসায় যাপন করিলেন। এই ভদ্রলোকের গৃহে তিনি পূর্ব্বে দিনকতক ছিলেন ও তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই ষ্টেশনে পুনরায় গাড়ীতে উঠিবার সময় নিম্নলিখিত অপ্রীতিকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়।

স্বামীজীর একজন বাঙ্গালী ভক্ত তাঁহার কামরায় বসিয়া কথা কহিতেছিলেন। এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ রেলকর্মচারী আসিয়া সেই



## সঙ্কল্পনিরূপণ ও আমেরিকাযাত্রা

ভদ্রলোককে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে আদেশ করিল। ভদ্রলোকটি সেইখানে বলিয়া রহিলেন। সাহেবের কথা গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া সাহেব একটু গরম হইয়া রেলের আইনের দোহাই দিয়া পুনরায় তাঁহাকে নামিয়া যাইতে বলিল। ইনিও একজন রেলকর্মচারী, সুতরাং রেলের আইন-কানুন জানিতে তাঁহার বাকী ছিল না। তিনি বলিলেন, এমন কোন আইন নাই যাহার দ্বারা তিনি চলিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু ইহাতে সাহেবটি আরও রাগিয়া গেল এবং ক্রমে দুইজনে বেশ বচসা আরম্ভ হইল। স্বামীজী তাঁহার ভক্তটিকে পুনঃ পুনঃ ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলেও তিনি ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এমন সময়ে সাহেব হঠাৎ স্বামীজীকে ‘তুম্ কাহে বাত কর্তে হো’ বলিয়া এক ধমক দিলেন। গৈরিকধারী সামান্য সন্ন্যাসী ভাবিয়াই বোধ হয় সাহেব ধমকাইয়াছিলেন, কারণ রеле এইরূপ অনেক সন্ন্যাসী যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং গুঁ’তাগাঁতা খাইয়াও নিঃশব্দে চলিয়া যান; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিল। বুঝিলেন এবার শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছেন। স্বামীজী তাঁহার অভদ্র আচরণে চক্ষু আরক্ত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, “‘তুম্ তুম্’ কচ্ছ কাকে? প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছ অথচ কি করে কথা বলতে হয় জান না? ‘আপ’ বলতে পার না?’”

টিকিটকলেক্টর তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ও তীব্র ভৎসনা শ্রবণ করিয়া থতমত খাইয়া গেল; বলিল, “অন্নায হয়েছে, আমি ও-ভাষাটা (হিন্দী) ভাল জানি না। আমি শুধু এই লোকটাকে...।” স্বামীজীর আর সহ হইল না; বজ্রনাদে কহিলেন, “তুমি এই বলে দেশী ভাষা জান না, এখন দেখছি তুমি তোমার নিজের ভাষাটাও জান না। ‘লোকটা’

## স্বামী বিবেকানন্দ

কি? ‘ভদ্রলোকটি’ বলতে পার না? তোমার নাম নম্বর বল, আমি তোমার ব্যবহার উপরে জানাব।”

একটা মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। সাহেব দেখিলেন বেগতিক, চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। কাজেই পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তথাপি ছাড়িবার পাত্র নহেন, বলিলেন, “এই শেষ বলছি, হয় তোমার নাম নম্বর দাও, নয় ত লোকে দেখুক তোমার মত কাপুরুষ আর ছনিয়ায় নেই।”

এই কথা শুনিয়া সাহেব ঘাড় হেঁট করিয়া সরিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল, স্বামীজী তখন জগমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি চাই দেখছো? এই আত্মসম্মানজ্ঞান। আমরা কে, কি দরের লোক না বুঝে ব্যবহার করাতেই লোকে আমাদের ঘাড়ে চড়তে যায়। অত্নের নিকট নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখা দরকার। তা না হলেই তারা আমাদের তুচ্ছ তামিল্য ও অপমান করে—এতে হুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। শিক্ষা ও সভ্যতায় হিন্দুরা জগতের কোন জাতের চেয়ে হীন নয়, কিন্তু তারা নিজেদের হীন মনে করে বলেই একটা সামান্য বিদেশীও আমাদের লাথি বাঁটা মারে—আর আমরা চুপ করে তা হজম করি।”

স্বামীজী জগমোহনকে সঙ্গে লইয়া বোম্বাই পৌঁছিলেন ও ষ্টেশনে নামিয়াই আলাসিজা পেরুমলের দেখা পাইলেন। আলাসিজা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য মাত্ৰাজ হইতে এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। খেতড়িরাঙ্গ জগমোহনকে বারবার বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, “দেখো, যেন স্বামীজীর কোনরূপ অসুবিধা না হয়।” তদনুসারে তিনি বোম্বাই পৌঁছিয়াই স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া শহরের



## সঙ্কল্পনিরূপণ ও আমেরিকাযাত্রা

সর্বোৎকৃষ্ট দোকানগুলিতে গিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলেন। জগমোহনকে আলখাল্লা ও পাগড়ীর দ্রব্য বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রের পোষাক পরিচ্ছদাদি কিনিতে দেখিয়া স্বামীজী অনেকবার নিষেধ করিলেন। বলিলেন, “একটা যে-সে রকমের গেরুয়াবস্ত্র হইলেই চলিবে।” কিন্তু জগমোহন তাঁহার নিষেধ শুনিলেন না—স্বামীজীকে রাজোচিত বেষভূষায় ভূষিত করিয়া ও সঙ্গে বহু অর্থাদি দিয়া পি. এণ্ড ও. কোম্পানির পেনিন্সুলার নামক ষ্টিমারের একখানি প্রথমশ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিলেন। বলিলেন, “রাজগুরু—রাজগুরুর উপযুক্ত বেশে ভ্রমণ করিবেন।”

অবশেষে ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দিন জাহাজ ছাড়িবার কথা। স্বদেশ ও স্বজন ছাড়িয়া বিশাল সমুদ্রে লভন করিবার পূর্বে মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা স্বামীজী পূর্বে কখনও অনুভব করেন নাই; এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন। বন্ধুদিগের অনুরোধে তিনি একটি গৈরিক রেশমী পরিচ্ছদ ও গৈরিক পাগড়ী পরিধান করিয়া জাহাজে উঠিলেন। সে-বেশে তাঁহাকে একজন দেশীয় রাজা বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার অন্তর তখন বিভিন্ন চিন্তায় দগ্ধ ও বিবিধ ভাবে আন্দোলিত হইতেছিল। সকলেরই ভিতরে কি একটি অব্যক্ত বেদনার ভাব। এ ছাড়াছাড়িতে যেন প্রাণের বাঁধনে টান পড়িতেছে। জগমোহনজী ও আলাসিঙ্গা জাহাজে উঠিবার সিঁড়ির উপরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গেলেন ও শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তারপর ৮৭ ৮৭ করিয়া জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। সেই সঙ্গে সকলেরই প্রাণের ভিতর যেন আঘাত পড়িতে লাগিল। হৃদয়ধার ভেদ করিয়া অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল।

## স্বামী বিবেকানন্দ

জগমোহন ও আলাসিঙ্গা সান্টাগ প্রণত হইয়া স্বামীজীর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন এবং জাহাজ হইতে নামিয়া গেলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

স্বামীজী ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেল তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, তারপর ব্যাকুল হৃদয়ে ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, বরাহনগরের মঠ ও গুরুভাইদের কথা চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ সমগ্র দেশ, দেশের ধর্ম, সভ্যতা, প্রাচীন মহত্ব, বর্তমান দুঃখ ইত্যাদি বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল।

তাঁহার যে 'বিবেকানন্দ' নাম হইয়াছিল তাহা তাঁহার গুরুভাইয়েরা কেহ জানিতেন না, কারণ স্বামীজী আমেরিকাযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে তিনি পরিচিত লোকদের হাত এড়াইবার জন্ত অনেকবার নিজ নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কখনও নিজেকে 'বিবিদিসানন্দ', কখনও 'সচ্চিদানন্দ', কখনও বা অল্প কিছু বলিয়া পরিচয় দিতেন, অবশেষে খেতড়ির রাজার একান্ত অনুরোধে 'বিবেকানন্দ' নামই বজায় রাখিয়াছিলেন।



## সমুদ্র-পথে

জাহাজে উঠিয়া স্বামীজী প্রথম প্রথম জিনিসপত্র লইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। কোপীনমাত্র-সহায় সন্ন্যাসীর পক্ষে ট্রাঙ্ক, পোর্টম্যান্টো, বিছানাপত্র প্রভৃতি সামলান বেন একটা মহা হান্সামা। বাহা হউক, তিনি ক্রমশঃ উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং দুই-চারি দিনের মধ্যেই অশ্রান্ত যাত্রীদের সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া লইলেন। সকলেই এই উজ্জলবদন, গৈরিকধারী যুগেন্দ্র-তুল্য বিচরণশীল বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে প্রীতির সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন সাহেবও মাঝে মাঝে সময় পাইলে তাঁহার নিকট আসিয়া গল্পগুজব করিতেন ও এঞ্জিনের কলকজা হইতে আরম্ভ করিয়া জাহাজের প্রত্যেক স্থান ও প্রতি বিষয় তাঁহাকে যত্নসহকারে দেখাইতেন বা বুঝাইতেন। যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভিন্নদেশবাসী। স্বামীজী এইসকল বিদেশীয় লোকদিগের সহিত কি করিয়া চলাফেরা করিতে হয় প্রথমে তাহা কিছুই জানিতেন না, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই সব শিখিয়া লইলেন। কয়েকজন যাত্রীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও জন্মিল, তাঁহাদের মধ্যে জনকতক ছিলেন জার্মান।

সপ্তাহকাল মধ্যে জাহাজ কলম্বো বন্দরে পৌছিল এবং সারাদিন সেখানে রহিল। এই সুযোগে স্বামীজী জাহাজ হইতে নামিয়া শহর দেখিতে গেলেন এবং বেড়াইতে বেড়াইতে অবশেষে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের বিস্তর প্রতিকৃতির মধ্যে তাঁহার নির্বাণলাভকালীন একটি বিরাট অর্ধশায়িত মূর্তি তাঁহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। তিনি মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিলেন, কিন্তু তাঁহারা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অল্প কোন ভাষা না জানায় সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। সিংহলী বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র কান্দী শহর কলম্বো হইতে ৮০ মাইল দূর। স্বামীজীর সেখানেও বাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সম্ম-সংক্ষেপ বলিয়া হইয়া উঠিল না। তিনি দেখিলেন পুরোহিতসম্প্রদায় ব্যতীত সিংহলের স্ত্রী-পুরুষ সকল বৌদ্ধ গৃহস্থই মৎস্যমাংসভোজী এবং তাহাদের পরিচ্ছদ ও আকৃতি মাদ্রাজীদের মত। তিনি তাহাদের ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তবে উচ্চারণ শুনিয়া বোধ হইল উহা তামিলের অনুরূপ।

ইহার পর জাহাজ মালয়ের রাজধানী পেনাং-এ গিয়া থামিল। পেনাং খুব ক্ষুদ্র শহর বটে, কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে তাহারা বিখ্যাত জলদস্যু ছিল ও বণিক্কুলের ভীতি উৎপাদন করিত, কিন্তু বর্তমানকালের রণতরীস্থিত বৃহৎ বৃহৎ কামানের ভয়ে তাহারা দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে।

পেনাং হইতে সিঙ্গাপুর। পথে যাইতে যাইতে কাণ্ডেন সাহেব স্মৃত্যাদ্বীপের উচ্চ পর্বতগুলি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন ও বলিলেন, পূর্বে ঐসকল স্থানে বোম্বেটিয়াদিগের আড্ডা ছিল। সিঙ্গাপুরে পৌছিয়া স্বামীজী বটানিকাল গার্ডেন দেখিতে গেলেন। তথায় বিবিধ তালজাতীয় বৃক্ষ (Palm) ও পান্থপাদপ (Traveller's Palm) অপরিখ্যাপ্ত। মাদ্রাজের স্থায় এই স্থানও বিশ্ববরেখার নিকটবর্তী, কিন্তু এখানকার লোকেরা মাদ্রাজী-দিগের অপেক্ষা অনেক ফরসা। সিঙ্গাপুরে একটি সুন্দর বাত্মঘর আছে।

তারপর জাহাজ হংকং বন্দরে পৌছিল। ইহার বিবরণ স্বামীজী যেক্রপ দিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

“হংকং-এ আসিলে বুঝা যায় এইবার সত্যই চীনে আসিয়াছি—চীনের



## সমুদ্র-পথে

ভাব এখান হইতেই এত অধিক। দেখা যায় সকল কার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য চীনাদেরই হাতে। বেই জাহাজ কিনারায় নঙ্গর করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় নইয়া বাইবার জন্ত তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে। এই নৌকাগুলির একটু বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকটিতে দুইটি করিয়া হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকার বাস করে। হালে প্রায় মাঝির স্ত্রী বসিয়া থাকে এবং একটি হাল হাত দিয়া ও অপরটি পা দিয়া চালায়। আর অনেক সময় দেখা যায়, তাহার পিঠে একটি কচি ছেলে বাঁধা, অথচ সে তাহার হাত পা বেশ নড়িতেছে। দেখিতে বড় মজা। চীনে থোকা মায়ের পিঠে দিবিয়া নড়িতেছে চড়িতেছে, মা ওদিকে প্রাণ-পণ শক্তিতে নৌকা চালাইতেছে, ভারী ভারী বোঝা সরাইতেছে, কিংবা খুব ক্ষিপ্ততার সহিত এক নৌকা হইতে আর এক নৌকায় লাকাইয়া বাইতেছে। নৌকা ও ষ্টীমারের এত ভিড় যে প্রতিমুহূর্তেই টিকিসমেত চীনে থোকায় মাথাটি একেবারে গুড়া হইয়া বাইবার সম্ভাবনা। থোকায় কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র জ্ঞেপ নাই। সে এই মহাব্যস্ত কর্মজীবনের কোনও ধার ধারে না। কর্মোন্মত্তা মাতা তাহাকে মাঝে মাঝে দুই-এক টুকরা পিঠা দিতেছে, সে তাহারই রসাস্বাদনে রত।

“চৈনিক শিশুকে দার্শনিক বলিলেই হয়। কারণ, আমাদের দেশের শিশু যখন ভাল করিয়া হাঁটিতে শিখে না সেই বয়সে সে দিবিয়া কাজ-কর্মের চেষ্টায় ঘোরে ফিরে। অভাব যে কি বস্তু তাহা ঐ-বয়সেই তাহার বোধগম্য হইয়াছে। চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতার লোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দারিদ্র্যই তাহার এক প্রধান কারণ। নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের পেষণে সে আর কিছু ভাবিবার অবসর পায় না।

## স্বামী বিবেকানন্দ

“হংকং বড় সুন্দর শহর—কতকটা পর্বতের পার্শ্বভাগে ও কতক উপরি-ভাগে অবস্থিত—উপরের অংশটি বেশ শীতল। ট্রাম পাহাড়ের গা বাহিয়া খাড়া উপরে উঠিয়া থাকে এবং বাষ্প ও তারের দড়ির সাহায্যে চলে।

“আমরা হংকং-এ তিন দিন রহিলাম। তথা হইতে ক্যান্টন দেখিতে গিয়াছিলাম। হংকং হইতে একটি নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে ৮০ মাইল যাইলে ক্যান্টনে যাওয়া যায়। নদীটি এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অনেকগুলি চীনা জাহাজ হংকং ও ক্যান্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বৈকালে একটি জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যান্টনে পৌছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়া যাইবার নৌকা নহ্ন—হাজার হাজার নৌকা রহিয়াছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাহাদের মধ্যে অনেক-গুলি অতি সুন্দর ও বৃহৎ, বাস্তবিক সেগুলি দোতারা তিনতারা খাড়ীর মত, আবার চারিদিকে বারাণ্ডা দেওয়া। বাড়ীগুলি সব জলে ভাসিতেছে, অথচ তাহাদের মধ্য দিয়া যাতায়াতের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

“আমরা যেখানে নামিলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গবর্ণমেন্ট বৈদেশিক-দিগকে বাস করিবার জন্ত দিয়াছেন। আমাদের চতুর্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল ব্যাপিয়া এই বৃহৎ সহর অবস্থিত—এখানে অগণ্য মানুষ বাস করিতেছে, জীবন সংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে—প্রাণপণে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। মহাকলরব—মহাব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হউক, এখানকার কর্মপ্রবণতা যতই হউক, আমি ইহার মত



## সমুদ্র-পথে

নোংরা সहर দেখি নাই—তবে ভারতবর্ষে কোন সहरকে নোংরা বলিলে বাহা বুঝায় সে হিসাবে নয়, কারণ, চীনেরা ত এতটুকু ময়লা পর্যন্ত বুঝা নষ্ট হইতে দেয় না! আমি বলিতেছি চীনেরদের গা হইতে যে বিষম দুর্গন্ধ বাহির হয় তাহারই কথা। তাহারা যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কখন স্নান করিবে না। বাড়ীগুলি সব এক একটি দোকান—লোকেরা উপর তলায় বাস করে। রাস্তাগুলি এত সড় যে চলিতে গেলেই ছধারের দোকানে গা ঠেকিয়া যায়। দশ পা চলিতে না চলিতে মাংসের দোকান চোখে পড়ে। এমন দোকানও আছে যেখানে কুকুর-বিড়ালের মাংস বিক্রয় হয়—অবশ্য খুব গরিবেরাই কুকুর-বিড়াল খায়।

“আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দা আছে, কেউ কখন তাহাদের দেখিতে পায় না, চীনা মহিলাদেরও তজ্রপ। অবশ্য শ্রমজীবী জীলোকেরা লোকের সামনে বাহির হয়। ইহাদের মধ্যেই দেখা যায় এক একটি জীলোকের পা আমাদের দেশের ছোট ছেলের পায়ের চেয়ে ছোট—তারা হাঁটুরা বেড়াইতেছে ঠিক বলা যায় না—খোঁড়াইয়া থপ্ থপ্ করিয়া চলিয়াছে।”

ক্যান্টনে স্বামীজী কতকগুলি চীনা মন্দির দেখিলেন, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটিই প্রথম বৌদ্ধ সম্রাটের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের একটি চমৎকার ধ্যানস্তিমিত সৌম্যমূর্ত্তি, তন্নিম্নে সম্রাটের ও তাহার চতুর্পার্শ্বে পাঁচশত প্রথম বৌদ্ধধর্মগ্রহণকারীর মূর্ত্তি কাষ্ঠে ক্ষোদিত। স্বামীজী এই সকল কাষ্ঠের কারুকার্য দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মন্দিরের নির্মাণ-প্রণালীর সহিত ভারতের বৌদ্ধযুগে নির্মিত স্থাপত্যশিল্পের অনেক সৌসাদৃশ্য অবলোকন করিলেন। ক্যান্টনে চীনবাসীদের কার্যদক্ষতা ও

## স্বামী বিবেকানন্দ

অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি প্রায় বলিতেন, “এই বার চীনের উঠবার পালা।”

ক্যান্টনে স্বামীজী একটি চীনে-মঠ দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইলেন। কিন্তু ঐ সকল মঠ এমন স্থানে অবস্থিত যেখানে বিদেশীদের প্রবেশাধিকার নাই। তিনি পথ-প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সে ব্যক্তি বলিল ‘অসম্ভব’। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ইচ্ছা যেন আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, যদি কোন বিদেশী মঠের মধ্যে গিয়া পড়ে তাহলে কি হয়?” “মঠবাসীরা তাহার উপর বিষম অত্যাচার করে।” স্বামীজীর মনে হইল বোধ হয় হিন্দু সাধু বলিয়া পরিচয় দিলে কেহ তাঁহার অনিষ্ট-চেষ্টা করিবেন না। এই মনে করিয়া তিনি দ্বিভাষী ও জার্মান সহচরদ্বিগকে ঐরূপ একটি মঠে যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা চলই না কেন, গিয়া দেখি তাহারা আমাদের খুন করিয়া ফেলে, কি, কি করে।” এই বলিয়া তাঁহারা একটি মঠাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিয়দূর যাইতে না যাইতে দ্বিভাষী চিৎকার করিয়া বলিল, “পালান, পালান, ঐ দেখুন কতকগুলি লোক তেড়ে আসছে।” বাস্তবিক দেখা গেল তিন চারিজন লোক প্রকাণ্ড মোটা মোটা লাঠি হাতে লইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহাদের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। জার্মান সঙ্গীরা ত দেখিয়াই ছুট! দ্বিভাষীও পলাইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু স্বামীজী তাহার হাত টানিয়া ধরিলেন ও ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বাণু, পালাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু বলে যেতে হবে চীনা ভাষায় ভারতবর্ষীয় ‘বোঙ্গী’কে কি বলে।” লোকটা কথাটা বলিয়া দিরাই দৌড়াইল, ওদিকে জগাই-মাধাইয়ের



## সমুদ্র-পথে

দলও প্রায় আলিঙ্গা পড়িয়াছে। স্বামীজী দূর হইতে চীৎকার করিয়া নিজে একজন 'যোগী' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। 'যোগী' শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবারাত্র মদ্রবৎ কার্য্য হইল। লোক-গুলি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল ও যুক্তকরে বারংবার প্রণাম করিয়া কি সব বলিতে লাগিল। তাহার মধ্যে একটি কথা স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন—'কবচ'। তাঁহার বোধ হইল ওটা আমাদেরই দেশী কথা 'কবচ'। কিন্তু আরও নিশ্চয় হইবার জ্ঞান দূরে দণ্ডায়মান দ্বিভাষীকে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবচ শব্দের অর্থ কি?" উত্তরে সে বাহা বলিল তাহাতে তিনি বুঝিলেন কবচ শব্দে আমাদের দেশে বাহা বুঝায় ও দেশেও তাহাই—অর্থাৎ রক্ষাকবচ, এবং ঐ লোকগুলি তাঁহার নিকট ভূতপ্রেত হইতে আত্মরক্ষার্থ কোনরূপ মন্ত্রপুত কবচ চাহিতেছে। স্বামীজী এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া লইলেন, তার পর পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া ছোট ছোট টুকরা করিলেন ও তাহার প্রত্যেকটিতে সংস্কৃত অক্ষরে 'ওঁ' এই কথাটি লিখিয়া তাহাদের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহারা কৃতজ্ঞতাভরে কাগজগুলি মাথায় ঠেকাইল ও তাঁহাকে প্রণাম করিল। তার পর তাঁহাকে মঠ দেখাইবার জ্ঞান ভিতরে লইয়া গেল।

মঠ-বাড়ীটির অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে একটি গৃহমধ্যে স্বামীজী অনেকগুলি হাতে-লেখা সংস্কৃত পুঁথি দেখিতে পাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইগুলি সব প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, প্রথম বৌদ্ধ সম্রাটের স্থিতিমন্দিরের অভ্যন্তরে যে পাঁচশত বৌদ্ধের দাক্ষম্য মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখের

## স্বামী বিবেকানন্দ

আকৃতি ঠিক বাঙ্গালীর মত। এইসকল প্রমাণ দেখিয়া ও চীন দেশের প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ইতিহাস স্মরণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, এক সময়ে চীন ও বঙ্গদেশের মধ্যে বেশ জানাশুনা ছিল ও বাঙ্গালী ভিক্ষুরা চীনে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতীয় সভ্যতার অনেকটা ছাপ চৈনিক সভ্যতার উপর পড়িয়াছিল। মোটের উপর ক্যান্টন শহর দেখিয়া স্বামীজীর বেশ ভাল লাগিয়াছিল ও তিনি অনেক নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

ক্যান্টন হইতে তিনি আবার হংকং-এ ফিরিলেন ও তথা হইতে জাপানে পৌঁছিলেন। সর্বপ্রথমে জাহাজ কিছুক্ষণের জন্ত নাগাসাকি বন্দরে লাগিল। স্বামীজী শহরভ্রমণে বহির্গত হইলেন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জাপানী জাতিকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিলেন। ইহাদের সম্বন্ধে তিনি বাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ—

“পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তাহার অত্যন্তম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলি চওড়া, সিঁধা ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো। বাড়ীগুলি দিব্যি ছোট ছোট খাঁচার মত। প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু-বৃক্ষে ঢাকা চির হরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলি—খর্বকায় স্ত্রী অদ্ভুতবেশী জাপগণ—তাহাদের প্রত্যেক চালচলন, ভাবভঙ্গী—সবই সুন্দর। সমগ্র দেশটি যেন একখানি ছবি। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাদ্ভাগে বাগান—জাপানী ধরণে সুন্দরভাবে প্রস্তুত। তাহার মধ্যে ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয় ও ছোট ছোট পাথরের সঁকো।”

নাগাসাকি হইতে জাহাজ কোবি (Kobe)তে পৌঁছিল। এখানে



## সমুদ্র-পথে

স্বামীজী জাহাজ ছাড়িয়া স্থলপথে জাপানের মধ্য দিয়া ইরোকোহামা পর্যন্ত গেলেন। পথে ওসাকা, পূর্বরাজধানী কিয়োটো ও বর্তমান রাজধানী টোকিও দেখিলেন। টোকিওর আয়তন ও লোকসংখ্যা কলিকাতার দ্বিগুণ। বৈদেশিক ছাড়পত্র ব্যতিরেকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয় না। স্বামীজী এখানে অনেকগুলি মন্দির দেখিলেন— তাহার প্রত্যেকটিরই গায়ে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত মন্ত্র খোদিত। বর্তমানে পুরোহিতদিগের মধ্যে কদাচিৎ কাহাকেও সংস্কৃতজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায়—তবে তাঁহারা বেশ বুদ্ধিমান এবং তাঁহাদের মধ্যেও আধুনিক উন্নতির ভাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে।

১৮৯৩ সালের ১০ই জুলাই ইরোকোহামা হইতে তিনি মাদ্রাজী বন্ধুদিগকে যে পত্র লেখেন তাহাতে জাপানীদের সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম এইরূপ—

“বর্তমান যুগের জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার জন্ত কি কি প্রয়োজন তাহা জাপানীরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছে। তাহাদের 'সৈন্তসমূহ' সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত এবং তাহারা তাহাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছে। তাহাদের কামানগুলি দেশীয় কারিগরের প্রস্তুত। জাপানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের যে অভাব নাই তাহার প্রমাণ তাহারা পাহাড় ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ নির্মাণ করিয়াছে—তার কোন কোনটা প্রায় অর্ধ ক্রোশ দীর্ঘ। ইহাদিগের শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এবং যে কোন দ্রব্যের অভাব বোধ করিতেছে তাহা নিজেদের শিল্পদ্বারা প্রস্তুত করাইতেছে। জাপানী দেশলাইয়ের কারখানা একটি দেখিবার বস্তু। ইহাদের নিজেদের একটি ষ্টীমার লাইন আছে, উহার জাহাজ চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করে। ইহা ছাড়া তাহারা শীঘ্রই

## স্বামী বিবেকানন্দ

বোম্বাই ও ইন্নোকোহামার মধ্যে আর একটি লাইন খুলিবার মতলব করিয়াছে।”

উপরোক্ত পত্রে ভারতবাসীদের জড়তা ও আত্মোন্নতিচেষ্টার একান্ত অভাব স্বরণ করিয়া তিনি মাদ্রাজী যুবকদের যে উদ্দীপনাপূর্ণ কথাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। উহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিন্তু মূল পত্রখানি অতি সুন্দর।

“জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সৰ্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ। কিন্তু তোমরা কি কছ? না, সারাজীবন কেবল বাজে বকছো। এসো, এদের দেখে যাও, তারপর লজ্জার মুখ লুকাও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাহিরে গেলে তোমাদের জাত যায় এমন আহাম্মক জাত! এই হাজার বছরের ক্রমবর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাড়াখাটের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তি ক্ষয় করছো! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ্য সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি! আর করছোই বা কি? . . . বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়েচারী করছো—ইউরোপীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছে, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ত্রিশ টাকার কেরানীগিরির



## সমুদ্র-পথে

দিকে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা তুটু উকিল হবার মতলব করছ—ইহাই ভারতীয় যুবকের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা! আবার প্রত্যেক ছাত্রের পায়ে পায়ে এক পাল ছেলে-মেয়ে ‘বাবা, খাবার দাও, বাবা, খাবার দাও,’ বলে হাঁসের মত প্যাক প্যাক করছে!!! বলি, সমুদ্রে ত যথেষ্ট জল আছে—তোমরা কেতাব, গাঁউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সবস্বত্ব তাতে ডুবে মরতে পার না? . . .

“এস, মানুষ হও। নিজেদের স্বর্গীয় গর্ভ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখ—সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? দেশকে ভালবাস? তা হলে এস, ভাল হবার জন্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি নিকট আত্মীয় ও প্রিয়জন কাঁদে কাঁদুক, তবুও পেছনে চেয়ো না—কেবল সামনে এগিয়ে যাও।

“ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই প্রাণস্পন্দনহীন সত্যতাকে ভাঙ্গবার জন্যই ইংরাজ রাজশক্তিকে এদেশে প্রেরণ করেছেন আর মাদ্রাজের লোকই সর্বপ্রথমে ইংরাজদিগকে এদেশে আশ্রয় প্রদান করেছিল। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বাস্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতকগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত?—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত বদনে অন্নদান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষদিগের অত্যাচারে যারা পশুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে? . . .”

## স্বামী বিবেকানন্দ

ইয়োকোহামা হইতে স্বামীজী পুনরায় জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে প্রাচ্যজগৎ ছাড়িয়া প্রতীচ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ দিনগুলি সাগরদর্শনে, ধ্যান-ধারণায় ও অধ্যয়নে কাটিয়া গেল।



## আমেরিকায় প্রথম করাদিন

প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাঘ্রাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজ বহুবর পৌছিল। বহুবর কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্তমহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এখানকার প্রধান নগরের নামও বহুবর। তথা হইতে কানাডা-প্যাসিফিক রেল লাইন আরম্ভ হইয়াছে। পথে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আসিবার সময়ে স্বামীজী শীতে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন, কারণ, যদিও জগমোহনজী প্রভৃতি আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে কাপড়-চোপড় যথেষ্ট দিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই যে, গ্রীষ্মের সময় সমুদ্রবক্ষে শীত ভোগ করিতে হইবে; সেইজন্য তাঁহার সহিত একখানিও শীতবস্ত্র ছিল না।

যাহা হউক, কোনরূপে বহুবরে পৌছিয়া তথা হইতে ট্রেনে কানাডার মধ্য দিয়া তিনি চিকাগোর পৌছিলেন। ট্রেন সুবিখ্যাত রকিপাহাড় ভেদ করিয়া চলিল; স্বামীজী চতুর্পার্শ্বের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন।

চিকাগোর পৌছিয়া স্বামীজীর অবস্থা কিরূপ হইল, পাঠক কি অনুমান করিতে পারিতেছেন? তখন চিকাগোর বিশ্বমেলা (World's Fair) নামক এক বিরাট মেলা বসিয়াছে। জগতের নানা স্থান হইতে অসংখ্য নরনারী তাহা দেখিবার জন্ত আসিয়াছেন। চতুর্দিকে হড়াহড়ি ঠেলাঠেলি ও লোকের গাঁদা। তাহার মধ্যে স্বামীজীর পরিচিত একটি লোকও নাই। তিনি কোথায় বাইবেন, কি করিবেন, তাহাও কিছু ঠিক হয় নাই। এদিকে তাঁহার অদ্ভুত রকমের বেশ দেখিয়া সকলেই

## স্বামী বিবেকানন্দ

ঘন ঘন তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—কেহ কেহ বিদ্রূপও করিল, কেহ হাততালি দিল, ছোঁড়ার দল তাঁহার পাছু লইল ও নানা প্রকারে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিল। তিনি একে শীতে, অনাহারে অর্জ্জরিত, তাহার উপর এইসকল উৎপাত আরম্ভ হইল। জিনিসপত্র লইয়া পথ-চলা তাঁহার কোনকালে অভ্যাস ছিল না। সুতরাং সেগুলিকে লইয়াও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল। পথে ঘুটেরা যে যেসকল পানির ঠকাইতে লাগিল—যেখানে চারি আনার বেশী খরচ হইবার কথা নহে সেখানে তাঁহার নিকট হইতে চারি টাকা আদায় করিল। এইরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি অবশেষে একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হোটেলের লোকেরা বুঝাইয়া দিল যে, এ অবস্থায় হোটেলে থাকাই তাঁহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ, তিনিও দেখিলেন কথাটা ঠিক। সুতরাং আপাততঃ সেইখানেই উঠিলেন।

চিকাগোর তিনি ১২ দিন রহিলেন ও প্রত্যহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মেলা দেখিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার, বিপুল আয়োজন—পাশ্চাত্য জগতের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, যা-কিছু ভাল, যা-কিছু দর্শনীয় সব সেখানে একত্রিত হইয়াছে—দেশে থাকিতে এ-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতি অস্পষ্ট ছিল; এক্ষণে তিনি দেখিলেন পাশ্চাত্যের ধন-দৌলত ও সভ্যতাগৌরব কল্পনার অতীত।

কিন্তু এত লোকের মধ্যেও তিনি যেন নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ সেখানে একজনও পরিচিত লোক দেখিতে পাইলেন না। তারপর আর এক বিপদ। আমেরিকা ধনীর দেশ—সেখানে খরচপত্র ভয়ানক রকম; হোটেলের খরচ স্বামীজীর পক্ষে অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন এখানে আর কিছুদিন থাকিলেই তাঁহার সম্বল ফুরাইবে। কি করিবেন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া



## আমেরিকায় প্রথম কয়দিন

বিষম চিন্তিত হইলেন। মন দমিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন এদেশে আসিয়া ভাল করি নাই। এক্রূপ ভাবিবার আরও কারণ ছিল। একদিন মেলার অন্তর্গত সংবাদপ্রাপ্তির স্থানে (Information Bureau) ধর্ম-মহাসভা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংবাদ লইতে গিয়া শুনিলেন, সেক্রেটারের পূর্বে সভার অধিবেশন হইবে না, এবং ভালরূপ পরিচয়াদি না থাকিলেও কেহ সভার প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইতে পারে না—আর তাছাড়া প্রতিনিধি-নির্বাচনের শেষ তারিখ গত হইয়াছে। তখন জুলাই মাস—স্বামীজী দেখিলেন সেক্রেটার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে তাঁহার অর্থের অভাব ঘটিবে। বিশেষতঃ ঐ সময়ে আমেরিকায় বিদ্বান ও শিক্ষিত লোকের অনেকেই গ্রীষ্মকাল বলিয়া শহর ছাড়িয়া অগ্ৰত গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে এখন কতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। আর অপেক্ষা করিয়াই বা কি লাভ? যে আশায় তিনি এতদূর আসিয়াছেন, তাহাও পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এখন কিরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—স্থির করিলেন, বেরূপেই হউক শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া যাইবেন। লোকপরম্পরায় তিনি শুনিলেন যে চিকাগো অপেক্ষা বোষ্টনে খরচপত্র ঢের কম পড়ে, আর বোষ্টন শিক্ষিত লোকদিগের একটি প্রধান কেন্দ্র। স্বামীজী স্থির করিলেন, আপাততঃ কিছুদিন বোষ্টনে গিয়া থাকা যাউক, তারপর বাহা হয় হইবে।

এই স্থির করিয়া তিনি বোষ্টন যাত্রা করিলেন। কিন্তু এই সময়ে ভগবান তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন। রেলো যাইতে যাইতে বোষ্টনের সন্নিকটস্থ ব্রিজি মেডোস নামক গ্রামের এক বুদ্ধার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। বুদ্ধা তাঁহাকে আপন আশ্রমে কিছুদিন

## স্বামী বিবেকানন্দ

থাকিবার জ্ঞান অমুরোধ করিলেন। স্বামীজী তাঁহার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধার অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তিনি লোকও মন্দ ছিলেন না। তবে স্বামীজীকে নিম্ন গৃহে লইয়া বাওয়ার তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ, বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখান—প্রাচ্যদেশবাসী জীব কিরূপ অদ্ভুত। দ্বিতীয়তঃ, স্বামীজী একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, ও ধর্মপ্রচারের জ্ঞান ওদেশে গিয়াছেন—সে ধর্মই বা কিরূপ তাহাও দেখা।

যাহা হউক, বুদ্ধার গৃহে থাকাতে স্বামীজীর আর কিছু না হউক এক বিষয়ে খুব স্তুবিধা হইল। চিকাগোর তাঁহার যে প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া খরচ হইতেছিল, সেটা বাঁচিয়া গেল। কিন্তু তথাপি আর একটা মোটা খরচ ছিল—সেটি হইতেছে পোশাক প্রস্তুতের খরচ। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বামীজীর অদ্ভুত রকমের পোশাক দেখিয়া রাস্তার শত শত লোক জমিয়া যাইত। সুতরাং তিনি দেখিলেন এ পোশাক এদেশে চলিবে না। তারপর সম্মুখে শীত আসিতেছে, সেজ্ঞান গরম পোশাক প্রস্তুত করান দরকার। ওখানকার মহিলা বন্ধুরাও পরামর্শ দিলেন যে, তাঁহার পাজীদের ঋতু কাল রংএর লম্বা জামা পরা উচিত, কেবল বন্ধুতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিলেই হইবে। তিনি দেখিলেন যে চলনসই গোছের একটা পোশাক করিতেও ৩০০ টাকার উপর খরচ পড়িবে। কিন্তু কি করা যায়, উপায় নাই। সে-সময়ে সালাম বলিয়া নিকটবর্তী একটি স্থানে এক বৃহৎ মহিলা সভা তাঁহাকে বন্ধুতা দিবার জ্ঞান আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের রমা বাইকে খুব সাহায্য করিতে ছিলেন। স্বামীজী দেখিলেন ও-দেশে মহিলাদের বৈরূপ প্রভাব তাহাতে এই সভা ও এরূপ অত্যাশ্চর্য সভার সহিত পরিচিত হইতে



## আমেরিকায় প্রথম কয়দিন

পারিলে তাঁহার কার্যের খুব সুবিধা হইতে পারে এবং চাই কি তাঁহার আমেরিকা-আগমনের উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে।

আগিম্বার সময় তিনি ১৭২ পাউণ্ড (প্রায় ২৭০০ টাকা) লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিজি মেডোজ হইতে ২০শে আগষ্ট (১৮৯৩) মাস্ত্রাজের শিষ্যদিগকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার হাতে তখন ১৩০ পাউণ্ড ছিল; তবে ঐ পত্র ভারতে পৌঁছবার পূর্বেই তাঁহার সম্বল ৬০।৭০ পাউণ্ডে দাঁড়াইল। বিদেশে হস্তে অর্থ না থাকিলে বা সঙ্গের সম্বল ফুরাইবার মত হইলে কাহার প্রাণে না ভয় হয়? প্রথম প্রথম স্বামীজীরও ঐরূপ ভয় হইয়াছিল। তাই পত্রে দেখি, তিনি লিখিতেছেন, “যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমার ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতোমধ্যে আমিও যে কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাইব তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি—তৎক্ষণাৎ তার করিব। . . . যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্ত টাকা পাঠাইতে না পার, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্ত কিছু টাকা পাঠাইও। ইতোমধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয় আমি লিখিব বা তার করিব। এদেশ থেকে তার করিতে প্রতি শব্দে ৪ টাকা পড়ে।”<sup>১</sup> কিন্তু এই বিপদও নৈরাশ্রে ক্লমিক বিচলিত

১ এই চিঠিখানিতেই কিন্তু তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন, ‘আমি সহজে ছাড়িব না, কারণ আমি শ্রীভগবানের নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছি।’ ইহাধারা বুঝা যায় যে, এইসময়ে তিনি মহাসভায় প্রবেশ লাভ করিবার আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে অন্ত কোনরূপে পাশ্চাত্য দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন এরূপ সংকল্প করিতেছিলেন। যদি আমেরিকায় না হয় অন্ততঃ ইংলণ্ডে যাইবেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

হইলেও তিনি হৃদয়ের বল হারান নাই। অল্প লোক হইলে এক্ষণ অবস্থায় কি করিত জানি না। কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কিঞ্চিৎ আত্মবিস্মৃত হইলেও শীঘ্রই অসাধারণ প্রতিভা ও ধৈর্য্যবলে আপনার পথ আপনি পরিষ্কার করিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে সকল বিষয়ের সুবিধা হইয়া আসিতে লাগিল এবং তিনি ক্রমশঃ আমেরিকার বিশিষ্ট ও মান্য ব্যক্তিবর্গের সহিত পরিচিত হইলেন। ইহার মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক জে. এইচ. রাইট মহোদয় তাঁহার সহিত একদিন চারি ঘণ্টাকাল আলাপ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত বিদ্যা, জ্ঞান ও প্রতিভা-দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন, আমেরিকান জাতির সহিত পরিচয়লাভ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। স্বামীজী এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে যে যে অন্তরায় ঘটিয়াছে তাহা রাইট সাহেবকে খুলিয়া বলিলেন। প্রধান অন্তরায় এই যে, তাঁহাকে কেহ চিনে না শুনে না এবং তিনি যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি, এক্ষণ কোন নিদর্শন তাঁহার নিকট নাই। রাইট সাহেব হাসিয়া বলিলেন, “স্বামীজী, আপনার নিকট নিদর্শন চাওয়া আর সূর্য্যকে তাহার কিরণ দিবার অধিকার কি জিজ্ঞাসা করা একই কথা।” তারপর তিনি নিজে স্বামীজীকে ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত করিবার জন্য যে বন্দোবস্ত করা আবশ্যিক তাহার ভার গ্রহণ করিলেন; তাঁহার সহিত উক্ত সভায় অনেক বিখ্যাত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জ্ঞানাতুলা ছিল। তাহা ছাড়া প্রতিনিধি-নির্বাচন-সভায় সভাপতি তাঁহার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে তিনি লিখিলেন, “ইনি এমন একজন



## আমেরিকায় প্রথম কয়দিন

বিজ্ঞ ব্যক্তি যে আমাদের সকল বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করিলেও ইহার বিজ্ঞার সমকক্ষ হয় না।<sup>১</sup> তারপর স্বামীজীর নিকট অধিক অর্থ নাই বুলিতে পারিয়া তিনি চিকাগোর একখানি টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং প্রাচ্য দেশের প্রতিনিয়োগের থাকিবার ও আহাঙ্গারির ব্যবস্থা করার ভার যে কমিটির উপর ছিল, তাহাদের নিকট পত্র দিলেন। স্বামীজী তাঁহার উপর ঈশ্বরের অপার কৰুণা দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইলেন।

কিন্তু যেমন আলোক-প্রকাশের পূর্বে সময়ে সময়ে দিগ্‌মণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ জগতের সমক্ষে স্বামীজীর বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে আরও কতকগুলি অন্তর্বিধা, দুর্ঘটনা ও লাঞ্ছনা তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বামীজী চিকাগোর যাইবার জন্ত ট্রেনে উঠিলে একজন খনী বণিকের সহিত তাঁহার আলাপ হইল। বণিক তাঁহাকে চিকাগোর কোন্ স্থানে যাইতে হইবে তাহা বলিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রেন হইতে নামিবার সময় ব্যস্ততাবশতঃ সে কথা বিস্মৃত হইয়া স্বামীজীকে সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াই চলিয়া গেলেন। এই বিপদের উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। রাইট সাহেব মহাসভার কার্যস্থলের যে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলেন, স্বামীজী দেখিলেন তাহা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং চিকাগোতে নামিয়া তিনি আবার দিশেহারা হইয়া পড়িলেন, কোথায় যাইবেন ঠিক করিতে পারিলেন না— হু-চার জন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। চিকাগো প্রকাণ্ড শহর, কে কাহার খবর রাখে। তাহার উপর এ জায়গাটা শহরের উত্তর-পূর্ব দিক—কেবল জার্মানদিগের বাস। তাহারা ত স্বামীজীর কথাই বুলিতে পারিল না, অধিকন্তু তাঁহাকে কাক্সী বিবেচনা

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিয়া অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। এদিকে সন্ধ্যাও আগতপ্রায়। তিনি মহা কঁাপরে পড়িলেন, কোন লোক তাঁহাকে একটা হোটেল পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিল না। অগত্যা তিনি নিরাশভাবে রেলের মালগাড়ী রাখিবার প্রাঙ্গণে একটা প্রকাণ্ড খালি বাগ্গের মধ্যে শুইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত রাত্রি জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সেই ভাবে কাটাইয়া দিলেন। হায়, বিধাতার লীলা বুঝা ভার! দুই দিন পরে সমস্ত আমেরিকার লোক যাহাকে দেখিবার জ্ঞাত ছুটাহুটি করিবে, আজ তাঁহার এ কি দশা! বাহা হউক, রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি হৃদোপকূলবর্তী রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলেন। সে রাস্তায় ক্রোড়পতিদিগের প্রাসাদ। তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তোপায় হইয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী ত চিরদিন ভিক্ষুক! ইহাতে আর লজ্জা কি? কিন্তু এ তো আর ভারতবর্ষ নহে যে সাধু-কবির দেখিলেই লোকে তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে! ক্রোড়পতির ভৃত্যেরা তাঁহার মলিন বস্ত্র ও শ্রান্ত ক্লান্ত ধূলিধূসরিত মুর্ত্তি দেখিয়া অবজ্ঞাভরে তাড়াইয়া দিল। কেহ কেহ অপমানও করিল, কেহ বা তাঁহাকে দেখিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল। “ওগো, ভিক্ষা না দাও, ধর্ম্মমহাসভা-কার্যালয়ের ঠিকানাটা ত বলিয়া দাও।” কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তিনি অবসন্নহৃদয়ে পথের ধারে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময়ে সম্মুখের সুরম্য হর্ম্ম্য হইতে এক রমণী নির্গত হইয়া আসিলেন এবং স্বামীজীকে তদবস্থায় দেখিয়া স্মৃষ্টিস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, আপনি কি ধর্ম্মমহাসভার একজন প্রতিনিধি?” স্বামীজী বলিলেন, “হাঁ, তাহাই বটে, কিন্তু আমি ঠিকানা হারাইয়া ফেলিয়া এইরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি।” রমণী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার



## আমেরিকায় প্রথম কন্নদিন

পশ্চাদনুসরণ করিতে বলিলেন, ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভৃত্যদিগকে স্বামীজীর যথোচিত সেবা-গুণ্ণা করিতে আদেশ দিলেন এবং আহারাতির পর শরীর স্নান হইলে স্বামীজীকে লইয়া স্বয়ং ধর্মসভার কার্যস্থলে বাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। স্বামীজী বিধাতার কার্য দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে তিনি এই মাতৃরূপিণী রমণীর পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বামী সন্তানাদির সহিত বিশেষ বন্ধুত্বস্বত্বে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রমণী মিঃ জর্জ ডব্লিউ. হেল্ নামক চিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী।

এই ঘটনার স্বামীজীর দৃঢ় প্রতীতি হইল, প্রভু অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন।

তারপর যথাকালে মিসেস্ হেল তাঁহাকে লইয়া মহাসভার কার্যালয়ে গমন করিলেন। স্বামীজী তাঁহার পরিচয় পত্র দেখাইয়া প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইলেন এবং মহাসভার অগ্রাঙ্ক প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের সহিত একত্র থাকিতে পাইলেন।

## চিকাগো ধর্মমহাসভা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা দশ ঘটিকার সময় চিকাগো ধর্ম-মহাসভার প্রথম অধিবেশন হইল। এই সভা নানা কারণে জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বামীজী স্বয়ং একস্থানে লিখিয়াছেন—

“চিকাগো মহাসভা এক বিরাট ব্যাপার ছিল। সে সভায় নানাদেশের ধর্ম-প্রচারকমণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। চিকাগো মহামণ্ডলীতে ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন; ভরসা, প্রোটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের উপর অধিকার বিস্তার; তৎসমগ্র খ্রীষ্টান জগৎ—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গকে উপস্থিত করাইয়া স্ব-মহিমা-কীর্তনের বিশেষ সুযোগ নিশ্চিত করিয়া ছিলেন...।” —‘ভাববার কথা’

প্রকৃতই চিকাগো মহাসভার সভ্যজগতের বিদ্বৎসমাজাদৃত অধিকাংশ পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইয়াছিলেন এবং প্রথমে এই সভা-আহ্বানের উদ্দেশ্য বাহাই থাকুক, পরিণামে ইহা অতি অল্পত অচিন্ত্যপূর্ব ও মহা-ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহাতে পাশ্চাত্য ধর্ম ও সভ্যতার সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার তুলনা করিবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে এক নূতন চিন্তাতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। একথা এখন সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মহাসভার পর হইতে সমগ্র মানবজাতির ধর্মদৃষ্টি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক মতবাদের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়াছে। উক্ত সভার বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতি মাননীয় মিঃ মারউইন মেরী মেল লিখিয়াছেন—



## চিকাগো ধর্মমহাসভা

“মহাসভা হইতে খ্রীষ্টীয় জগৎ, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা এই একটি মুখ্য ফল ও মহৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম ব্যতীত জগতে আরও এমন বহু বরণীয় ধর্ম আছে, যেগুলি দার্শনিক গভীরতা, তত্ত্বানুপ্রবেশ, স্বাধীন ও সতেজ চিন্তাশীলতা এবং সর্বজীবের প্রতি মনুষ্যোচিত উদারতা ও অকপট মমতার খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, অথচ বাহ্যদের নীতির সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা এক তিল নূন নহে। সভায় এইরূপ আটটি খ্রীষ্টের ধর্মের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন, যথা—হিন্দুধর্ম, জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, রাহদীধর্ম, কংফুছোর ধর্ম, শিন্তোধর্ম, মহম্মদীয় ধর্ম ও পারসিক ধর্ম।”

উক্ত চিরস্মরণীয় সোমবার দিবস চিকাগোর শিল্পপ্রাসাদ (Art Institute) নামক ভবনের স্নরুহৎ হলে (Hall of Columbus) এই সভার অধিবেশন হইল। প্রথমে ডাঃ ব্যারোজ মহোদয় দুই-চারিটি কথা বলিয়া সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে যথারীতি ভগবৎপ্রার্থনা-পূর্বক সভার কার্য আরম্ভ হইল। সে এক গম্ভীর দৃশ্য! মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত একশত বিশ কোটি নরনারীর প্রতিনিধিরূপে গ্রায় ছয়-সাত সহস্র মহামহাপণ্ডিত সে স্থানে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যস্থলে উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া পাশ্চাত্যজগতে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মনারক কার্ডিনাল গিবন্স—তাঁহার বামে ও দক্ষিণে উপবিষ্ট বিচিত্রবেশী প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিগণ। বিবেকানন্দও ইহাদের মধ্যে একজন—তাঁহার অপেক্ষ উজ্জল লোহিত বর্ণের আংরাখা, মস্তকের প্রকাণ্ড গৈরিক উকীষ ও মুখমণ্ডলের অপূর্ব দীপ্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; তাঁহার পার্শ্বে ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ মজুমদার ও নাগরকার এবং সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্মপাল; ইহা ছাড়া রোমান

## স্বামী বিবেকানন্দ

ক্যাথলিকদের শত শত আর্কবিশপ, বিশপ, ধর্মতত্ত্ববিৎ ও ধর্মযাজক এবং জগতের প্রধান প্রধান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতমণ্ডলী। এই অভূতপূর্ব ব্যাপারের আয়োজন করিতে কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল এবং এই সভায় সহস্রাধিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, ইহা হইতেই পাঠক এই ব্যাপারের গুরুত্ব কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে বিবেকানন্দের স্থান ত্রিশ জনের পর নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

এইরূপ বিপ্লবাত্মক জনসভার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিতে অতি বড় বক্তারও হৃৎকম্প হওয়া বিচিত্র নহে। সেক্ষেত্রে ত্রিশৎবর্ষব্যয় নগণ্য বিদেশী যুবকের পক্ষে উপরি উক্ত সভার সম্মুখীন হওয়া কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য পাঠক একবার অনুমান করুন। স্বামীজী ব্যাপারটাকে প্রথমে যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন উহা তত সহজ নহে। তাঁহার পূর্ববর্তী বক্তাগণের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। কিন্তু তিনি সঙ্কোচবশতঃ বলিলেন, “না, এখন নহে।” এইরূপ উপস্থাপন করিলে তাঁহাকে আহ্বান করা হইল, কিন্তু তিনি প্রত্যেকবারেই ‘এখন নহে’ বলিয়া কাটাইয়া দিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া সভাপতি মহাশয়ের বিশ্বাস হইল না যে তিনি আর বক্তৃতা করিবেন। অবশেষে অপরাহ্নের শেষযুগ্তে সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, এইবার উঠিতেই হইবে নতুবা তাঁহাকে আর সময় দেওয়া হইবে না। তখন স্বামীজী আর নিশ্চেষ্ট থাকি অবিধেয় বিবেচনায় আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল তখন রক্তিমভা ধারণ করিয়াছে। তিনি একবার সেই বিশাল জনসম্মেলনের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নেত্রপাত করিলেন, তারপর দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে প্রণামপূর্বক সভাস্থ



## চিকাগো ধর্মমহাসভা

নরনারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "Sisters and Brothers of America" (আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ)। যেমন এই কয়টি কথা উচ্চারণ করা, অমনি চতুর্দিক হইতে মহাশব্দে করতালি-নিবাদের আরম্ভ হইল। সে শব্দে কর্ণবধির হইবার উপক্রম! সকলেই প্রচলিত পন্থানুসারে Ladies and Gentlemen (ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ) বলিয়া সমবেত সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, সুতরাং এই নূতন সম্বোধনে যেন সকলের হৃদয়ের সহিত বক্তার হৃদয়নিহিত অপূর্ণ প্রেমভাবের সংযোগ-সাধন হইল। তাঁহারা মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র মানবজাতির একত্ব অনুভব করিলেন। সেই উৎসাহস্রোত থামিতে চাহে না। শত শত লোক দাঁড়াইয়া উঠিল এবং প্রচণ্ড করতালিনিবাদের গৃহভিত্তি কম্পিত করিয়া তুলিল। স্বামীজী ত কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এ কি হইল! লোকগুলি কি ক্ষেপিয়া গেল নাকি? তিনি এক মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধিপ্রায় নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই জ্ঞান হইল সবই আত্মশক্তির লীলা, বুঝিলেন মহাশক্তি স্বয়ং তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সাহায্য করিতেছেন। অমনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাহস ফিরিয়া আসিল, অন্তর শতগুণ বলে ভরিয়া উঠিল, হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া বক্তৃতার উৎস ছুটিল। কিন্তু প্রথম দুই মিনিট তিনি বারংবার চেষ্টা করিয়াও প্রোত্বর্গের উৎসাহ থামাইতে পারিলেন না। তারপর যখন সকলে স্থির হইল তখন তিনি ধীর গভীর স্বরে প্রাণম্পর্শী ভাষায় আপনার বক্তব্য শেষ করিলেন। প্রথম দিন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও উহার ঞ্চার উদার, বিশ্বজনীন ভাব কোন বক্তৃতায় লক্ষিত হয় নাই। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক দুই-চারি কথা বলিয়াছিলেন,

## স্বামী বিবেকানন্দ

কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতায় সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিলেন, “সকল ধর্মের গন্তব্য স্থান এক।” তিনি ধর্মের যে বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব পরমহংসদেবের চরণোপান্তে বসিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই সেদিন সুপরিষ্কৃষ্টভাবে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র সভার অধিকাংশ লোক তাঁহার অনুরাগী ও তদীয় মতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী তাঁহার পদানত হইল। জগতের ইতিহাসে বিনা রক্তপাতে এরূপ অদ্ভুত বিজয়লাভের কাহিনী আর কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু একজন কপর্দকশূন্য, নিঃসহায় তরুণ গম্ভ্যাসী ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকিত পৃথিবীতে সে অসাধ্য সাধন করিলেন।

প্রথম দিন বক্তৃতার পর ‘আমাদিগের মধ্যে মতভেদ কেন?’ শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা ব্যতীত স্বামীজী ১৯শে সেপ্টেম্বরের পূর্বে আর কোন বক্তৃতা দেন নাই। ১৯শে তারিখে তিনি তাঁহার হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ইহাতে ধর্ম, দর্শন ও মনস্তত্ত্বের সারভাগ অতি পরিষ্কারভাবে আলোচিত হইয়াছিল। স্বামীজী ব্যতীত সভায় অল্প ভারতবাসী বা বাঙ্গালী কেহ যে ছিলেন না তাহা নহে, কিন্তু একমাত্র তিনিই প্রকৃত সর্ববাদিসম্মত, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্মের মুখপাত্রস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব-দর্শনের উপায় নির্দেশ করিলেন ও ধর্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জ্ঞাতিসকলের বহু ভ্রান্ত সংস্কারের অপনোদন করিলেন। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—

(১) মনুষ্যমাত্রই আত্মা, সূত্রাং স্বরূপতঃ মনুষ্য ও পরমাত্মার কোন প্রভেদ নাই। (ইহার দ্বারা ঋগ্বেদধর্মের “জীবমাত্রেই স্বভাবতঃ পাপী” এই মত নিরস্ত হইয়া মনুষ্যের দেবত্ব প্রতিপাদিত হইল।)



## চিকাগো ধর্মমহাসভা

(২) সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত এবং বিশ্বপ্রসবিনী শক্তি (Cosmic Energy) মোটের উপর ভ্রাসবুদ্ধিহীন। সুতরাং স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুইটি সমান্তরাল রেখার ত্রায় পাশাপাশি চলিয়াছে। (ইহার দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, এই মত খণ্ডিত হইল।)

(৩) বংশপরম্পরাগত ভাব নিজ নিজ অতীত মানসিক সংস্কারের ফল। শরীরের সহিত উহার কোন সংশ্রব নাই। বরং চেষ্টা করিলে অতলম্পর্শ মনঃসমুদ্র আলোড়ন দ্বারা পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনাবলী স্মৃতিপথে পুনরুদ্ভূত করা বাইতে পারে। সুতরাং জাতিস্মরণতা অসম্ভব নহে। (ইহার দ্বারা পুনর্জন্মবাদের আভাস প্রদত্ত হইল।)

(৪) ধর্ম কেবল মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, অনুভূতিসাপেক্ষ।

কিন্তু যুক্তি-তর্ক-সাহায্যে এইসকল নূতন ধর্মতত্ত্ব অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিলেও স্বামীজীর বক্তৃতায় কোন বিষয়িণ্ড সমালোচনা বা কোন ধর্মের প্রতি অবধা তীব্র আক্রমণ ছিল না। সকল ধর্মের প্রতি উদার ভাবপোষণ, সকলের সহিত একযোগে মানবাত্মার কল্যাণসাধন, পরস্পরের মধ্যে বাহা কিছু সং, শুভ ও পবিত্র তাহার আদান-প্রদান দ্বারা সকলকেই সেই এক লক্ষ্যে উপনীত হইতে সহায়তাকরণ—ইহাই তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিশেষত্ব ছিল। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি শল্যের দ্বারা অপরকে আহত করিবার চেষ্টা করেন নাই, বরং স্নেহ-মধুর কণ্ঠে সকল বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে এক দৃঢ় ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষ দিবসে অর্থাৎ ২৭শে তারিখে স্বামীজী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন—

“খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিতে

## স্বামী বিবেকানন্দ

হইবে না বা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেককে নিজের বিশেষত্ব ত্যাগ না করিয়া অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইবে। উন্নতি বা বিকাশের নিয়মই এই।

“ধর্মমহাসভা যদি জগৎকে কিছু দেখাইয়া থাকে, তবে তাহা এই— পবিত্রতা, উদারতা, চিন্তাশুদ্ধি প্রভৃতি সদগুণসমূহ কোন ধর্মেরই নিজস্ব নহে এবং প্রত্যেক ধর্মেই উন্নতচরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ স্বপ্নেও ভাবেন যে, সকল ধর্ম উচ্ছিন্ন হইবে, শুধু তাঁহারটিই থাকিবে, তবে আমি সর্বাস্তঃকরণে তাঁহাকে করুণার পাত্র বিবেচনা করি এবং এই কথা বলি যে, শীঘ্রই দেখিবেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণসত্ত্বেও সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে, ‘সমর নহে—সহায়তা!’ ‘বিনাশ নহে—বরণ !!’ ‘দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি !!!’”

তিনি কাহারও প্রাণে আঘাত করিয়া একটি কথাও বলেন নাই, বরং সকলের জ্ঞানদৃষ্টি প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি কোন দার্শনিক জটিলতার অবতারণা করেন নাই; সহজ সরল দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুবোধ্য ভাষায় আপন বক্তব্যগুলি সকলের নিকট পরিষ্কৃত ও সুগম করিয়াছিলেন। আর একটি কথা—তিনি কোন মতবাদপ্রচারের চেষ্টা করেন নাই। অপরকে জোর করিয়া নিজমত গ্রহণ করানো চিরদিনই তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এখানেও তিনি তাঁহার অগ্রথা করেন নাই। সাধারণতঃ সকল ধর্মসম্প্রদায়ই লোকের অন্ধ বিশ্বাসের উপর আপনাদিগের মত প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হন। তাঁহারা বলেন, “তাহা না হইলে ধর্মজীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না”; কিন্তু স্বামীজী ঠিক তাহার বিপরীত করিলেন। তাঁহার বক্তৃত্তা আগাগোড়া আধ্যাত্মিক



## চিকাগো ধর্মমহাসভা

মনস্তত্ত্ব (Spiritual psychology) পূর্ণ ছিল। তিনি ব্যাইলেন যে ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে কোন একটা মতের স্বপক্ষে মত দিলেই বা ঐ মত 'বিশ্বাস করি'—এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হয় না, প্রকৃতপক্ষে ঐ মতানুযায়ী জীবনযাপন করিয়া ঐ মত যথার্থ কি না তাহা নিজ অনুভূতির দ্বারা জানিতে হয়। প্রথমে বিশ্বাস, পরে বোধ, অনুভূতি ও সাক্ষাৎ দর্শন। যে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছে সেই প্রকৃত সাধু। এইরূপে তিনি স্বীয় অলৌকিক তত্ত্বদর্শন-সাহায্যে ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন ও নিগূঢ় বিষয়গুলি সকলের গোচর করিলেন।

এই বক্তৃতার ফল কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার সময় আজও উপস্থিত হয় নাই। তবে এটা ঠিক যে ইহার পর হইতে পাশ্চাত্যজাতিসমূহের মধ্যে ধর্ম জিনিগটি সম্পূর্ণ নূতনাকার ধারণ করিয়াছে। তাহা না হইলে কি আজ আমরা লণ্ডনের সেন্টপল চার্চ নামক সুবিখ্যাত ধর্মমন্দিরের ছায়াতলে ও আমেরিকার প্রধান প্রধান ভজনালয়ে পুনর্জন্মবাদ ও মনুষ্যের দেবত্ববিষয়ক কথা শুনিতে পাইতাম? কখনই নহে। এ হিসাবে বলিতে পারা যায় তিনি নব্য ইউরোপী ধর্মশাস্ত্রের জন্মদাতা এবং মূল্যতঃ তাঁহারই প্রভাবে ধর্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সত্য বটে, খ্রীষ্টধর্ম জগৎ হইতে এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার উপদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্মানায়কগণ তাঁহাদের ধর্মকে নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন এবং বহুলপরিমাণে তাঁহার আদর্শসমূহকে ঐ ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন।

কিন্তু আমাদের নিকট ইহাই স্বামীজীর বক্তৃতার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল নহে। আমরা দেখি, তিনি এই বক্তৃতার দ্বারা আধ্যাত্ম, আধ্যাত্মিকতা ও আধ্যাত্মিক জগতের চক্ষে উন্নত, সম্মানার্থ ও পূজ্যপদ করিয়া তুলিয়াছেন। যে হিন্দু

## স্বামী বিবেকানন্দ

ভোগদৃষ্ট পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট নগণ্য ক্ষুদ্র হেয় ও লাঞ্ছনার পাত্র ছিল, তাহাকে তিনি অবমাননার পঙ্করাশির মধ্য হইতে উদ্ধার করিয়া মহোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। জগৎ বুঝিয়াছে—হিন্দু পদদলিত হইলেও অবজ্ঞের নহে, দীন-দরিদ্র হ্রত-সর্বস্ব হইলেও পারমার্থিক সম্পদে হীন নহে, বরং অতুল রত্নরাশির অধীশ্বর, অনন্ত গৌরবের অধিকারী, বিশ্বের গুরুপদে সমাসীন হইবার যোগ্য। তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে সমগ্র হিন্দুধর্ম বলিয়া প্রচার করিলেন না, কিন্তু দেখাইলেন যে, ধর্মের আরম্ভ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ও চরম পরিণতি বেদান্তে এবং বাহ্য বিভিন্ন আদর্শের মধ্য দিয়া বহুদিকে বহুভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত এক অখণ্ড সনাতন হিন্দুধর্ম—শুধু হিন্দুধর্ম নহে, তাহাই বিশ্বব্যাপী মানবধর্ম—কারণ তাহা সমুদয় মানবের আকাজক্ষা পূর্ণ করিতে, সকলের প্রাণে আশার আলোক জ্বালিতে, সকল ছন্দনের ব্যথাভুকা নিবারণ, বন্ধন ছেদন ও দৈন্ত-কাতরতা দূর করিতে সর্বতোভাবে সমর্থ।

তাঁহার ইংরেজী চরিতাখ্যানকগণ লিখিয়াছেন—“চিকাগোর বিরাট ধর্মসভায় স্বামীজী যে মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন, যে অদ্ভুত আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, খ্রীষ্টের পর আর কোন প্রাচ্যজগৎদ্বাসীর নিকট ওদেশের লোক তেমন কথা শুনে নাই। তাঁহার ভাবরাশি চিরদিন পাশ্চাত্যের ধর্মোন্নতি ও ধর্মবিস্তারের সহায়করূপে গণ্য হইবে এবং জগতের ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ গৃহীত হইবে।”

কথাগুলি বাস্তবিক প্রতিবর্ণে সত্য। কারণ স্বামীজীর পূর্বে যদিচ কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ত্রায় খ্যাতনামা বক্তাগণ পাশ্চাত্যদেশে ধর্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের বক্তৃতায় তাদৃশ ফল হয় নাই, অর্থাৎ তাহাতে হিন্দুধর্মের গৌরবপ্রচারের বিন্দুমাত্র



## চিকাগো ধর্মমহাসভা

সাহায্য হয় নাই। ইহার দুইটি কারণ অনুমিত হয়। প্রথমতঃ, তাঁহারা কেহই স্বামীজীর মত নির্ভীক ভাবে হিন্দুধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন নাই—তাঁহাদের বক্তৃতার অধিকাংশ ভাগ খ্রীষ্টের গুণগানে পূর্ণ থাকিত, আর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ছ-চার কথা বাহা বলিতেন তাহাও নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজাকে বাদ দিয়া এবং ওদেশের ধর্মবিশ্বাসের সহিত মিল রাখিয়া। এক কথায়, তাঁহারা হিন্দুধর্মকে ইউরোপী পোষাক পরাইয়া ও কাটছাঁট করিয়া ওদেশের লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং ওদেশের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের হিন্দুধর্মজ্ঞানের গভীরতার উপর তাদৃশ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর একবার কথাপ্রসঙ্গে প্রতাপ বাবুর নিকট একটা সুদীর্ঘ শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি করিয়া উহার মনোহারিত্বের প্রশংসা করিতে থাকেন। তৎপূর্বে তিনি আরও দু-একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তখন প্রতাপ বাবু 'হাঁ' 'না' করিয়া সায় দিয়া বাইতে ছিলেন। কিন্তু সহসা এক্রূপ সুদীর্ঘ বাক্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে আহুত হইয়া তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। অগত্যা তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, তিনি সংস্কৃত ভাষা ভালরূপ জানেন না। ধর্মযাজক শাস্ত্রের অর্থ জানেন না ওনিয়া মোক্ষমূলর অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। আর একবার আমেরিকার এমার্সনের শ্রাদ্ধবাসরস্মৃতি উপলক্ষে একটি সভায় প্রতাপ বাবুকে গীতার একখানি ইংরেজী অনুবাদের স্থলবিশেষ দেখাইয়া উহার মূল শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সেবারও প্রতাপ বাবু বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই সকল কারণে ওদেশের লোক হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ইহাদের নিকট বিশেষ কিছু শিখিবার আছে ইহা ধারণা করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীই

## স্বামী বিবেকানন্দ

প্রথম ত্যাগবৈরাগ্যের কথা ওদেশে শোনান এবং অসঙ্কোচে যুক্তিপূজার সমর্থন করেন। তিনি পরচ্ছন্দানুবর্তন করিতে জানিতেন না বা নিন্দা-প্রশংসা গ্রাহ্য করিতেন না, তাই অকপট ভাবে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে হিন্দুধর্মের মধ্যে বাহ্য খাঁটিসত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহাই প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী গুরুদাস নামক তাঁহার একজন শেতাজ ভক্ত বলিতেন, “তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল অগতের লোককে জ্ঞানদান করা”; আর একজন শেতাজ ভক্তলোক বলিতেন, “মানুষকে মানুষ গড়িয়া তোলা”—বাস্তবিক উভয়ের কথাই সত্য।

১৯শে সেপ্টেম্বর ‘হিন্দুধর্ম’ নামক প্রবন্ধপাঠের পর ২০শে তারিখে স্বামীজী ‘ধর্মই ভারতের প্রকৃত অভাব নহে’ শীর্ষক আর একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি দুই-এক কথায় বুঝাইয়া দেন যে, ভারতে ধর্মের অভাব আদৌ নাই, প্রকৃত অভাব অর্থের। উপসংহারে বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট নির্ধন ভারতের জন্ত সাহায্য-প্রার্থনার উদ্দেশ্যেই তাঁহার ওদেশে পদার্পণ। মহাসভার সভ্যগণ দেখিলেন তিনি শুধু ধর্মরহস্তবেত্তা ও দার্শনিক নহেন, সঙ্গে সঙ্গে মহা স্বদেশ-প্রেমিক।

২২শে তারিখ মহাসভার বিজ্ঞানশাখার সমক্ষে তিনি দুইটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন—পূর্বাহ্নে ‘নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম ও বেদান্তদর্শন’ এবং অপরাহ্নে ‘ভারতের আধুনিক ধর্মসমূহ’। ঐসকল বিষয় পুনরালোচনার জন্ত ২৩শে তারিখেও আর একটি বৈঠক বসিয়াছিল। ২৫শে অপরাহ্নে তিনি ‘হিন্দুধর্মের সারতম্ব’ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এইগুলি ব্যতীত বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনসমূহে আরও চারিটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

২৬শে তারিখে তিনি মহাসভার ‘বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ক্রমপরিণতি’ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন।



## চিকাগো ধর্মমহাসভা

পূর্বে বলিয়াছি মহাসভায় এক সহস্রেরও অধিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। সতর দিন ধরিয়া শুধু প্রবন্ধপাঠই চলিয়াছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য আধঘণ্টা করিয়া সময় নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু স্বামীজীকে তদপেক্ষা অনেক অধিক সময় দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিদিন বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পঠিত হইত; মধ্যে কেবল খাইবার জন্য আধঘণ্টা বিশ্রাম। সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই নীরস ও অসার, সুতরাং অনেকসময় শ্রোতৃবর্গ শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই সময়ে সভাপতি মহাশয় সকলকে জানাইয়া দিতেন, “সবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ ৫।১০ মিনিট বক্তৃতা করিবেন।” ইহাতে সেই বিরাট জনসম্মত অসীম সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্বক শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিত—স্বামীজী তাঁহাদের এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে ‘বঠন ইভিনিং ট্রান্সক্রিপ্ট’ নামক সংবাদপত্র লিখিয়াছিলেন—“ধর্মমহাসভার অধ্যক্ষেরা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বিবেকানন্দকে রাখিয়া দিতেন। যদি কোন গ্রন্থের দিন কোন নীরস বক্তা বৈশিষ্ট্য ধরিয়া বকিলে শত শত লোক চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিত, সভাপতি অমনি উঠিয়া বলিতেন, ‘স্বস্তিবাক্য-উচ্চারণের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিবেন।’ আর কথা নাই, সেই শত শত ব্যক্তি শান্তভাবে অপেক্ষা করিতেন। এইরূপে কলহস হলের চারি সহস্র শ্রোতা শেষকালে বিবেকানন্দের পনের মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহস্র বদনে জুই বণ্টা হাঁ করিয়া বলিয়া থাকিত ও অবিরাম পাখা নাড়িত। সভাপতি ‘যত শেষ তত বেশ’—এই প্রচীন নীতিটি বেশ বুঝিতেন।”

## মহাসভার অধিবেশনান্তে

এইরূপে স্বামীজী চিকাগো মহাসভার একজন অপরিচিত সম্মানী হইতে সহসা বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষরূপে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার নাম লোকের মুখে মুখে বিরাজ করিতে লাগিল। তাঁহার পূর্ণায়তন প্রতিকৃতিসমূহ চিকাগো শহরে নানা স্থানে প্রদর্শিত হইতে লাগিল—উহাদের নিম্নে লেখা ছিল ‘ভারতের হিন্দু সম্মানী বিবেকানন্দ’। শত শত পথিক ভ্রমণকালে ঐসকল চিত্রের নিকট গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইত এবং মস্তক অবনত করিয়া করবোধে চিত্রলিখিত মূর্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। সংবাদপত্রসমূহ শতমুখে তাঁহার প্রশংসা ও যশোগান করিতে লাগিল। রাজধানীর সর্বাপেক্ষা গোড়া কাগজওয়ালাও তাঁহাকে একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিল। ওদেশে প্রতিষ্ঠাপন্ন সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে ‘নিউইয়র্ক হেরাল্ড’র তুল্য গোড়া কাগজ আর নাই; তাহাতেও লিখিল—“ধর্ম্মমহাসভার ইনিই নিঃসন্দেহে সর্বপ্রধান ব্যক্তি। ইহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মুশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক-প্রেরণ কতদূর নির্বুদ্ধিতা তাহা বেশ বুঝিতেছি।”

এক বিবেকানন্দকে দেখিয়া তখন তাহার সমস্ত ভারতবাসীকে ‘পণ্ডিতের জাতি’ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে! আর কি গভীর নৈরাশ্র-ব্যাঞ্জক স্বর!—‘পাদ্রী-ফাদ্রী পাঠানো আর চলবে না!’

‘দি বষ্টন ইভিনিং ট্রান্সক্রিপ্ট’ লিখিলেন—“তাঁহার প্রচারিত ভাবসমূহের মহত্বের জ্ঞান এবং চেহারার গুণে তিনি ধর্ম্মসভার একজন বিশেষ প্রিয়-পাত্র। যদি তিনি শুধু মঞ্চের উপর দিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলেই



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

করতালিধ্বনি হইতে থাকে। অথচ সহস্র সহস্র ব্যক্তির নিকট হইতে এই বিশেষ সমাদর ইনি ঠিক বালকের ত্রায় সরলভাবে গ্রহণ করেন, তাহাতে আত্মাভিমানের লেশমাত্র থাকে না।”

বাস্তবিক তাঁহার বালমূলভ অকপটতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এত বড় পণ্ডিত, এত নাম যশ, অথচ কিছুমাত্র অভিমানের চিহ্ন নাই। একরূপ দৃশ্য বড় বিরল। তাই স্বামীজী একবার বঠনে বেড়াইতে গেলে উক্ত পত্র আবার লিখিয়াছিলেন—বিবেকানন্দ প্রকৃতই একজন মহৎ ব্যক্তি—সরল, অকপট এবং অগাধ পণ্ডিত—তাঁহার এত পাণ্ডিত্য যে আমাদের দেশের খুব কম পণ্ডিতই তাঁহার সহিত তুলনায় দাঁড়াইবার যোগ্য। ‘দি প্রেস অব্ আমেরিকা’ লিখিলেন—“ভারতের অতীত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন প্রিয়দর্শন ও তরুণ-বয়স্ক আচার্য্য বিবেকানন্দ মহাসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তথায় বহু বিশপ ও প্রায় প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্মোপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তৎপ্রভাবে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। এই মহাপুরুষের বাগ্মিতা, তাঁহার মুখনিঃসৃত অপূর্ব বুদ্ধিজ্যোতিঃ, এবং তাঁহার চিরসম্মানিত ধর্মের সৌন্দর্য্য-বর্ণনকল্পে তিনি যে সুন্দর ইংরেজী বলেন—সমস্ত একত্রিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনে এক গভীর ভাব সঞ্চার করিয়াছে।”

‘দি ইন্টিরিয়র চিকাগো’ লিখিলেন—“ইনিই সেই ব্যক্তি যাহার প্রশংসা-ধ্বনিতে মহাসভায় সর্বোপেক্ষা অধিক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয়ে বাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সভামধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।”

‘দি নিউইয়র্ক ক্রিটিক্’ লিখিলেন—“বক্তৃতাক্ষমতা তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। তাঁহার গৈরিক বসনাবৃত প্রতিভাবীর্ণ মুখমণ্ডল যেমন চিত্রবৎ

## স্বামী বিবেকানন্দ

মনোরম, তাঁহার কণ্ঠস্বরও তেমনি বীণাধ্বনিবৎ সুমধুর। কথাগুলি শুনিলেই বুঝা যায় অন্তস্তল ভেদ করিয়া উঠিতেছে।”

অত্যাশ্চর্য বহু পত্রিকার দ্বারা এই পত্রিকাও স্বামীজীর সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

‘রিভিউ অব্ রিভিউজ্’ তাঁহার বক্তৃতাকে বলিয়াছিল অতি মহৎ ও উচ্চভাবপূর্ণ। এরূপ আরও শত সহস্র সাময়িক পত্র তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তার প্রশংসাসূচক কথা লিখিয়াছিল। তৎসমুদয় এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা নিশ্চয়োজ্ঞন। তবে যে সকল আমেরিকাবাসী মনস্বী পুরুষ তাঁহার সম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে দুই জনের অভিমত এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

মাননীয় মিঃ মারউইন মেরি স্নেল লিখিয়াছিলেন—“আর কোন ধর্মই ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে নাই, এবং এই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। মহাসভায় ইহার প্রভাব ও আদর যে সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইনি প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন—খাস মহাসভায় ত বটেই এবং উহার বৈজ্ঞানিক শাখার অধিবেশনসমূহেও (যাহাতে সভাপতি হইবার সম্মান আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল); এবং প্রত্যেকবারই খ্রীষ্টান, অখ্রীষ্টান সকল বক্তা অপেক্ষা লোকে তাঁহাকেই বিশেষ সম্মম সহকারে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তিনি যেদিকে যাইতেন সেই দিকেই লোকের ভিড় হইত এবং তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথাটি শুনিবার জন্য লোকে উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত। খ্রীষ্টানদের মধ্যে যাহারা সব চেয়ে গোঁড়া তাঁহারাও বলেন ‘বাস্তবিক ইনি নরকুলের অলঙ্কারস্বরূপ।’”

মহাসভায় জেনারেল কমিটির সভাপতি রেভারেন্ড ব্যারোজ মহোদয়ও



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

বলিয়াছেন—“স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।”

উপরোক্ত অভিমতসমূহ হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, আমেরিকার অধিবাসিগণের মনের উপর স্বামীজী কিরূপ আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এখন হইতে তাঁহার আর কোন অভাব বা কষ্ট রহিল না। আমেরিকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে নিজ নিজ গৃহে লইয়া বাইবার জ্ঞাত পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনকুবেরদিগের গৃহদ্বার তাঁহার জ্ঞাত উন্মুক্ত হইল। সকলেই তাঁহার সঙ্গ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া একান্ত চিন্তে উহা প্রার্থনা করিতে লাগিল ও তাঁহার দর্শনলাভে বা মুখের একটি কথা শ্রবণ করিয়া জীবন যত্ন জ্ঞান করিতে লাগিল। স্বামীজী স্বয়ং এসম্বন্ধে ২রা নবেম্বর চিকাগো হইতে লিখিয়াছিলেন—

“আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব! আমার এক্ষণে কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি, আর ইউরোপে যাইতে আমার যে খরচ লাগিবে তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। . . . আমার পোশাক প্রভৃতির জ্ঞাত যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ পাউণ্ড আছে। আর আমার বাটীভাড়া বা খাই খরচের জ্ঞাত এক পয়সাও লাগে না। কারণ ইচ্ছা করিলেই এই শহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাটীতে আমি থাকিতে পারি। আর—আমি বরাবরই কাহারও না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত

## স্বামী বিবেকানন্দ

অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না।” (ইংরেজীর অনুবাদ—পত্রাবলী)।

পাঠক! এই সেই বিবেকানন্দ যিনি কিছুদিন পূর্বে পরিব্রাজক ভিখারীর বেশে ভারতের পথে পথে ঘুরিয়াছিলেন, যিনি সেদিনও প্রথম আমেরিকাতে আসিয়া অর্থাভাবে দারুণ অনিশ্চিত অবস্থায় পতিত হইয়া ভারতে সাহায্য প্রার্থনার জন্ত তার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। হায়! সেদিন কে জানিত যে আজ যিনি অর্থাভাবে এত কাতর ও চিন্তিত হইয়াছেন শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যেদিন তিনি আর অর্থের জন্ত আকুল হইবেন না, বিশ্বের অর্থ সম্পদই তাঁহার পদতলে লুটাইবার জন্ত লালায়িত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইবে! সত্যই এইরূপ হইয়াছিল। অধিক আর কি বলিব, স্বামীজীর অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে মোহিত হইয়া আমেরিকার বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় কুলনারী তাঁহার অনুরাগিণী এবং কেহ কেহ এমন কি তাঁহার পাণিপ্রার্থিনী পর্যন্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই অনন্ত ভোগসুখ করায়ত্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু সে প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার নয়নবহ্নিতে মদন ভঙ্গ হইয়াছিল সেই শঙ্কর-তুল্য তেজস্বী পুরুষ কামনার দাস ছিলেন না। একথা বোধ হয় এখন কাহারও অবিদিত নাই যে, এক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী এই সময়ে বিনীতভাবে তাঁহার পদে আপনার রূপযৌবন ও অগাধ ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করিবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী উত্তরে তাঁহাকে শুধু একটি কথা বলিয়াছিলেন, ‘ভদ্রে, আমি যে সন্ন্যাসী, নিখিলের সমস্ত রমণীই যে আমার মা।’ এ কি সাধারণ চরিত্র-বল?

কিন্তু এত আদর, সম্মান, যশোগীতি ও প্রশংসাকীর্তন স্বামীজীর নিকলঙ্ক চিত্তে বিন্দুমাত্র অহঙ্কারের ছায়াপাত করিতে পারে নাই। বরং মনে হয়



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

তিনি ইহাতে যেন যত্নগা বোধ করিয়াছিলেন। কারণ যেদিন প্রথম তিনি সংবাদপত্রের স্তম্ভে আপনার অল্প প্রশংসা ও খ্যাতির বিবরণ পাঠ করিলেন, সেদিন তিনি “আজ হইতে আমি নির্জনচারী সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা হারাইলাম” ভাবিয়া বালকের ছায় রোদন করিয়াছিলেন।

আর—স্বদেশ ? এ ঐশ্বর্যের পুষ্পিত নন্দনে আসিয়া তিনি এক দিনের জন্তও তাঁহার দরিদ্র স্বদেশের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার নিজেই এখন আর কোন অভাব ছিল না সত্য—ইচ্ছা করিলে তিনি এখন অনায়াসে ক্রোড়পতির প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে মহা আরামে অসংখ্যপ্রকার বিলাস-বৈভবের মধ্যে বিহার করিতে পারিতেন, কিন্তু সে স্ববর ভোগে মাতিবার নয় ! পাঠক একটি ঘটনার কথা শুনুন। যেদিন তাঁহার নান বিশ্ববিখ্যাত হইয়া পড়িল ঠিক সেইদিন চিকাগো শহরের একজন অতিশয় সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ ধনী তাঁহাকে মহাসমাদরে নিজালয়ে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং অমুগত ভক্তজনের ছায় বিশেষ বর সহকারে তাঁহার সেবা ও সৎকার করিলেন। রাত্রিতে তাঁহার শয়নের জন্ত একটি বিচিত্র বিলাসোপকরণসজ্জিত সুরম্য প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে রাতে স্বামীজীর নিদ্রা হইল না। সেই ইন্দ্রপুরীসদৃশ অট্টালিকা, রত্নাবলীভূষিত দীপালঙ্কৃত গৃহদ্বার, দুহুফেননিভ শয্যা, কল্লনাভীত অসংখ্য ভোগোপকরণ তাঁহার চিন্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাঁহার চক্ষের সলিলে উপাধান ভিজিয়া গেল, শয্যা কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যত্নগায় অধীর হইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ও বাতায়নতলে দণ্ডায়মান হইয়া বাহিরের ঘোর অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সে চিন্তা ভারতের। ভারতের লোক হ-বেলা হ-মুঠা খাইতে পায় না, আর এদেশের লোকের এত ঐশ্বর্য যে

## স্বামী বিবেকানন্দ

তুচ্ছ ভোগবিলাসের জন্য কোটা কোটা মুদ্রা জ্বলের মত খরচ করে—  
এ চিন্তা তুহানলের গ্রায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল। চিন্তা  
করিতে করিতে যন্ত্রণার আবেগে তাঁহার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম  
হইল। তিনি গৃহতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার  
মর্শ্বস্থল ভেদ করিয়া ক্রমাগত এই চিন্তা উঠিতে লাগিল—‘হা আমার  
দুঃখিনী মাতৃভূমি! তোমার অত দুর্দশা, আর আমার অদৃষ্টে এই  
সুখভোগ! আমি এ সুখ সৌভাগ্য ও নামমশ নইয়া কি করিব?’

কিন্তু এই মহদাশয় ব্যক্তিরও শত্রুর অভাব ছিল না। চিকাগো  
মহাসভায় তাঁহার প্রতিপত্তি দর্শনে ও পরে তাঁহার জগদ্ব্যাপী যশঃকীর্তন  
শ্রবণে কতিপয় নীচ, স্বার্থায়েবী কুটিল ব্যক্তি ঈর্ষ্যার দগ্ধ হইতে লাগিল।  
বলিতে লজ্জা হয়, ইহার মধ্যে একজন তাঁহার স্বদেশীয় ও ভারতের  
সংস্কারকসম্প্রদায়ের নেতৃকল্প ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, এই  
নবীন সন্ন্যাসী কোথা হইতে অতর্কিতে আসিয়া তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত  
যশোরশিকি মলিন ও নিশ্চভ করিবার উপক্রম করিয়াছে, তখন তিনি  
কৌশলক্রমে তাঁহার প্রতিদ্বন্দীর গৌরবহানি করিতে ক্লতসঙ্কল্প হইলেন।  
ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট স্বামীজীর পূর্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা  
করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ভারতবর্ষে ওকে কেউ চেনেও না। ও  
একটা ভবঘুরে গোছের লোক, আর জুয়াচোর এখানে আসিয়া মস্ত  
সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইতেছে” ইত্যাদি। সৌভাগ্যের বিষয়, ধর্মমহাসভার  
পরিচালকগণ তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তাঁহারা স্বয়ং  
স্বামীজীর আকার-প্রকার, কথাবার্তা ও চালচলন দেখিয়া তাঁহাকে কিছুতেই  
প্রবঞ্চক বা হীন-চরিত্রের লোক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না।  
সুতরাং উক্ত মহাত্মার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। শুধু ইহারা নহেন,



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

পিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতারাও স্বামীজীর প্রতি শুধু যে সহানুভূতির অভাব দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্ত বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা গাঢ়দাহ হইয়াছিল গোড়া সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান পাদরী-দিগের। তাঁহারা তাঁহার নির্ভীক সমালোচনার ও 'স্পষ্টবাদিতার' তাঁহার উপর আতঙ্কোদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং কি করিয়া তাঁহার কলঙ্ক রটনা করিতে পারিবে তাহার জন্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। কিন্তু সহজে তাঁহার ছিদ্র না পাইয়া তাহারা অবৈধভাবে তাঁহাকে গালি দিতে ও তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথার ভ্রক্ষেপও করিলেন না। তাহারা কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া এক গর্হিত উপায় অবলম্বন করিল। কতকগুলি সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার ধর্মনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল এবং

১ স্বামীজী দেখিলেন ভারত-প্রভাগত মিশনরীগণের অনেকেই দেশে ফিরিয়া গিয়া ভারতবর্ষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্ষারের দেশ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ও নানাবিধ কাল্পনিক গল্পের দ্বারা নিজ নিজ উক্তির সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন,—ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। সুতরাং তিনি সুযোগ পাইলেই আমেরিকাবাসীর মন হইতে ঐ ধারণাটি অপহৃত করিবার চেষ্টা করিতেন ও সজ্জন্ত কথন কথন ভীষণ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা হইতেন না। একবার মিনিয়াপোলিস নামক স্থানে বক্তৃতাকালে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন হিন্দুরমণীরা সম্ভানদিগকে নদীগর্ভে কুণ্ডীরের মুখে নিক্ষেপ করেন কিনা; স্বামীজী তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন, “মহাশয়, তাই বটে, আমাকেও তাহারা ঐরূপে ফেলিয়া দিয়াছিল, তারপর আপনাদের পুরাণোক্ত জ্ঞানার আয় আমি বাঁচিয়া উঠিয়াছি।” আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি স্পষ্ট কথা বলি বটে, তবে সে তোমাদেরই ভালর জন্ত। আমি এখানে তোমাদের মনবোগান কথা বলিতে আসি নাই, সত্য কথা বলিতে আসিয়াছি। মনবোগান বা

## স্বামী বিবেকানন্দ

কৃতকার্য হইতে পারিলে তাহাদিগকে বিশেষ পুরস্কার দিবে এইরূপ অঙ্গীকার করিল। জীলোকগুলি প্রথমে তাঁহার নিকট গিয়া নানাবিধ প্রলোভন-জাল বিস্তারের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ও তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতা, শিশুসুলভ সরলতা ও পবিত্রতা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বাস্তবিক তাহার জীবনে কখনও এ প্রকার মোহপাশ, প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্যে কোন পুরুষকে এ ভাবে অটল, সংযত ও দৃঢ়ব্রত থাকিতে দেখে নাই; প্রকৃত ধার্মিক যে কতদূর ইন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ তাহাও তাহার অবগত ছিল না। সুতরাং স্বামীজীর চরিত্র-মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া তাহার অবিলম্বে আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইল। ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি যে ঈর্ষ্যাচালিত হইয়া এতদূর নীচতা অবলম্বন করিতে পারেন, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন, ঈর্ষায় লোক অন্ধ হয়।

পোশামুদে কথা বলা আমার ব্যবসা নহে, তাহাই যদি হইত তবে আমি এতদিন নিউইয়র্ক শহরের কিপ্‌থ এভেনিউ নামক রাস্তায় একটি নবরঙ্গের গীর্জা খুলিয়া বসিতাম। তোমরা আমার সন্তানবৎ। আমি তোমাদের ভুলত্রাস্তি দেখাইয়া ভগবানের দিকে তোমাদের লইয়া বাইতে চাই, সুতরাং সব সময় তোমাদের প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম ও সভ্যতার গুণগান করিতে পারিব না।” ডেট্রয়েটে স্বামীজী একদিন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, “তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম কৈ? এই মারামারি কাটাকাটি ও প্রবল স্বার্থসংঘর্ষের মধ্যে যীশুর স্থান কোথায়? যদি আজ তিনি এখানে উপস্থিত হইতেন, মাথায় দিয়া শুইবার জন্ত একখণ্ড প্রস্তর পাইতেন কিনা সন্দেহ।” খ্রীষ্টের আদর্শের এমন সুলভ ধারণা তিনি কেমন করিয়া করিলেন ভাবিয়া একজন সুবিখ্যাত ধর্মযাজক বিস্ময় প্রকাশ করিলে স্বামীজী বলিয়াছিলেন—“কেন, খ্রীষ্ট যে প্রাচ্য দেশের লোক ছিলেন! আমরাও সেই দেশের লোক। সুতরাং তাঁর ভাব যে ঠিক ঠিক ধরতে পারব এতে আশ্চর্যের বিষয় কি?”



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষের মিশনরীরাও অনেকে স্বামীজীকে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট হীন প্রতিপন্ন করিবার মানসে তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পিত কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হয় ও আমেরিকার কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্য করিতেছে না ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার উপর অযথা আক্রমণ করিতে থাকে। ভারতবর্ষ হইতে স্বামীজী যে সব চিঠিপত্র পাইতেন তাহার মধ্যে একখানি পত্রে ঐ সংবাদ দেওয়া ছিল ও আমেরিকার কোন একখানা সংবাদপত্র তাঁহার যে নিন্দাবাদ প্রচার করিয়াছিল তাহার উল্লেখ ছিল। স্বামীজী তৎক্ষণে লিখিয়াছিলেন—

“তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌছিয়াছে। ‘ইন্টিরিয়ার’ পত্রিকার সমালোচনা-সমূহের আমেরিকাবাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না। এই পত্রিকাকে এখানে কেহ চেনে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে ‘নীলনাসিক প্রেসবিটেরিয়ান’দের কাগজ বলিয়া ঠাট্টা করে। এরা খুব গোঁড়া সম্প্রদায়। অথচ নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু নাম জাহির করিবার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকার জনসাধারণ (বিশেষতঃ পুরোহিতগণ) আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। এইরূপ কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া অনেক পত্রিকা যে খ্যাতিনামা হইতে চায় এই কৌশল এখানকার কাহারও অবিদিত নাই, সুতরাং ইহারা ওসব বড় গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। অবশ্য ইহাতে ভারতীয় মিশনরীদের যে খুব সুবিধা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও—‘হে রাহুদী, চাহিয়া দেখ, ঈশ্বরের নিকট তোমাদের বিচারের দিন সমাগত।’ বাস্তবিক তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তিসমূহ এক্ষণে যায় যায়

## স্বামী বিবেকানন্দ

হইয়াছে, উহারা পাগলের মত যতই চিৎকার করুক না কেন, উহা আর কিছুতেই টিকিতেছে না। অবশ্য মিশনরীদের জন্ত আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশের লোকেরা দলে দলে এখানে আসাতে তাহাদের ভারতে গিয়া বড়মানুষী করিবার উপায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান প্রধান ধর্মোপদেশকের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাহা হউক, যখন পুষ্করিণীতে নামিয়াছি তখন শেষ পর্য্যন্ত ভাল করিয়াই দেখিব।”

বাস্তবিক সাধারণ শ্রেণীর হীনচেতা খ্রীষ্টধর্মপ্রচারকেরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে নানা কথা রটনা করিতেছিল বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে, সমস্ত খ্রীষ্টীয় যাজক সম্প্রদায় তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, বরং খ্রীষ্টীয় সমাজের মধ্যে যে-সকল চিন্তাশীল, মহামনা উচ্চাঙ্গকরণ ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এবং পুরোহিতশ্রেণীর মধ্যেও অধিকাংশ প্রধান বা সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি স্বামীজী এবং তাঁহার মতের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সময়ে পূর্বোক্ত ইতর লোকদিগের ব্যবহার দর্শনে বিরক্ত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে লেখনী-চালনা করিবার জন্ত স্বামীজীকে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু স্বামীজী বলিতেন, “আমি কেন ঐরূপ করিতে যাইব? নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ কোন কথা বলা সন্ন্যাসীর কার্য্য নহে। তা ছাড়া সত্যকে কেহ গোপন করিতে পারিবে না। ঠিক জানিও সত্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করিবে।” ভক্ত ও গুণগ্রাহী বন্ধুদিগকে এই সকল ব্যাপার লইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখিলে কখন কখন বলিতেন, “ক্রোধ করিতেছেন কেন? নিন্দুক ও নিন্দিত, প্রশংসক ও প্রশংসিতের মধ্যে কি কোন ভেদ আছে?”

এই সময় স্বামীজীর পরিশ্রমও খুব গুরুতর হইতেছিল। ওখানকার



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

একটা বক্তৃতা-কোম্পানী তাঁহাকে সমস্ত আমেরিকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিবার জন্ত আহ্বান করিয়াছিল। সাধারণতঃ বাহারা উৎকৃষ্ট বক্তা ও বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহাদিগকেই এই কৰ্মে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীজীকেও তাহারা এই জন্ত আপনাদিগের কার্যে নিযুক্ত করিতে চাহিল। তিনি দেখিলেন, ইহা নিতান্ত মন্দ নহে। কিছু অর্থ পাইলে তাঁহার নিম্নেরও সুবিধা হইবে, চাই কি, উহা হইতে তিনি ভারতে ধর্ম ও জনসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানেও অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাবাসী নরনারীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদিগের মন হইতে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলির উচ্ছেদপূর্বক ষথার্থ সত্য ধারণা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন। সুতরাং তিনি উক্ত কোম্পানীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমেরিকার চতুর্দিকে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন; যথা—ভারতের নারীজাতি, হিন্দুদিগের আচার পদ্ধতি, ভারত কি অজ্ঞানচ্ছন্ন দেশ? ইত্যাদি। এইসকল বক্তৃতা দিবার জন্ত তাঁহাকে আমেরিকার পূর্ব ও মধ্যপশ্চিম প্রদেশের প্রত্যেক বৃহৎ ও প্রধান প্রধান নগরে যাইতে হইয়াছিল। এইরূপে তিনি চিকাগো, আইওয়া সিটি, ডিসমথেনিস সেন্টলুই, ইণ্ডিয়ানা পোলিস, মিনিয়াপোলিস, ডেট্রয়েট, হার্টফোর্ড, বাফেলো, বষ্টন, কেম্ব্রিজ, বার্মিংহাম, ওয়াশিংটন, ব্রুকলিন এবং নিউইয়র্কে ভ্রমণ করিলেন। হুঃখের বিষয়, এইসকল বক্তৃতা ও ভ্রমণের সবিশেষ বৃত্তান্ত এক্ষণে হুস্তাপ্য। মাঝে মাঝে 'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস' বা ঐরূপ দুই চারিখানা প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে তাঁহার দুই চারিটি উপদেশ বা বক্তৃতার সারাংশ ও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার

## স্বামী বিবেকানন্দ

অধিক আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে এইসকল বক্তৃতা দ্বারা তিনি যে আমেরিকাবাসীদের মন হইতে 'ভারতবর্ষ বর্ষরের দেশ, উহার ধর্ম অতি অকিঞ্চিৎকর এবং উহার অধিবাসীরা দারুণ অসভ্য' এইসকল মিথ্যা সংস্কার দূর করিয়া তৎপরিবর্তে প্রাচ্যদেশ, ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন ও যথার্থ ধারণা স্থাপন করিতে বহুল পরিমাণে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ঠিক কোন্ সময়ে তিনি যে এ-সকল বক্তৃতা দিবার জন্ত পর্যটন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন, তবে বোধ হয় ১৮৯৪ সালের প্রারম্ভে। কারণ এই সময়েই তিনি একবার লিখিয়াছিলেন, "আমি ক্রমাগত চরকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" তাঁহার পর্যটনাবসরের অধিকাংশকাল চিকাগোর জর্জ ডব্লিউ. হেল সাহেবের বাটীতে যাপিত হইত; কারণ এই পরিবারের সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন।

কিন্তু এই প্রচারকার্য্য তাঁহার সকল সময় ভাল লাগিত না। মধ্যে মধ্যে ভারতের সেই পরিব্রাজক জীবনের স্মৃতি হৃদয়ে উঠিয়া বর্তমান অবস্থাকে ঘোর বদ্বাবস্থা মনে হইত, তাহার উপর শ্রোতাদিগের ভারতবর্ষসংক্রান্ত জ্ঞানের একান্ত অভাব এবং তাহাদের মূঢ়বৎ প্রশ্নের উপর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরিয়া যাইত। সভ্য বটে, অনেক সময়ে ধর্ম্যাচার্য্যগণ তাঁহাকে নিজ নিজ উপাসনাগারে লইয়া গিয়া বক্তৃতা দিবার জন্ত অনুরোধ করিতেন এবং তিনি সেখানেই যাইতেন সেখানেই লোকের উৎসাহের সীমা থাকিত না, তথাপি অসংখ্য লোকের অজ্ঞতা দূর করা বড় কম পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার কর্ম্ম নহে। তিনি দেখিলেন লোকগুলি ভারত সম্বন্ধে ঘোর অজ্ঞ, আর যৎকিঞ্চিৎ বাহা



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

জানে তাহাও ভ্রমপূর্ণ। তিনি কখনও পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া বক্তৃতা দিতেন না, সভার উপস্থিত হইয়া বাহা বলিবার ইচ্ছা হইত বলিতেন। অনেক সময় এইরূপ হইত—হয়ত বক্তৃতা বেশ জমিয়াছে, তিনিও প্রাণের আবেগে অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন এমন একটা তুচ্ছ প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে সব মাটি হইবার ষোগাড়—হয় তখন বক্তৃত্যশ্রোত থামাইতে হয়, না হয় তাহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বন্ধ করিতে হয়। কেহ কেহ আবার তাঁহার কথা শুনিতে চাহিত না, প্রতিবাদ করিত, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তর্কবুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইত। আর একবার তর্কবুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে তাহার বেগধারণ করা কাহারও পক্ষে সহজ হইত না। তাঁহার প্রবল মানসিক শক্তি ও ক্ষুরধার বিজ্ঞপের নিকট সকলকে নিরস্ত হইতে হইত। এ সম্বন্ধে ‘আইওয়া স্টেট রেজিষ্টার’ লিখিয়াছেন—

“যদি কোন ব্যক্তি স্বামোজীর যুক্তিতর্কের প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইত তাহা হইলে তাহার সর্বনাশ। তাঁহার উত্তরগুলি যেন বিদ্যুচ্চমকের ত্রায় ঝলসাইয়া উঠিত, আর সেই দুঃসাহসিক তার্কিক তাঁহার শানিত বুদ্ধিফলকে বিদ্ধ হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইত। তাঁহার জ্ঞান-সম্ভার-পূর্ণ, সুশিক্ষিত মনের ক্রিয়াসকল এত সূক্ষ্ম ও প্রখর যে, সহজেই শ্রোতৃ-বৃন্দের বিষ্ময় উৎপাদন করে, কিন্তু এরূপ মনের গতি অনুধাবন করা বড়ই প্রীতিপ্রদ। বাস্তবিক বিবেকানন্দ ও তাঁহার প্রতিপাত্ত মতসকল জীষ্টনিষ্ঠের হৃদয় অধিকার করিয়াছে।”

বাহা হউক, অসহ্য বিরক্তি সত্ত্বেও স্বামোজী, ইহার দ্বারা তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। সব সময়ে তিনি যে সাধারণ ও

## স্বামী বিবেকানন্দ

লৌকিক বিষয়েই বক্তৃতা দিতেন তাহা নহে, মাঝে মাঝে ধর্ম দর্শনাদি বিষয়ক উপদেশ দিতেও ছাড়িতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ আর একটি কারণে তিনি ঐ কার্যের উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তিনি দেখিলেন, বক্তৃতা কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা তাঁহার সাহায্যে নিজেদের কার্য উদ্ধার করিয়া লইতেছেন, অথচ তাঁহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ। প্রথম প্রথম তাঁহারা তাঁহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার এক একটি বক্তৃতার জন্ত ২০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ২৭০০ টাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু তারপর ক্রমশঃ ঐ টাকার পরিমাণ হ্রাস হইতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে একদিন একটি বক্তৃতায় এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০ টাকা উপার্জন করিয়া স্বামীজীকে মাত্র ২০০ ডলার বা ৬০০ টাকা দিলেন। ইহাতে স্বামীজী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন। তিনি তাহাদের জন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিবেন, অথচ তাহারা তাঁহাকে যৎসামান্য কিছু দিয়া যেন কৃতার্থ করিতে চায়, ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। আর বাস্তবিক এরূপ করিবার কোন সম্ভব হেতুও ছিল না, কারণ শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপর তাঁহার প্রভাবও দিন দিন বাড়িতেছিল। যাহা হউক এই সকল কারণেও পয়সা লইয়া বক্তৃতা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় কিছুকাল পরে স্বামীজী উক্ত কোম্পানীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

১ এই সম্বন্ধে তিনি পরে ভারতীয় শিষ্যবর্গের সম্মুখে বলিয়াছিলেন—‘এইরূপে যথেষ্ট অর্থ সমাগম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরে হঠাৎ মনে উদ্ভিত হইল, এ কি



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

উপরোক্ত প্রকারে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দিবার সময়ে তিনি আমেরিকানদিগের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—সেটি হইতেছে তাঁহাদের সত্যানুগ। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র অর্থ উপার্জন, পাশ্চাত্যজাতি যাত্রাই অতিশয় অর্থগৃহ। কিন্তু এতৎসঙ্গেও উহারা সত্যানুগামী, এবং এই অনুরাগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক শ্রেণীর ভণ্ডানী শিক্ষাদানহলে জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। স্বামীজী পর্যটন করিতে করিতে এইরূপ একদল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিবার জন্য বিবিধপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি স্বগার সহিত তাহাদিগের সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল যে, তিনি ওদেশে প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচারের জন্য প্রাণপাত করিবেন, কিন্তু তাহার জন্য এক কপর্দকও কাহারও নিকট গ্রহণ করিবেন না।

এইসকল কার্যের অবকাশে তিনি আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, মিউজিয়ম, চিত্রশালা, কারখানা ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করিতেন ও তাহাদের শিল্প-বাণিজ্যাদি বিস্তারের উপায় ও প্রণালীসমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিতেন। বস্তুতঃ তিনি পরিশ্রমনিরত ছাত্রের স্থায় আমেরিকার সামাজিক জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ প্রত্যেক বিষয় হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা করিতেন। যাহারা

করিতেছি! আমি না সম্পূর্ণ কামকাঞ্চনশাগী ঐরামরূপ পরমহংসদেবের শিষ্য! আমার আধ্যাত্মিক শক্তি যে দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তৎক্ষণাৎ এরূপ টাকা লইয়া বক্তৃতা করা ছাড়িয়া দিলাম।'

## স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁহার সহিত সদাসর্বদা মিশিতেন তাঁহার বলেন, “তাঁহার কাছে থাকিলেই বহু বিষয় আপনা আপনি শিক্ষা হইয়া যাইত।”

স্ত্রীলোকেরা আমেরিকার সর্বময়ী কৰ্ত্তা। স্বামীজী ওখানে বহু স্ত্রীলোকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন; তাহা হইতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, নারীজাতিকে শিক্ষিত না করিলে কোন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—“ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত। আবার, সাধারণতঃ আমেরিকান নারী, আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষগুলি অর্থের জন্য সমুদ্র জীবনটাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা সাবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে।” ইহাদের সহিত ভারতের শিক্ষাহীন নারীকুলের তুলনা করিয়া তিনি বড়ই বেদনা অনুভব করিতেন। ১৮৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে হরিপদ মিত্র মহাশয়কে তিনি যে পত্র লিখেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন—

“এদেশে দারিদ্র্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। ‘বা স্ত্রীঃ স্বয়ং স্মৃতিনাং ভবনেষু’ (যে দেবী স্বয়ং স্মৃতি-পুরুষের গৃহে বিরাজ করেন), একথা বড়ই সত্য। এদেশের তুমার যেমন ধবল তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কার্য্য এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়াদেশে মেয়েছেলের পথ চলবার ঘো নেই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিচ্ছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দিবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলতে



## মহাসভার অধিবেশনান্তে

পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হব না।

“বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাজ নয়, যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র জীবাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন তিনিই প্রকৃত শাক্ত। এরা তাই দেখে। এবং মনু মহারাজ যে বলেছেন, ‘যত্র নার্যাস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ’, অর্থাৎ যেখানে জীলোকেরা সুখী সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা—এখানে ঠিক তাই, আর এরা এত সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন ও উত্তোঙ্গী! আর আমরা জীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি—তার ফল আমরা পশু, দাস, উত্তমহীন, দরিদ্র। . . .”

আর এক স্থানে লিখিতেছেন—“আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কাকুর বিবাহ হয় না, আর আকাশের পক্ষীর ছান্ন স্বাধীন। বাজার, হাট, রোজকার, দোকান, কলেজ, অধ্যাপনা সব কাজ করে, অথচ মনে একটুও দাগ নেই। যাদের পয়সা আছে তারা আবার দিনরাত গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি?—না, আমার মেয়ে ১১ বৎসরে যে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ বাবাজী? মনু বলেছেন, ‘কণ্ঠাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিষত্তঃ’, ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য রক্ষা করে বিদ্যালভ করতে হবে, তেমনি মেয়েদেরও করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নত করতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশু-জন্ম যুচবে না।”

দেখিরা শুনিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, ধর্মবিষয়ে আমেরিকানরা আমাদের অপেক্ষা অনেক হীন, কিন্তু সমাজসম্বন্ধে উহারা অনেক অগ্রগামী।

## স্বামী বিবেকানন্দ

সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, 'ইহাদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর ইহাদিগকে আমাদের অদ্বুত ধর্ম শিক্ষা দিব।'

আমেরিকার থাকিতে ওদেশের শিষ্টাচারের নিয়মাবলী পালন করিতে তিনি সর্বদা চেষ্টিত হইতেন। এ বিষয়েও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শে বহু প্রভেদ। কিন্তু তিনি ওদেশীয় নিয়মকানুন রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক মনে করিতেন। আবার সময়ে সময়ে সন্দেহ হইলে বালকের স্থায় সরলভাবে গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনীকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কোনটি ঠিক?' যেমন সিঁড়িতে উঠিবার বা নামিবার সময় কাহার আগে যাওয়া উচিত—স্ত্রীলোকের না পুরুষের? কিন্তু তিনি যেখানেই যাইতেন কেহ তাঁহার ক্রটি বা দোষ ধরিত না, তাঁহার সম্বন্ধে নিয়ম ছিল তিনি কোন সামাজিক রীতিনীতির বাধ্য নহেন। সর্বত্রই গৃহস্বামী তাঁহাকে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন।

এত ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি ও কাজকর্মের মধ্যেও স্বামীজী আপনার প্রকৃতিগত ধ্যানধারণার ভাব হারান নাই। সময়ে সময়ে তিনি আত্মভাবে তন্ময় হইয়া সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন। অনেক দিন এমন ঘটিত যে ট্রামে উঠিয়াছেন, ট্রামখানি দুই-তিন বার গন্তব্য স্থানে যাতায়াত করিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার খেয়াল নাই; অবশেষে কণ্ডাক্টার আসিয়া যখন ভাড়ার তাগাদা করিত, তখন তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িতেন ও ভবিষ্যতে বাহাতে ঐরূপ ঘটনা পুনরায় না ঘটে তজ্জন্ম সতর্ক থাকিতে চেষ্টা করিতেন।



## পর্যটন ও প্রচার

বক্তৃতা-কোম্পানীর কার্য উপলক্ষে পর্যটনকালে স্বামীজীর সহিত যে বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তির আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত 'অজ্ঞেয়বাদী বক্তা' মিঃ রবার্ট ইঙ্গারসোলের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার সহিত স্বামীজীর ধর্মদর্শনাদি বিষয়ে অনেক আলোচনা ও বাদামুবাদ হইত। ইঙ্গারসোল তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যেন তিনি অত স্পষ্ট ভাষায় মনের কথা প্রকাশ না করেন—বিশেষতঃ নূতন কিছু প্রচার করিবার সময়, বা ওদেশের লোকের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর কোনরূপ সমালোচনা করিবার সময়। স্বামীজী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “আপনি যদি চল্লিশ বৎসর পূর্বে এদেশে এইরূপ প্রচার করিতে আসিতেন, তবে ইহার আপনাকে কীসিতে লটকাইত বা পুড়াইয়া মারিত। এমন কি, কিছুদিন পূর্বে আসিলেও, আপনাকে ইট মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিত।” স্বামীজী শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বাস্তবিক আমেরিকার লোকেরা যে কোন সময়ে অত সঙ্কীর্ণ-হৃদয় বা ধর্ম্মান্ব ছিল ইহা তাঁহার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। ইঙ্গারসোলকেও তিনি সে কথা খুলিয়া বলিলেন। তবে ইঙ্গারসোল ও তাঁহার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ ছিল। ইঙ্গারসোল কোন ধর্ম্মই মানিতেন না, একরূপ নাস্তিক ছিলেন বলিলেই হয়। স্বামীজী ধর্ম্ম

---

১ স্বামীজী এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—‘মিঃ ইঙ্গারসোল এই দেশের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তা। ইনি প্রতি বক্তৃতায় ৫ হইতে ৬০০ ডলার পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন।’

## স্বামী বিবেকানন্দ

ও ঈশ্বর মানিতেন, এবং যদিও তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত আমেরিকাবাসীদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইত, তথাপি তিনি কোন ধর্মের বিরোধী ছিলেন না, বরং খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টমাতা মেরীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং ইঙ্গারসোলের যতটা ভয়ের কারণ ছিল, স্বামীজীর ততটা ছিল না। এই দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে মতের কিরূপ পার্থক্য ছিল স্বামীজী-কথিত একটি ক্ষুদ্র কাহিনী হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। স্বামীজী বলিতেন, “ইঙ্গারসোল এক সময়ে আমার বলিয়াছিলেন, ‘আমি এই জগৎটা বখাসম্ভব ভোগ কবিরার পক্ষে; লেবুটা নিংড়াইয়া যত পার রস বাহির করিয়া নাও, কারণ এই জগৎটার অস্তিত্বই আমাদিগের নিকট নিশ্চিত, এছাড়া আর সব অনিশ্চিত।’ তাহাতে আমি উত্তর দিরাছিলাম, ‘আপনি যে উপায়ে লেবু নিংড়াইবার কথা বলিতেছেন, আমি তাহার চেয়ে ঢের ভাল উপায় জানি, আর তাহাতে বেশী রসও পাই। আমি জানি আমার মৃত্যু নাই, তাই রস নিংড়াইয়া নিবার জন্ত তাড়াহড়া করি না। আমি জানি ভয়ের কোন কারণ নাই, সুতরাং বেশ ধীরে সুস্থে মজা করিয়া নিংড়াই। কাহারও প্রতি আমার কোন কর্তব্য নাই, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পত্তিরও ধার ধারি না, সুতরাং আমি জগতের সব নরনারীকে ভালবাসিতে পারি। আমার নিকট সকলেই শ্রীভগবানের স্বরূপ। মানুষকে শ্রীভগবান-বোধে ভালবাসিতে পারিলে কতটা সুখ হয় তাবুন, আর এই ভাবে লেবুটা নিংড়ান দেখি, তাহাতে হাজারগুণ বেশী রস পাবেন—এক কোঁটাও বাদ যাবে না।”

ইঙ্গারসোলের মত ব্যক্তির সহিত উপরি উক্ত ভাবে কথাবার্তা বলাতে বেশ ধুঝা যায়, আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে স্বামীজীর কিরূপ স্বাধীনতা ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। শুধু যে হজুগওয়াল্লা সৌখীন ধনীরা



## পর্যটন ও প্রচার

তাঁহাকে লইয়া হৈ চৈ করিতেছিলেন তাহা নহে, ওদেশের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও মনস্বী ব্যক্তিবর্গও তাঁহার গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত বাক্য শুনিবার জন্য লালসিত হইতেন। অনেকে প্রকাশ্য সভায় বা লোকের বাটীতে তাঁহার বক্তৃতা বা কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইত না, তাঁহার বাসস্থানে পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইত।

একবার পশ্চিমদিক্কার একটি শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়া স্বামীজী মহাসঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সন্নিকটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত কতকগুলি যুবক কৃষি ও গবাদি-পশু-পালনকার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিত। তাঁহারা উক্ত শহরে স্বামীজীর মুখে ভারতীয় দর্শনের উপদেশ গ্রহণ করিয়া, বাঁহার তত্ত্বলাভ হইয়াছে তিনি কোন পার্থিব অবস্থায় বিচলিত হন না—এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে নিজেদের গ্রামে বক্তৃতা করিবার জন্য একদিন আহ্বান করিল এবং তিনি আগমন করিলে একটি পিপা উন্টাইয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবার জন্য তাঁহাকে বলিল। স্বামীজী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই আপন ভাবে তন্ময় হইয়া গেলেন। সহসা তাঁহার কানের কাছ দিয়া শেঁ। শেঁ। করিয়া কতকগুলি বন্দুকের গুলি ছুটিল। কিন্তু তিনি সেদিকে দৃকপাত না করিয়া অবিচলিত ভাবে আপনার বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে গোপালকেরা তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া মহাকলরব করিতে লাগিল ও তাঁহাকে খুব খাঁটি লোক বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বামীজী যদি সেদিন বিন্দুমাত্র ভীতিচিহ্ন প্রদর্শন করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিত।

স্বামীজীর অদৃষ্টে এইরূপ নানাবিধ বিড়ম্বনাভোগ হইয়াছিল। একটি

## স্বামী বিবেকানন্দ

ঘটনা তিনি প্রায়ই কৌতুকচ্ছলে বর্ণনা করিতেন। তাহা এখানে উল্লেখ করিব। সে সময়টা তিনি খুব পরিশ্রম করিতেছিলেন—একটি গ্যাড্‌স্টোন ব্যাগমাত্র সঞ্চল লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে আজ এখানে কাল সেখানে বক্তৃতা দিবার জ্ঞত ছুটাছুটি করিতেছিলেন। সময়ে সময়ে দিনে দুই-তিনটা বক্তৃতাও দিতে হইত। এইভাবে একদিন মধ্য-পশ্চিম রাজ্যের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহরে তিনি বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তখন অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার সর্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সেক্রেটারী বিশ্রামের জ্ঞত তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। তিনি যেমন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরাম-কেদারায় বসিতে গিয়াছেন, অমনি সেটা মাঝখান হইতে খসিয়া গিয়া এমনি বেথাপ্লা গোছের হইয়া দাঁড়াইল যে তাঁহার সর্বশরীর ভিতরে ঢুকিয়া গেল, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও আপনাকে সে অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। বরং যত বেশী চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই চেয়ারভাঙ্গা, পোশাক ছেঁড়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইবার আশঙ্কা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অগত্যা তিনি সেই অস্বস্তিকর অবস্থায় বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন—নড়িতে-চড়িতেও পারেন না। অবশেষে সেক্রেটারী মহোদয় যখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বক্তৃতামঞ্চে লইয়া যাইবার জ্ঞত উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “স্বামীজী, আশুন, শ্রোতৃগণ আপনার জ্ঞত অপেক্ষা করিতেছেন।” তখন তিনি দ্বিষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “আমার বোধ হয় আপনি যদি আমায় আমার বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে শ্রোতৃগণকে বরাবরই ঐরূপ অপেক্ষা করিতে হইবে।” এই কথা শুনিয়া সেক্রেটারী দোড়াইয়া আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিলেন। তারপর খুব একচোট হাসি



## পর্যটন ও প্রচার

হইল। স্বামীজী এমনভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন যে, তাঁহার শি ও বন্ধুরা হাসিয়া অস্থির হইতেন।

কিন্তু এই কৌতুককর ঘটনার সহিত আরও এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে বাহা হইতে পাঠক এই মহাপুরুষের অদ্ভুত হৃদয়বত্তা ও মহেশ্বের পরিচয় পাইবেন। ওদেশে যাহারা স্বামীজীকে জানিত না, তাহারা অনেক সময় তাঁহাকে দেখিয়া নিগ্রো মনে করিত। অনেকবার এজ্ঞ তাঁহাকে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, অথচ সেইসব ক্ষেত্রে যদি তিনি একটিবার নিজের পরিচয় প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার স্মার্য ব্যক্তিকে অপমান করিবার জ্ঞান নজ্জিত ও অনুতপ্ত হইত। একবার তিনি ট্রেন হইতে নামিলে একজন নিগ্রোজাতীয় কুলি বহু ব্যক্তি তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, “আমি শুনিয়াছি আপনি নাকি আমাদের জাতির মধ্যে খুব একজন মস্তবড় লোক, তাই আমি আপনার সহিত করমর্দনের সৌভাগ্য লাভ করিতে আসিয়াছি।” স্বামীজী বুঝিলেন লোকটি তাঁহাকে ভুলক্রমে নিগ্রো মনে করিতেছে; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত বা রুষ্ট না হইয়া সাদরে তাহার হস্তধারণ করিলেন ও বলিলেন, “ভ্রাতঃ, তোমার ধন্তবাদ, ধন্তবাদ।” এইরূপ আরও অনেক নিগ্রো তাঁহাকে স্বজাতীয় মনে করিয়া তাঁহার নিকট আসিত, কিন্তু তিনি কখনও তাহাদের ভুলের জ্ঞান অপরাধ গ্রহণ করিতেন না। মার্কিন রাজ্যের দক্ষিণভাগে ভ্রমণকালে বহুবার এমন ঘটনা আছে যে প্রচারার্থ পর্যটন করিতে করিতে তিনি এক বৃহৎ শহরে গিয়া সেখানকার হোটেলে প্রবেশ করিতে উত্তত হইয়াছেন, এমন সময়ে হোটেলস্বামী তাঁহাকে দেখিয়া রুদ্ধভাবে তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। এইসকল স্থলেও তিনি যদি নিজেকে

## স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতবর্ষীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন তবে অক্লেশে প্রবেশাধিকার পাইতেন। তাহার পরদিন যখন হোটেলের লোকেরা খবরের কাগজে তাঁহার অল্প প্রশংসা ও বক্তৃতাди পাঠ করিত, তখন অনুতপ্ত ভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিত। এই সব অসুবিধা দেখিয়া প্রচারকার্যের কর্তৃপক্ষগণ অনেক সময় তাঁহার জ্ঞাত অগ্ররূপ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। এমন কি উত্তর দিকের শহরে দাড়ি কাগাইবার জ্ঞাত ক্ষৌরকারের দোকানে প্রবেশ করিলে অনেক সময়ে তাহারা রূঢ়ভাষায় তাঁহাকে দরজা দেখাইয়া দিত। অনেকদিন পরে তাঁহার এক পাশ্চাত্য শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি ঐসব ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেই যখন সব লেঠা চুকিয়া যাইত, তখন তিনি কিজ্ঞাত নিজের পরিচয় দিতেন না? তিনি তাহার উত্তরে স্বগতোক্তির ভাবে বলিয়াছিলেন, “কি! অপরকে ছোট করিয়া নিজে বড় হইব? এজ্ঞাত ত আর জগতে আসি নি!” বাস্তবিক তিনি সাদা-কালোর প্রভেদ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। তিনি নিজে কৃষ্ণকায় জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কখনও লজ্জাবোধ করিতেন না, বরং ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ববোধ করিতেন এবং কোন শেতাঙ্গ পুরুষ তাঁহার সমক্ষে নিজ চর্ম্মের গৌরব দেখাইলে কঠোর বাক্য শুনাইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

স্বামীজী প্রচারোদ্দেশ্যে পর্যটন করিতে করিতে যেখানে যাইতেন সেইখানেই দেখিতেন সংবাদপত্রের স্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে তাঁহার নাম। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সংবাদদাতাগণ সদাসর্বদা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার পূর্বজীবন, রীতি-প্রকৃতি, অভ্যাস, আহার, ধর্ম্ম-দর্শনাদিবিষয়ক মত—সকল বিষয়ের খোঁজ লইতেন ও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত, তাঁহার ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালী, তাঁহার দেশের



## পর্যটন ও প্রচার

রাজনৈতিক অবস্থা, আচারপদ্ধতি বিষয় প্রভৃতি জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তারপর তাঁহার মতামত সহ ঐসকল কথোপকথন নিজ নিজ পত্রে প্রকাশ করিতেন। আমেরিকায় যেসকল লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপের সুযোগ পাইতেন না তাঁহারাও ঐসকল সংবাদপত্রের সাহায্যে তাঁহার সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যই অবগত হইতে পারিতেন। ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যখন ডেট্রয়েটে উপস্থিত হইলেন, তখন খবরের কাগজের সংবাদদাতাগণ দিনরাত তাঁহাকে আলাতন করিত। এসময়ে তাঁহার সম্বন্ধে সকল সংবাদপত্রে বাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাহুল্যভয়ে এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল না। কেবলমাত্র 'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস' নামক আমেরিকার অত্যন্ত মুখ্য সংবাদপত্র বাহা লিখিয়াছিল তাহার কিয়দংশের অনুবাদ পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল—

“হিন্দু প্রতিনিধিগণের মধ্যে বাহারা সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অত্যন্তম। কংগ্রেসের মধ্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—যে ইংরেজী বলেন তাহা দোষশূন্য অথচ কোন নোট বা স্মারক-পত্র ব্যবহার করেন না। উচ্চারণও এত মধুর যে শ্রোতাদের অনেকেই বলেন, যদি কেহ উহার এক বর্ণও না বুঝিতে পারে তথাপি বলিবে উহা সঙ্গীতের ত্রায় সুখশ্রাব্য। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইলে তিনি অনেক শহরে বৃহৎ বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে বক্তৃতা দিয়াছেন। সকলেই এক বাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার চুষ্কের ত্রায় আকর্ষণী শক্তি প্রত্যেক বিষয়েই নূতন আলোকদান ও প্রাণ-সঞ্চারের ক্ষমতার কথা বলিতে বলিতে আত্মহারা হইয়া বাইতেন। আমেরিকাবাসীদের নিকট পৃথিবীর পরপার হইতে আগত

## স্বামী বিবেকানন্দ

এই ব্যক্তি স্বয়ং যেমন চমৎকার ও অপূর্ণ, বিবিধ উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিও সেইরূপ। যখন এই শ্রামকার, শ্রামলকেশ, উজ্জল-গৈরিকধারী মহাপুরুষ স্পষ্ট, বিস্ময় ও অনর্গলভাবে তাঁহাদের ভাষা বলিতে থাকেন, তখন প্রত্যেক আমেরিকাবাসী বিস্ময় ও আনন্দে পরিমুগ্ধ হন।”

১৮৯৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঐ সংবাদপত্র আবার লিখিয়াছিল—  
“হিন্দু দার্শনিক ও ধর্মবিৎ স্বামী বিবেকানন্দ গতরাতে ইউনিটেরিয়ান গীর্জাঘরে তাঁহার ধারাবাহিক বক্তৃতাবলী শেষ করিয়াছেন। শেষ বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘মনুষ্যের দেবত্ব’। হুর্থোগসন্ডেও গীর্জাঘরে বহু লোকসমাগম হইয়াছিল এবং আমাদের প্রাচ্যদেশীয় ভ্রাতার আগমনের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্বেই দ্বারদেশ পর্যন্ত লোকপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। উৎকর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ব্যবহারজীবী, বিচারক, ধর্মবাজক, বণিক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। মহিলাবৃন্দের উল্লেখ্য ত বাহ্যল্যমাত্র—কারণ তাঁহারা সকল সভায় পুনঃ পুনঃ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এক্রপ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। বাস্তবিক ইনি সাধারণ স্থানে বক্তৃতা দিতেও যেমন পটু, ভদ্রগৃহে ছোট ছোট বৈঠক বা মজলিসেও তেমনি আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ। ইত্যাদি।”

মিসেস্ মেরী সি. কান্কে নাম্নী ডেপুটি মহিলা-সমাজের একজন প্রধানা রমণী বহুদিন পরে এই সময়কার কথা এইরূপ লিখিয়াছিলেন—  
“১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্মৃতিপথে একটি বিশেষ পবিত্র দিবস হইয়া রহিয়াছে; কারণ ঐদিনেই আমি সর্বপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্মজগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের মুক্তি দর্শন ও



## পর্যটন ও প্রচার

তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি, যিনি দুই বৎসর পরে আমার শিশুপদে বরণ করিয়া লইয়া আমাকে অপার আনন্দ ও বিশ্বয়ে অভিভূত করিয়াছিলেন।

“তিনি এই দেশের (আমেরিকার) বড় বড় নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং ডেট্রয়েটের ইউনিটেরিয়ান চার্চে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, তাহার প্রথমটি উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, সুবৃহৎ প্রাসাদটিতে সত্যসত্যই তিলাঙ্ক স্থান ছিল না, এবং স্বামীজী তথায় রাজসম্মানে সম্মানিত হন। যখন তিনি বক্তৃতা-মধ্যে প্রথম পদার্পণ করিলেন, তাঁহার তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় মূর্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হইতেছে। উহা যেন অসীম শক্তির আধার এবং যুহুর্ন্তেই সকলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইতেছে! আর তাঁহার সেই অপূর্ব কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র—শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত, কখন বীণার স্রাব করুণ রাগিণীতে বাজিতেছে, আবার কখন গম্ভীরশব্দময়, আবেগময় হইয়া ঝঙ্কার দিতেছে—সমস্ত সভা নিমন্ত্রণ ভাব ধারণ করিল, সে নিমন্ত্রণতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল এবং সেই বিপুল জনসম্মেলন শ্রবণাকাজ্জল্য স্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

“স্বামীজী তথায় সর্বসমক্ষে পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপর অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তিনি এমন ভাবে কথা বলিতেন যে, বোধ হইত যেন তিনি চাপরাশ পাইয়াছেন। তাঁহার তর্কগুলি বহু যুক্তিতে পূর্ণ থাকিত এবং লোকের সংশয় অপনোদন করিয়া দিত; আর বক্তৃতার অতি উৎকৃষ্ট অংশেও কদাপি ভাবাবেশে চালিত হইয়া, যে সত্যটি তিনি লোকের মনে

## স্বামী বিবেকানন্দ

দৃঢ়াঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন সেই মূল বক্তব্য বিষয়টি হারাইয়া ফেলিতেন না।”

এই সময় বহু সভাসমিতি, গীর্জা ও ভদ্রলোকের বাটীতে বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজী অনবরত আহূত হইতেন। ইহার ফলে তাঁহাকে আমেরিকার পূর্ব ও মধ্য-পশ্চিম প্রদেশসমূহের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল এবং চিকাগো হইতে নিউইয়র্ক ও বষ্টন হইতে বার্লিনমোর পর্য্যন্ত যে কতবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল তাহার সংখ্যা নির্ণয় হয় না। তিনি সর্বত্রই বক্তৃতাচ্ছলে অনেক হিতকর উপদেশ দিতেন এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানেই গিয়া দেখিতেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব হইতে ‘গেব্রুয়াবারী সন্ন্যাসী’র কীর্তি লোকমুখে আলোচিত হইতেছে। তিনি সর্বত্র বেদ, বেদান্ত, বৈদিক ঋষি ও হিন্দুস্থানের সাধুদিগের মহিমা কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রসমূহের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান, চরিত্র-মাধুর্য্য ও আশার আশ্বাসবাণীতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং শত শত শিক্ষিত ও সুসভ্য ব্যক্তি তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোঁড়া ও অজ্ঞ মিশনারিরা সর্বত্র ভারতের যে-সকল কলঙ্ক ও অপবাদ রটনা করিয়াছিল তিনি তাহা অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ‘জীব-ব্রহ্মে ঐক্য,’ ‘অপরোক্ষাত্মভূতি’ প্রভৃতি অদ্বৈত-তত্ত্বসমূহের বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা বেদ ও উপনিষদের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন—সকলকে বুঝাইয়াছিলেন, নিঃসংশয় ব্রহ্মবস্তুরাভিমানবজীবনের চরম লক্ষ্য এবং জ্ঞান, রাজ্য, ভক্তি ও কর্ম এই চতুर्वিধ যোগ সেই লক্ষ্যসাধনার উপায়।

সময়ে সময়ে স্বামীজীকে এক সপ্তাহের মধ্যে বার, চৌদ্দ বা



## পর্যটন ও প্রচার

ততোধিক বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত। এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে সময়ে সময়ে তাঁহার শরীর-মন এতদূর নিস্তেজ হইয়া পড়িত যে, তিনি আর নূতন কিছু বক্তব্য খুঁজিয়া পাইতেন না, মনে হইত যেন তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও তাহা হইতে আর কোন নূতন চিন্তা বাহির হইবে না। তখন তিনি বিহ্বল হইয়া ভাবিতেন, ‘তাই ত! কি হইবে? কালিকার বক্তৃতায় কি বলিব?’ এই অবস্থায় সময়ে সময়ে তাঁহার কতকগুলি অদ্ভুত অনুভূতি হইত। গভীর রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পাইতেন, পরদিন তাঁহাকে যে সব কথা বলিতে হইবে কে যেন তাহা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নিকটে বলিতেছে। কখনও কখনও ঐ শব্দ দূর হইতে আসিত, যেন বৃক্ষশ্রেণীশোভিত রাজপথের অপর পার্শ্ব হইতে আসিতে আসিতে ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইত, অথবা মনে হইত কে যেন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছে, আর তিনি শুইয়া শুইয়া তাহা শুনিতেছেন। কখনও বা শুনিতেন যেন দুইটি কর্ণস্বর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পরদিনকার বক্তব্য-বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতেছে। সময়ে সময়ে এই অদ্ভুত উপায়ে অনেক নূতন নূতন কথা, নূতন নূতন ভাব তাঁহার কর্ণগোচর হইত—সে সব তিনি ইহজন্মে কখনও শুনেন নাই বা ভাবেন নাই। নিদ্রাভঙ্গে এইসকল বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি পর দিবসের বক্তৃতায় বলিতেন।

স্বামোজী এই সকল আশ্চর্য ঘটনাকে নিজ মনেরই সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিতেন। বলিতেন, আবশ্যকানুসারে মন স্বতঃপ্রযুক্ত হইয়া ঐরূপ কার্যসম্পাদনে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে এই অলৌকিক বক্তৃতাগুলি এত জোরে হইত যে, অল্প ঘরের লোকের কানে পর্যন্ত তাহা পৌছিত। তাঁহারা সেই অল্প পরদিন আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

## স্বামী বিবেকানন্দ

করিত, “স্বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত টেচিয়ে টেচিয়ে কথা বলছিলেন?” স্বামীজী কথাটা কোনরূপে কাটাইয়া দিতেন।

এইসময়ে ও ইহার পরে পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে স্বামীজীর নানা প্রকার যোগজ শক্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই স্পর্শমাত্র লোকের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিতে পারিতেন, বহু দূরের ঘটনাবলী সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেন এবং লোকের মনোভাব অবগত হইয়া তাহাদিগের সন্দেহ নিরসন বা জিজ্ঞাস্তা বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেন। এমন কি, লোকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার জীবনের অতীত ইতিহাস পর্য্যন্ত বলিয়া দিতে পারেন। ক্বচিৎ কদাচ তিনি দুই একজন সত্যার্থী লোককে ঐরূপ বলিয়া দিতেন, তাহারা তাঁহার কথার সত্যতা অমুভব করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়া বাইত, আর বাহাদের ভিতরে গলদ থাকিত তাহারা ভয়ে তাঁহার ত্রিসীমানা মাড়াইত না। উদাহরণস্বরূপ চিকাগো শহরের একজন ধনী ব্যক্তির কাহিনী এ স্থানে বলিতেছি। এই ব্যক্তি যোগদৃষ্টি বা যোগজশক্তিলাভ, এ সব মোটেই বিশ্বাস করিত না—বলিত ওসব গাঁজাখুরি কল্পনা মাত্র। স্বামীজীকে সে স্পষ্টই একদিন বলিল, “আচ্ছা মহাশয়, আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তবে আপনি আমার মনের ভাব বা অতীত জীবনের ঘটনা সব বলে দিন না কেন?” স্বামীজী এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন এবং তাহার পর তাহার চক্ষুর দিকে নিজ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একগুণ গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন যে সে ব্যক্তির বোধ হইতে লাগিল যেন তাহার মনের তলদেশে পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতেছে। সে দৃষ্টিতে কোন কঠোরতা ছিল না, কিন্তু তথাপি বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার শক্তি অপ্রতিহত, অপরাঙ্কয়ে ও তাহা অন্তরের



## পর্যটন ও প্রচার

অন্তরতম স্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ। লোকটি সহসা চঞ্চল ও ভীত হইয়া রহস্ত ত্যাগ করত কাতর স্বরে বলিল, “স্বামীজী, আপনি আমার এ কি কচ্ছেন? মনে হচ্ছে যেন আমার ভিতরটা মথিত করে জীবনের সমস্ত গুপ্তরহস্ত টেনে বের কচ্ছেন।” এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিল ও সেই দিন হইতে যোগশক্তি সম্বন্ধে তাহার আর অবিশ্বাস রহিল না। স্বামীজী কখনও এইসকল শক্তিকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিতেন না, বরং এগুলি অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যাহার অন্তর নিরন্তর অবৈতের অমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল, তাঁহার নিকট এসকল শক্তির আর কি মূল্য! তবে সাধারণ লোকে আবার এগুলি না দেখিলে উন্নত শ্রেণীর মানুষ বলিয়া বিশ্বাসও করে না, এমনি বিভ্রমনা।’

আমেরিকার যে-সকল লোক বছর্বর্ষ ধরিয়া নানাবিধ মত শ্রবণ করিতে করিতে ক্লাস্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা স্বামীজীর বক্তৃতা ও উপদেশ শ্রবণে যেন আকৃষ্ট হইল। তাঁহার অনিন্দিত

১ এই প্রসঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দ একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। স্বামীজীর শিষ্য গুড্‌উইন সাহেব (পাঠক পরে ইহার পরিচয় পাইবেন) একবার জড়বাদের পক্ষসমর্থন করিয়া স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তুমুল তর্ক চলিল, কিন্তু গুড্‌উইন সাহেব স্বামীজীর সম্ভবাসমূহ কিছুতেই স্বীকার করিতেছিলেন না। সেই সময়ে সহসা সাহেবের জীবনের অতীত ঘটনাসমূহ ঠিক বায়স্কোপের চিত্রের স্তায় স্বামীজীর চক্ষের সম্মুখ দিয়া চলিয়া বাইতে লাগিল। স্বামীজী তদর্শনে বলিয়া উঠিলেন, ‘তুমিও এইরূপ লোক, এই করিয়াছ, এই করিয়াছ, তোমার বুদ্ধিতে আর কত ধরিবে।’ গুড্‌উইন স্বামীজীর শক্তির পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তর্ক ছাড়িয়া নীরব হইলেন।

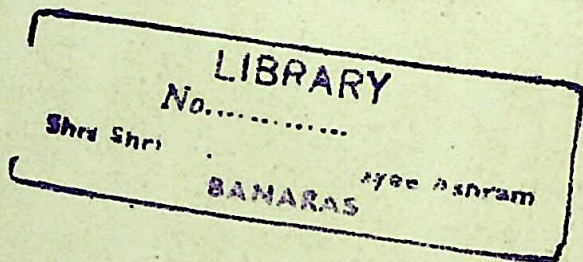
## স্বামী বিবেকানন্দ

দেবকান্তি, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, দিব্যজ্ঞান, প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অনুভূতি যেন তাহাদের শুদ্ধপ্রাণে নববারি সিঞ্জন করিল। এমন কথা তাহারা জীবনে কখন শুনে নাই, এমন লোকও তাহারা কখনও দেখে নাই। এমন করিয়া আপনার জন্মের মত প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়া কেহ তাহাদিগকে আশার মোহন বংশী শুনায় নাই, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলে নাই, ভবিষ্যতের উজ্জল চিত্র আঁকে নাই। যাহারা সত্যের মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য বারবার বিকলপ্রযত্ন হইয়াছে, এতদিনে তাহাদের সকল উত্তম, সকল চেষ্টা সার্থক হইল। তাহারা দেখিল তিনি বাহা বলেন তাহার একটিও ধার-করা কথা নহে, সবই স্বীয় অন্তর্লব্ধবোধপ্রসূত। এমন লোকটি তাহারা আর দ্বিতীয় দেখে নাই। যাহারা অতিথিরূপে কিছুদিন স্বামীজীকে লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন, “তাঁহার প্রতিভা বিচিত্র ও বহুবর্ণশোভিত।” বাস্তবিক একরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভা জগতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। একধারে শিল্পী ও গায়ক, সাহিত্য ও ইতিহাসবেত্তা, সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষক, স্মরসিক ও গভীরচিন্তাশীল মনস্বী—এমন লোকের সংস্পর্শে যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যে তাঁহাকে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?



3/406

PRESENTED





3/406

